হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

১৫

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সূচীপত্র

মোহনপুরের শ্মশান

১

একখানি ছবি

আমি যাঁর জীবনের আশ্চর্য কাহিনী বলব, তাঁর নাম হচ্ছে আনন্দমোহন সেন। তাঁকে আমি চিনি না, চোখে দেখিও নি, খুব সম্ভব তাঁর মৃত্যু হয়েছে আমার জন্মাবার আগেই।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এমন একজন লোকের জীবনকাহিনীর সঙ্গে আমি পরিচিত হলুম কেমন করে? আগে এই জিজ্ঞাসারই জবাব দেওয়া উচিত। নইলে আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে, নিজের মন-গড়া একটা আজগুবি উপকথা বলে আমি খামোকা আপনাদের পিলে চম্‌কে দেবার চেষ্টা করছি।

এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জগতে আনন্দমোহনের গল্প যে বিশ্বাসযোগ্য হবে না, আমিও অস্বীকার করি না এ কথা। কিন্তু যে কাহিনী আমি নিজে রচনা করি নি তা সত্য বা মিথ্যা বলে একতরফা ডিক্রি জারি করবারও অধিকার নেই আমার। বিশ্বাস করা এবং না-করার সম্বন্ধে আমি আপনাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে রাজি আছি।

শঙ্কর বসু ছিলেন অধ্যাপক এবং আমার বন্ধু। এবারের পুজোর ছুটিটা তাঁর দেশের বাড়িতে কাটাবার জন্যে আমাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁর দেশের বাড়ি ছিল বর্ধমানের দামোদর নদের ধারে। এর আগে আর কখনো এখানে আসি নি।

বৈঠকখানায় ঢুকেই একখানা বড় তৈলচিত্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। চিত্রের বিষয়বস্তু এই ঃ

চারিধারে অন্ধকার। একটি তরুণী—তাঁর ঊর্ধ্বোত্থিত ডানহাতে সেকেলে লণ্ঠন। তরুণীর দেহের অন্যান্য অংশ অন্ধকারের ভিতরে প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে, কেবল ভালো করে দেখা যাচ্ছে তার মুখখানি—অপূর্ব ও জীবন্ত সৌন্দর্য-ভরা সেই মুখ। পটের একপাশে খানিক স্পষ্ট ও খানিক অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে আর এক মূর্তি। সে যুবক এবং তার মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে বিষম বিস্ময় ও দারুণ আতঙ্ক! সুন্দরীর লণ্ঠনের আলোতে যুবক বোধহয় এমন কোন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেয়েছে মানুষের বুকের রক্ত যাতে জমে যায় বরফের মতন!

অদ্ভুত বিষয়বস্তু। তরুণী কী দেখাতে চায় এবং যুবক কেনই বা এত ভয় পেয়েছে? ছবিতে তার কোন ইঙ্গিতই নেই।

শঙ্কর হেসে বললে, 'হিমাংশু, এ-রকম রহস্যময় ছবি তুমি বোধহয় আগে কখনো দেখ নি?'

—'না। ছবিতে চিত্রকর কি দেখাতে চায়? মনে হচ্ছে এখানা কাল্পনিক ছবি নয়। ছবিতে যে দৃশ্য রয়েছে, এই পৃথিবীর উপর একদিন সত্য-সত্যই তার অভিনয় হয়ে গিয়েছে।'

—'তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। ছবিখানি আঁকা হয়েছে একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে।'

—'কী সে ঘটনা?'

—'উঃ, ভয়ঙ্কর! এই ছবিতে ফুটেছে একটি বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য! ঐ যে তরুণী, ওর নাম লীলা। ঐ যে যুবক, ওর নাম আনন্দমোহন সেন।'

—'কে ওরা।'

—'লীলার বাবার নাম চন্দ্রমোহন চৌধুরী, সেকালকার একজন সুবিখ্যাত মূর্তিচিত্রকর। আনন্দমোহন ছিল তাঁরই কৃতীছাত্র, এই ছবিখানা দেখলেই তার কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাবে, কারণ এখানা তারই আঁকা। এরা কেউই আজ বেঁচে নেই।'

—'এখন গল্পটি কি শুনি?'

—'আমার বাবা আনন্দমোহনের নিজের মুখ থেকে গল্পটি শুনে আমাকে বলেছিলেন অনেকদিন আগে। বাবাকে আনন্দমোহন খুব ভালোবাসত, তাই মারা যাবার সময় ছবিখানা তাঁকে উপহার দিয়ে গিয়েছিল।'

—'কিন্তু গল্পটি কি?'

—'একটু ধৈর্য ধর। এমন রোদে-ধোয়া সকালে এ-রকম গল্প অস্বাভাবিক বলে মনে হবে। অলৌকিক জমে নিরালা রাতের ছায়ায়।'

—'গল্পটি খালি ভয়ানক নয়, অলৌকিকও!'

—'শুনলেই বুঝবে।'

সেদিনের সন্ধ্যাটা ছিল বাস্তবিকই গল্প শোনার পক্ষে রীতিমত উপযোগী। সন্ধ্যার আগেই ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নেমেছে, ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাসে গাছে গাছে থেকে থেকে ফুটছে বেদনার ভাষা, মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা এবং পৃথিবী ঢাকা অন্ধকারের ঘেরাটোপে। মাঝে মাঝে অন্ধকারকে ধাক্কা মেরে মেঘের পর্দা ছিঁড়ে আকাশ থেকে পৃথিবীতে স্যাঁৎ করে নেমে আসছে বিদ্যুতের তীব্র শিখা এবং ক্ষণিকের জন্যে দেখা যাচ্ছে বিপুল দামোদরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গ।

লম্বাচওড়া বারান্দা। একটা সেকেলে গোল মার্বেল টেবিলের উপরে টিম্‌টিম্

করে জ্বলছে হারিকেন ল্যাম্প, তার আলো বারান্দার অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল মাত্র। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না এবং অস্পষ্টতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে বেশ একটি রহস্যের সম্ভাবনা।

বাইরের দিকে মুখ করে এবং দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে দুখানা পুরাতন 'ইজি-চেয়ারে'র উপরে চুপ করে বসে আছে শঙ্কর এবং হিমাংশু। কোথাও নেই মানুষের কাজের বা কণ্ঠের সাড়াশব্দ। তারা উপভোগ করছিল এই বৃষ্টিধারা-ধৌত নির্জনতা।

বোধকরি বৃষ্টি ও ঝড়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই হঠাৎ একটা বাদুড় ভিতরে এসে বারান্দার ছাদ ঘেঁষে দুই ডানা দিয়ে ঝট্‌পট্ শব্দ তুলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

হিমাংশু বললে, 'লেখকরা অলৌকিক গল্প বলবার সময়ে প্রায়ই বাদুড়ের উল্লেখ করেন। তোমারও গল্পে বাদুড় আছে নাকি?'

—'না।'

—'তাহলে সেই ভ্রম সংশোধনের জন্যে বাদুড় নিজেই এসে হাজির হয়েছে। রসিক বাদুড়কে ধন্যবাদ। নাও, এখন গল্প শুরু কর।'

২

পাত্র-পাত্রীর পরিচয়

আজ থেকে অন্তত সত্তর বছর আগেকার কথা।

সে-সময়ে ফোটোগ্রাফ তোলবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, তবে বাংলাদেশে তার প্রভাব একরকম ছিল না বললেও চলে। কিন্তু মানুষের অহং জ্ঞান অল্প নয়, মৃত্যুর আগে সে ইহলোকে নিজের স্থায়ী চিহ্ন কিছু-কিছু রেখে যেতে চায় এবং ধনীদের ভিতরেই এই স্বভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় বেশি।

বাংলাদেশের প্রাচীন ধনী-পরিবারের বসতবাড়ির ভিতরে গেলেই দেখা যাবে, দেওয়ালের চারিদিকে টাঙানো রয়েছে বড় বড় তৈলচিত্রের পর তৈলচিত্র—অধিকাংশই হচ্ছে পূর্বপুরুষদের ছবি। আজকের ধনী এবং নির্ধনরাও সাধারণত ফটোগ্রাফের সাহায্যে নিজেদের নশ্বর চেহারাটা পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রেখে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেকালে ছিল কেবল তৈলচিত্রের চলন। ধনীরা নিজেদের

নশ্বর দেহগুলোকে অবিনশ্বর করবার জন্যে বড় বড় চিত্রকরকে আহ্বান করতেন। সেকালকার গরিব আর সাধারণ গৃহস্থরা ইচ্ছা থাকলেও এ বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে পারত না। কারণ তৈলচিত্র আঁকতে যত টাকার দরকার তত টাকা থাকত না তাদের পকেটে বা ট্যাঁকে।

চন্দ্রবাবু সেকালকার একজন নামজাদা মূর্তিচিত্রকর ছিলেন। শিল্পীসমাজে তাঁর ছিল ওস্তাদ বলে খ্যাতি। এবং ধনীসমাজে তাঁর ছিল অতিশয় সমাদর। নিজেদের খোলস অর্থাৎ বাইরের চেহারাটাকে অমর করবার প্রত্যাশায় সেকালকার অনেক রাজা, মহারাজা এবং জমিদার আশ্রয় গ্রহণ করতেন সাগ্রহে।

চন্দ্রবাবুর ছাত্রও ছিল কয়েকজন। অবসর-কালে তিনি তাদের চিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। এবং ছাত্রদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল আনন্দমোহন।

আনন্দ ছিল যাকে বলে অনাথ। তার বাড়ি-ঘর, আত্মীয়স্বজন কিছুই ছিল না। কিন্তু আনন্দের চিত্রাঙ্কনপটুতা ও মিষ্ট প্রকৃতি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন চন্দ্রবাবু। তাকে তিনি নিজের সংসারে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাড়ির ছেলের মতন।

এবং চন্দ্রবাবুর পক্ষে আনন্দের মত একজন বিশ্বস্ত লোকের আবশ্যক ছিল অত্যন্ত। চন্দ্রবাবু ছিলেন চিরকুমার, নিজের আর্ট নিয়ে সর্বদাই এমন মত্ত হয়ে থাকতেন যে, প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত তাঁর স্মরণ-পথে উদিত হয় নি, মনুষ্যসমাজে 'বিবাহ' বলে কোন-কিছু অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে। তাঁর পরলোকগত কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটি মেয়ে ছিল, তার নাম লীলা। গৃহস্থালীর সমস্ত কর্তব্য সেই-ই পালন করত। আর গৃহস্থালীর বাইরেকার যা-কিছু কাজ, তার ভার ছিল আনন্দের উপরে। এই দুজনের হাতে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে করতেন কলালক্ষ্মীর সেবা।

কলিকাতার হট্টগোল চন্দ্রবাবুর মোটেই ভালো লাগত না। অথচ তাঁর পক্ষে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই নয়। তাই তিনি বাস করতেন শহরতলির এমন এক জায়গায় যেখানে শহরের কাছাকাছি থেকেও উপভোগ করা যায় পল্লী-প্রকৃতির নির্জনতা।

হিমাংশু, মনে রেখো এ হচ্ছে সত্তর বছর আগেকার কথা। তখন নিজ কলকাতা শহরেও ছিল না ইলেক্ট্রিক, মোটর, বাস এবং অন্যান্য আধুনিক যুগের লক্ষণ। অনেক রাস্তায় থাকত মিট্‌মিটে তেলের আলো এবং অনেক রাস্তার দুধারে থাকত নালা বা খোলা ড্রেন। খোলার ঘর এবং বস্তি দেখা যেত তখন কলকাতার যেখানে-সেখানে। আজ কলকাতায় তুমি সরকারি বাগান ছাড়া ছোট বা বড় মাঠ প্রায় খুঁজেই পাবে না। কিন্তু তখনকার দিনে কলকাতার বহু স্থানেই এত মাঠ-ময়দান ও ছোটোখাটো জঙ্গলের মতন জায়গা ছিল যে, সেখানে গেলে শহরে বসেই দেখতে পাওয়া যেত পল্লীগ্রামের আংশিক ছবি।

সে-সময়ে শহরের অবস্থাই যখন ছিল এইরকম, তখন শহরতলি ছিল যে পল্লীগ্রামের মতই, এটুকু নিশ্চয়ই আন্দাজ করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না। তখন টালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গেলে মনে হত, অরণ্যে এসেছি। এমনি এক জায়গাতেই ছিল চন্দ্রবাবুর বসতবাড়ি। এবং তাঁর চিত্রশালা ছিল সেখান থেকে খানিক দূরে, কলকাতার প্রান্তসীমায়।

আসল গল্প শুরু করবার আগে এখানে আর একটি কথা বলে রাখি। লীলার বয়স হয়েছিল ষোল-সতেরো। তখনকার দিনে এত বয়সের কুমারী কন্যার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। কিন্তু চন্দ্রবাবু ছিলেন ইংরেজি মেজাজের লোক। ব্রাহ্ম বা ক্রিশ্চান না হলেও বিশ্বাস করতেন যে, অল্পবয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

কেবল পরমাসুন্দরী বললেও লীলার রূপের কথা ঠিকমত বুঝানো যায় না। সে ছিল অদ্ভুত রূপসী। রং, গড়ন, মুখচোখ ছিল এমন ধারা যে খুঁজলেও তার জোড়া মিলত না। তার উপরে লীলার প্রকৃতিও ছিল অতি মধুর, অতি নম্র।

সুতরাং এমন একটি মেয়ের দিকে যে আনন্দ হবে আকৃষ্ট, এ হচ্ছে খুব সহজ কথা। মনে মনে সে অদূর ভবিষ্যতে লীলাকে নিজের সহধর্মিণীরূপে কল্পনা করত। লীলাও বোধহয় এটুকু বুঝতে পারত—যদিও আনন্দ কোনদিনই মুখে প্রকাশ করে নি আপন মনের কথা।

আনন্দ ও লীলা ছিল এক জাতেরই লোক, তবু আপাতত লীলার সঙ্গে যে তার বিবাহের প্রসঙ্গ ওটাও অসম্ভব, এ সত্য আনন্দের অজানা ছিল না। সে হচ্ছে অনাথ, পরের আশ্রয়ে বাস করে। সে লীলাকে বিয়ে করতে চাইলে চন্দ্রবাবু হয় খাপ্পা হয়ে উঠবেন, নয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন অমন অদ্ভুত প্রস্তাব।

অতএব নিজেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরী করে তোলবার চেষ্টা করছিল আনন্দ।

চন্দ্রবাবু নিজেই মত প্রকাশ করেছেন, তার শিক্ষা-প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীন ভাবেই সে চিত্র-ব্যবসায় অবলম্বন করতে পারবে।

স্বাধীন হওয়ার অর্থই হচ্ছে অর্থ উপার্জন করবার ক্ষমতা। ধনীসমাজে আনন্দের যদি পসার হয়, তাহলে তার হাতে লীলাকে সমর্পণ করতে চন্দ্রবাবুর নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

আনন্দ দিনের পর দিন গুনছিল সেই আশাতেই।

৩

মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অন্যান্য ছাত্ররা বিদায় নিয়েছে, চিত্রশালার মধ্যে কাজ করছে অনন্দ একাকী।

একখানি বড় ঘর—দোতালার উপরে। এখানে সেখানে, দেওয়ালের উপর রয়েছে অনেকগুলো ছোট-বড় সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ছবি। সবই তৈলচিত্র। তখনকার দিনে শিক্ষিত বাঙালি চিত্রকররা সাধারণত জলীয় রং বা 'ওয়াটার কলার' ব্যবহার করতেন না। জলীয় রং ব্যবহার করত যারা, শিক্ষিতরা অবজ্ঞা করে তাদের ডাকতেন 'পটুয়া' বলে। বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে জলীয় রঙের প্রাধান্য স্থাপন করেন সর্বপ্রথমে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ।

তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবার জন্যে আনন্দমোহন পরিশ্রম করত প্রায় দিবারাত্রিব্যাপী। অন্যান্য ছাত্ররা ছুটি নিয়ে চলে গেলে পরও সে অনেকক্ষণ ধরে চিত্রশালায় রং আর তুলি নিয়ে নিযুক্ত হয়ে থাকত।

কোন খেয়ালি ক্রেতার ফরমাশে সে আঁকছিল একখানা অদ্ভুত ছবি। নরকের দৃশ্য।

যমদূতেরা জনৈক পাপীকে ধরে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছে!

পাপীর মূর্তি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু আনন্দ বিপদে পড়েছে যমদূতগুলোকে নিয়ে।

জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে যমদূতের পরিচয় হয় না। আনন্দও কখনো দেখে নি যমদূত। তাদের চেহারা যে ঠিক কি-রকম হওয়া উচিত আনন্দ কিছুতেই তা ধারণায় আনতে পারছে না।

বিলাতি ছবিতে imp, demon ও devil প্রভৃতিকে দেখেছে। তাদের কালো কালো প্রায়-মানুষের মতন চেহারা, কিন্তু তাদের মাথায় থাকে শিং, পিছনে থাকে ল্যাজ এবং পায়ে থাকে গরু প্রভৃতির মতন খুর।

কিন্তু যিনি ছবির ফরমাশ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন নাকি পরম হিন্দু, গঙ্গাজল ছাড়া আর কোন জল পান করেন না। আনন্দ অনায়াসেই ফিরিঙ্গি imp, demon ও devil এর মূর্তি আঁকতে পারত, কিন্তু সে-সব ক্রিশ্চানী মূর্তি দেখলে হিন্দু ক্রেতার হিন্দুত্ব নিশ্চয়ই জখম হবে।

আর ছবি আঁকা সম্ভবপর নয়। চিত্রশালার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে সন্ধ্যার অন্ধকার। বাইরে ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ হয়ে আসছে নাগরিক কোলাহল।

তখনও তুলি হাতে করে আনন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে—'যমদূতদের—হিন্দু যমদূতদের কি-রকম দেখতে? রাক্ষসের মতন? ভূত-প্রেতের মতন? কিন্তু রাক্ষস আর ভূতপ্রেতদেরই বা চেহারা কিরকম হওয়া উচিত? তাদেরও তো আমি চোখে দেখি নি!'

অনেক মাথা ঘামিয়েও কূল-কিনারা না পেয়ে আনন্দ শেষটা ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, 'নিকুচি করেছে! যমদূতেরা জাহান্নামে যাক, আমি তাদের আঁকতে পারব না!'

—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন থেকে চাপা গলায় কে হেসে উঠল!

সচমকে আনন্দ ফিরে দেখলে, ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা অপরিচিত মূর্তি।

চিত্রশালার ভিতরে তখন ভালো করে চোখ চলে না। বেশ ঘন অন্ধকার। বাইরে শোনা গেল প্যাঁচার ডাক।

মূর্তি স্থির চক্ষে তাকিয়ে ছিল চিত্রপটের সম্পূর্ণ যমদূতগুলোর দিকে। বিচিত্র তার চেহারা। মাথায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা মস্ত একটা পাগড়ি সে এমনভাবে পরেছে যে, মুখের আধখানা দেখাই যাচ্ছে না। পোশাকও সাধারণ লোকের বা বাঙালির মতন নয়, সাজগোজ দেখলে মনে হয় সে কোন রাজা-রাজড়া—এমন কি কটিবন্ধ থেকে ঝুলছে একখানা তরবারি পর্যন্ত!

সৈনিকের মতন সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তি। অন্ধকারে তাকে খানিক দেখা যাচ্ছিল, খানিক দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও ঝক্মক্ করে উঠছিল তার স্বর্ণখচিত ও নানা রত্নে অলঙ্কৃত বহুমূল্য পোশাকটা।

এমন মূর্তি এখানে দেখবার আশা আনন্দ করে নি। সে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেল।

মূর্তি গম্ভীর স্বরে বললে, 'ছোক্‌রা, পৃথিবীতে যখন বেঁচে আছ, যমদূতদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

তার চেহারা দেখলে ও গলার আওয়াজ শুনলে বুক ধড়ফড় করে ওঠে ভয়ে। কিন্তু একটা জবাব না দিলেও চলে না। আনন্দ কোনরকমে বললে, 'আজ্ঞে, খরিদ্দারের ফরমাশ!'

মূর্তি একখানা হাত রাখলে আনন্দের কাঁধের উপরে। আনন্দের মনে হল, তার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে গেল যেন একটা তরঙ্গিত তুষারবারির হিল্লোল। সে পিছিয়ে দাঁড়াল সভয়ে।

মূর্তি বললে, 'খরিদ্দারের ফরমাশেও আর কোনদিন যমদূতদের দেখবার চেষ্টা কোরো না।'

আনন্দ ভয়ে ভয়ে বললে, 'চন্দ্রবাবুর কাছে আপনার কোন দরকার আছে? অনুগ্রহ করে ঐ আসনে বসুন।'

—'চন্দ্রমোহন চৌধুরী কোথায়?'

—'আজ্ঞে, তিনি কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। ফিরতে রাত হবে।'

—চন্দ্রমোহন চৌধুরীকে বোলো, আমি মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ। আসছে কাল সন্ধ্যায় ঠিক আটটার সময়ে আমি আবার তার সঙ্গে দেখা করতে আসব। সে যেন এখানে হাজির থাকে।'

মূর্তি হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। তারপর সোজা বেরিয়ে গেল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। ঘরের আবহ এতক্ষণ যেন তুষারশীতল হয়ে ছিল, মূর্তি অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘরের মধ্যে জেগে উঠল গ্রীষ্মের উত্তাপ।

আনন্দের কেমন কৌতূহল হল, চিত্রশালা থেকে বেরিয়ে মূর্তি কোন্ দিকে যায় দেখবার জন্যে। ঐ জানালাটার তলাতেই আছে চিত্রশালা থেকে বেরিয়ে যাবার একমাত্র দরজা। সে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে দাঁড়াল।

সে প্রায় দশ মিনিটকাল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সদর দরজা দিয়ে কারুকেই বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখলে না।

তবে কি লোকটা এখনো বাড়ির ভিতরেই আছে?

এই সম্ভাবনা মনে জাগতেই আনন্দের সমস্ত দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! কি এক অজানা ভয়ে সে তাড়াতাড়ি উপরের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় নেমে গেল। কিন্তু কোথাও কারুকেই দেখতে পেলে না। তখন এই-আশ্চর্য ব্যাপার নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে সে চিত্রশালার দরজা বন্ধ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

৪

মহারাজের প্রস্তাব

সেই রাত্রেই আনন্দ আগন্তুকের কথা চন্দ্রবাবুকে জানালে।

চন্দ্রবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ? কখনো তাঁর নাম পর্যন্ত শুনি নি। কি চান তিনি? নিশ্চয়ই আমার হাতে তাঁর রাজ্যভার সমর্পণ করতে আসবেন না। বোধহয় তাঁর একখানা ছবি আঁকাতে

চান। বেশ, কাল যথাসময়েই মহারাজা বাহাদুরকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করবার জন্যে চিত্রশালায় উপস্থিত থাকব।'

পরদিনের সন্ধ্যা। চিত্রশালার মধ্যে একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কোন ছাত্র নেই।

চন্দ্রবাবু ঘরের ভিতরে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'আটটা তো বাজে-বাজে। আনন্দ, কই, এখনো তো কারুর টিকি দেখতে পাচ্ছি না!'

—'আজ্ঞে, তিনি ঠিক আটটার সময়ে আসবেন বলেছেন।'

—'কি নাম বলেছিলে? মোহনপুরের মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'দেখতে কি রকম?'

—'দেখলেই মনে হয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।'

—'বয়স কত?'

—'বলা শক্ত স্যর্! তবে এইটুকু বলতে পারি বয়সে তিনি যুবক নন।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আটটা বাজতে আর এক মিনিট বাকি! এখনো মহারাজা বাহাদুরের দেখা নেই। আনন্দ, আমি কিন্তু আটটা বাজলেই চলে যাব—আমার অনেক কাজ। মহারাজা বাহাদুর যদি তারপরেও আসেন, তুমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কোয়ো। জীবনে রাজা-মহারাজা দেখেছি প্রায় দু ডজন। কোন মহারাজের জন্যেই আমি এখানে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে রাজি নই! মহারাজাদের চেয়ে আমি মহাশয়দের বেশি পছন্দ করি।'

ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল।

একতালা থেকে দোতালায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ির উপরে শোনা গেল না কারুর পায়ের শব্দ, কিন্তু ঘরের দরজার সামনে দেখা গেল মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি!

মহেন্দ্রনারায়ণের মূর্তির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল এমন একটা আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের ভাব যে চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি মাথা হেঁট করে তাঁকে প্রণাম না করে পারলেন না।

মহেন্দ্রনারায়ণ ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন।

চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার টেনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, বসতে আজ্ঞা হোক্!'

মহেন্দ্রনারায়ণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনিই কি মোহনপুরের মহারাজা বাহাদুর?'

—'হ্যাঁ।'

—'শুনলুম আমার সঙ্গে মহারাজা বাহাদুরের কোন দরকার আছে?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মহেন্দ্রনারায়ণ হাত তুলে আনন্দকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমার ও লোকটি কি বিশ্বস্ত?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত।'

পরিচ্ছদের ভিতর থেকে একটি ছোট বাক্স বার করে মহেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'এই বাক্সটা নিয়ে ওকে কাছাকাছি কোন জহুরির কাছে যেতে বল। ও যাচাই করে আসুক, এই বাক্সের ভিতরে যা আছে তার দাম কত?'

বাক্সটি নিয়ে আনন্দ বেরিয়ে গেল। জহুরির বাড়ি যেতে তার বেশিক্ষণ লাগল না। পরিচিত জহুরি।

আনন্দ বললে, 'বাক্সটা খুলে দেখুন।'

বাক্সের ভিতর ছিল নানারকম রত্নখচিত অলঙ্কার!

জহুরি সবিস্ময়ে বললে, 'আনন্দবাবু, এ-সব জড়োয়া গয়না কার?'

—'মোহনপুরের মহারাজার।'

—আশ্চর্য! এ-রকম জড়োয়া গয়না একালেও কেউ ব্যবহার করে নাকি?'

—'গয়নাগুলো কি ভালো নয়?'

—'ভালো নয়! বলেন কি? এমন চমৎকার গয়না আজকাল কেউ দেখতে পায় না! এ-রকম গয়নার চলন ছিল সেই নবাবি আমলে।'

—'ওর দাম বলতে পারেন?'

—'নিশ্চয়ই পারি।'

জহুরি গয়নাগুলো নিয়ে বেশ-খানিকক্ষণ পরীক্ষার পর বললে, 'ভারি দামি গয়না দেখছি।'

—'কত দাম হবে?'

—'দশ লক্ষ টাকার কম নয়।'

শুনে আনন্দের মাথা ঘুরতে লাগল! দশ লক্ষ টাকার ভার বহন করে এখানে এসেছে, অথচ সে কিছুই অনুভব করতে পারে নি। দশ লক্ষ টাকা এত হাল্কা!

ওদিকে আনন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই মহেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শোনো চন্দ্রমোহন! এখানে আজ আমার মিনিট-কয়েকের বেশি থাকবার

উপায় নেই। কিছু দিন আগে কলকাতার এক রঙ্গালয়ে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আমি দেখেছিলুম। তাকে আমি বিবাহ করতে চাই।'

চন্দ্রবাবু সচকিত চোখে মহারাজার মুখের পানে তাকালেন। কি বললেন, বুঝতে পারলেন না। অদ্ভুত প্রস্তাব।

মহারাজা অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি অবাক হচ্ছ? কেন? আমার চেয়ে ধনী পাত্র পাবার আশা তুমি কর নাকি?'

চন্দ্রবাবু তখনো জবাব দিতে পারলেন না। কেবল এই অদ্ভুত প্রস্তাব বা বিস্ময়ের জন্যে নয়, আগন্তুককে দেখে তাঁর বুকের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক! সেখান থেকে তাঁর পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হল, কিন্তু কেবল ভদ্রতার খাতিরেই সে ইচ্ছা তিনি দমন করলেন।

অনেক কষ্টে শেষটা তিনি বললেন, 'মহারাজা বাহাদুর, আপনার প্রস্তাব শুনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কিন্তু লীলা বালিকা নয়, তার মত না নিয়ে আপনাকে কেমন করে কথা দেব?'

মহারাজা বললেন, 'চন্দ্রমোহন আমাকে ছলনা করবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি তুমিই লীলার একমাত্র অভিভাবক, তোমার অনুরোধ কিছুতেই সে অমান্য করবে না।'

মহারাজা সামনের দিকে দুই পা এগিয়ে এলেন। চন্দ্রবাবু পিছিয়ে গেলেন। তাঁর ভয় আরো বেড়ে উঠল, এই অদ্ভুত মূর্তির কাছে একলা থাকাও যেন বিপদজনক। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন—হে ভগবান, আনন্দকে অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও!

মহারাজা অধীর কণ্ঠে বললেন, 'বল, তোমার মত কি?'

চন্দ্রবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু মহারাজা আপনার জাতি—'

বাধা দিয়ে মহারাজা বললেন, 'আমার জাতি? তুমি কি জানো না রাজা-রাজড়ারা সব জাতেই বিবাহ করতে পারে?'

—'কিন্তু—'

—'আর কোন কিন্তু নয়। শোনো, সেই ছোকরা বাক্স নিয়ে ফিরে এলেই শুনবে, তার ভিতরে আছে লক্ষ লক্ষ টাকার জড়োয়া গয়না। এ গয়না পাবে লীলাই। তার উপরে যৌতুক স্বরূপ আমি দেব আরো দশ লক্ষ টাকা! এর পরেও তোমার আপত্তি আছে?'

মহারাজা নিষ্পলকনেত্রে চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। চন্দ্রবাবুর মনে হল সে জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তির হরণ করে নিচ্ছে। তাঁর মুখ দিয়ে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বেরিয়ে গেল, 'আমার কোন আপত্তিই নেই।'

এই সময়ে গয়নার বাক্স নিয়ে ফিরে এল আনন্দ। তাকে দেখে চন্দ্রবাবু যেন মনের ভিতরে খানিকটা জোর পেলেন। ভাবলেন, আর একটু আগে ছোকরা যদি আসত তাহলে আমি কথা দিতুম না।

আনন্দ বললে, 'জহুরি বললে বাক্সের ভিতরে দশ লক্ষ টাকার গয়না আছে।'

মহারাজা বললেন, 'শুনলে?'

চন্দ্রবাবু নিজের মনকে এই ভেবে প্রবোধ দিতে চাইলেন, 'মহারাজা দেখতেও সুপুরুষ নন, বয়সেও নবীন নন। কিন্তু লীলা হবে মহারাণী আর সম্পত্তিও পাবে বিশ লক্ষ টাকার, তার পক্ষে যেটা কল্পনাতীত। সুতরাং এমন বিবাহে সম্মতি দিলে আমার পক্ষে বিশেষ অন্যায় হবে না।' প্রকাশ্যে বললেন, 'কিন্তু মহারাজা, আমার একটি আরজি আছে।'

—'বল।'

—'বিবাহের আগে লীলার সঙ্গে আপনার পরিচয় করা উচিত।'

—'আজ আর সময় নেই। কাল ঠিক সন্ধ্যা আটটার সময়ে তোমার বাড়িতে আমি যাব।'

—'আমার ঠিকানা জানেন?'

—'জানি। গয়নার বাক্সটা তোমার কাছেই রেখে গেলুম।'

—'একটা রসিদ দিই?'

চলে যেতে যেতে মহারাজা বললেন, 'কোন দরকার নেই। আমাকে ঠকাতে পারে এমন কোন মানুষকে আমি জানি না।'

চন্দ্রবাবুর মনে হল, ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল যেন একটা অপার্থিব ছায়া!

আনন্দ নিজের সন্দেহভঞ্জনের জন্যে আজও গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে। আজও মহারাজা বাহাদুরকে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতে দেখলে না।

ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত, বড়ই ভয়াবহ! কিন্তু মুখে সে কিছুই প্রকাশ করলে না।

আর এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা করবার মতন মনের অবস্থাও ছিল না তার। সে বুঝলে, তার সুখের মেঘে আগুন লাগতে আর দেরি নেই। যাকে কেন্দ্র করে তার ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হয়ে উঠেছিল, এইবারে সেই দেবীকে বিসর্জন দিতে হবে অশ্রুজলে। তবু সে স্বার্থপর হতে চায় না। লীলা যদি সুখী হয়, হোক্ সে মোহনপুরের মহারাণী।

৫

ভয়াবহ মহারাজা

পরের দিন সন্ধ্যা আটটার কিছু আগে।

চন্দ্রবাবু অতিথি সৎকারের জন্যে আহার্যের আয়োজন করেছিলেন প্রচুর। ডিমের পরোটা, লুচি, পোলাও, মাংস, তিন রকম মাছ, তিন রকম নিরামিষ তরকারী, রুই মাছের ডিমের চাট্‌নি, ইলিশ মাছের ডিম ভাজা, সন্দেশ, রসগোল্লা, দই, রাবড়ি ও ছানার পায়স প্রভৃতি। লীলা নিজের হাতে সারা দিন ধরে এই-সব রেঁধেছে। যদিও এখনো সে জানে না যে অতিথি আসছেন, তাঁর সঙ্গে তার ভবিষ্যতের সম্পর্ক কি!

আনন্দও তার কাছে কোন কথা ভাঙেনি। নিজের দুঃখ সে পুষে রেখেছে নিজের মনের ভিতরেই।

বোধহয় তার মুখেও মনের ছায়া পড়েছিল কিছু-কিছু। কারণ লীলা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে, 'আনন্দবাবু, আপনার মুখ আজ শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

আনন্দ সহাস্যে লীলার প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়েছে এই বলে, 'শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই।'

বাজল আটটা। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানার দরজার সামনে দেখা গেল মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুরকে।

চন্দ্রবাবুর বুকের কাছটা ধ্বক্ করে উঠল। এমন আকস্মিকভাবে মহারাজার আবির্ভাব তিনি প্রত্যাশা করেন নি। মহারাজা আত্মপ্রকাশ করলেন যেন হাওয়ার ভিতর থেকেই। যদিও এমন চিন্তা হাস্যকর, তবু এই কথাই মনে হল চন্দ্রবাবুর।

কিন্তু বিস্মিত হল না আনন্দ। সে এইটেই আশা করছিল।

মহেন্দ্রনারায়ণ দরজার কাছ থেকেই বললেন, 'আমার হাতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী কোথায়?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দোতালায়।'

—'তবে দোতালায় চল।' মনে রেখ, 'কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার সময়ে আমাকে এখান থেকে যেতে হবে।'

ভালো করে মহেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু কেমন শিউরে উঠলেন! আনন্দেরও দুই চক্ষু হল বিস্ফারিত।

মহেন্দ্রনারায়ণ আজ এসেছেন পদস্থ সৈনিকের বেশে এবং তাঁর সমস্ত মুখখানা স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। আর সে কী মুখ!

মুখের রঙ একেবারে হলদে, তার মধ্যে রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। চোখের

তারার উপর ও নীচের দিকেও দেখা যাচ্ছে সাদা অংশ—সে যেন কোন উন্মাদগ্রস্থের চোখ! মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষ, কটা চুলগুলো এসে পড়েছে কাঁধের উপরে, যেন তৈলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘুচে গেছে বহুকাল! ওষ্ঠাধর কালো কুচ্‌কুচে, তাদের ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে দু-পাশে দুটো শ্বাপদের মতন হিংস্র, হল্‌দে-রঙের লম্বা দাঁত! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এ যেন অনেক দিন আগেকার গলায়-দড়ি-দিয়ে-মরা মানুষের মুখ, কোন দুষ্ট প্রেতাত্মা দেহের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে মুখখানাকে জ্যান্তো করে রেখেছে কতকটা!

মনের ভাব প্রাণপণে গোপন করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'বেশ, আসুন মহারাজা বাহাদুর, আমরা দোতালাতেই যাই।'

সশব্দে ভারি ভারি পা ফেলে মহেন্দ্রনারায়ণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন—ঠিক যন্ত্রচালিত কোন মূর্তির মতন। কিংবা যেন কোন পুতুল বাজির পুতুলকে চালনা করছে অদৃশ্য রজ্জুর সাহায্যে!

উপরের ঘরে বসেছিল লীলা। মহেন্দ্রনারায়ণকে দেখেই সে চমকে আড়ষ্ট হয়ে রইল কাঠের মতন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'লীলা, ইনি হচ্ছেন মোহনপুরের মহারাজা বাহাদুর।'

লীলা নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

মহেন্দ্রনারায়ণ প্রায় আধ মিনিট ধরে লীলার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চন্দ্রমোহন, একবার ঐ ঘরে আমার সঙ্গে এস।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'যাচ্ছি মহারাজা বাহাদুর! আপনার যখন সময় নেই তখন তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে যাই।'

মহেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে বললেন, 'খাবার!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'মহারাজা বাহাদুর! আপনাকে খাওয়াবার শক্তি আমার কোথায়? সামান্য আয়োজন।'

—'সামান্য বা অসামান্য কোন খাদ্যই আমি গ্রহণ করতে পারব না।'

—'সে কি! লীলা এত কষ্ট করে রেঁধেছে।'

—'বাজে সময় নষ্ট কোরো না। পাশের ঘরে চল।'

অগত্যা আর বাক্যব্যয় না করে মহেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে চন্দ্রবাবু পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, 'এখন কি আদেশ বলুন।'

—'এই নাও দশ লক্ষ টাকার নোট। লীলাকে আমি সঙ্গে নিয়ে মোহনপুরে ফিরে যেতে চাই।'

—'বিবাহ না করেই?'

—'আমাদের বংশের নিয়ম, পাত্র রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে পাত্রীকে বিবাহ করবে।'

—'মহারাজার রাজ্যের কথা জানি না, কিন্তু এদেশে ও-নিয়ম অচল।'

মহেন্দ্রনারায়ণ সিধে হয়ে দাঁড়ালেন, মাথায় তিনি যেন উঁচু হয়ে উঠলেন আরো এক ফুট! দীপ্ত চক্ষে চন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরকে গম্ভীরতর করে বললেন, 'চন্দ্রমোহন! আমাকে তোমাদের দেশের নিয়ম মেনে চলতে হবে নাকি? লীলাকে আমার হাতে সমর্পণ করবে বলে তুমি কথা দিয়েছ—নিজের কথা রাখতে তুমি বাধ্য। কাল আমার সঙ্গে মোহনপুরে যেতে হবে। বুঝলে? বুঝলে? বুঝলে?'

সেই দীপ্ত দৃষ্টির মধ্যে ছিল কোন জাদু! আবার চন্দ্রবাবুর মনে হল, তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল! সামনের মূর্তি যেন প্রভু, তিনি যেন গোলাম! মাথা নত করে বললেন, 'যে আজ্ঞে, তাই হবে।'

—'কাল সকাল দশটার সময় সিপাহিদের সঙ্গে ডুলি আসবে। লীলা যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। তার সঙ্গে আর কেউ যেতে পারবে না। এই আমার আদেশ। তুমি কথা দিয়েছ, এ আদেশ অমান্য করে নিজের বিপদকে ডেকে এনো না।' মহেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে এবং তারপর বেরিয়ে গেলেন বাড়ির ভিতর থেকে।

চন্দ্রবাবু আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

লীলা ও আনন্দ সেই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

লীলা সভয়ে বললে, 'উঃ, মহারাজের কি ভয়ঙ্কর চেহারা!'

চন্দ্রবাবু যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতন বললেন, 'ভয়ঙ্কর চেহারা?'

লীলা শিউরে উঠে বললে, 'মাগো! তুমি কি লক্ষ্য করে দেখ নি মহারাজা যতক্ষণ এখানে ছিলেন, একবারও তাঁর চোখের পাতা পড়ে নি? ঠিক যেন মরা মানুষের চোখ!'

আনন্দ বললে, 'আমি আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে জ্যান্তো মানুষের বুক ওঠে আর নামে। কিন্তু মহারাজের বুক ছিল একেবারে স্থির। ঠিক যেন মরা মানুষের বুক!'

চন্দ্রবাবু বললেন 'তোমরা ভুল দেখেছ। মরা মানুষ কখনো চলে-ফেরে, কথা কয়?'

লীলা বললে, 'সে কথা সত্যি। কিন্তু আমি যদি একটি রাজ্য পাই, তাহলেও তোমার মহারাজা বাহাদুরকে আবার চোখে দেখতে রাজি হব না!'

চন্দ্রবাবু শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'আমি বললেও রাজি হবি না!'

লীলা আদর করে দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'তুমি বললে সব পারি।'

—'পারিস্ তো?'

—'হ্যাঁ জ্যাঠামশাই!'

—'তাহলে শুনে রাখ, ঐ মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। আমি কথা দিয়েছি।'

লীলা দারুণ বিস্ময়ে চমকে উঠল।

চন্দ্রবাবু আবার বললেন, 'কাল সকালে দশটার সময়ে তোকে মোহনপুরে নিয়ে যাবার জন্যে মহারাজের লোকজন আসবে। সঙ্গে আমরা কেউ থাকব না। তোর বিয়ে হবে মোহনপুরেই।' তাঁর মনে হল কেউ যেন জোর করে তাঁকে বাধ্য করলে এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে!

লীলা চেয়ে রইল বিস্ফারিত চক্ষে।

চন্দ্রবাবু আবার বললেন, 'মহারাজ বাহাদুর তোর জন্যে বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন।'

লীলা কিছু বললে না, কেবল মাথা করলে নত।

৬

মোহনপুর

লীলা মোহনপুরে চলে গিয়েছে। তার অভাবে সমস্ত বাড়িখানা ঠেকছে ফাঁকা-ফাঁকা। চন্দ্রবাবুর আর কিছু ভালো লাগে না।

নিজেকে তাঁর অপরাধী বলে মনে হয়। একজন অজানা—কেবল অজানা নয়, প্রাচীন-বয়সী এবং ভয়াভয়-রূপে কুৎসিত বিদেশীর হাতে টাকার লোভে এমন করে লীলাকে সমর্পণ করা তাঁর পক্ষে উচিত হয় নি কিছুতেই। না জানি তিনি লীলার চোখে হীন হয়ে পড়েছেন কতখানি!

কিন্তু লীলা তো কিছুই জানে না, তাঁর কোন উপায় ছিল না। মহেন্দ্রনারায়ণ নিশ্চয়ই মায়াবী। সে যখনি এসেছে তখনি কি মন্ত্রগুণে তাঁকে বশ করে ফেলেছে।

তার সামনে তিনি হারিয়ে ফেলতেন নিজের সমস্ত নিজস্ব। তার হাতে লীলাকে তিনি তুলে দিয়েছেন নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই। লীলার সঙ্গে দেখা হলে এই সত্যটাই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আনন্দও যে মন-মরা হয়ে আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। চন্দ্রবাবুর বাড়িতেও সে খুব অল্পক্ষণই থাকে। চিত্রশালায় গিয়ে দিনের অধিকাংশ সময়েই সে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থেকে ভোলবার চেষ্টা করে লীলার অভাব। তিন দিনের কাজ সে শেষ করে ফেলে এক দিনে।

প্রায় এক মাস কেটে গেল লীলার কোন খবর নেই।

একদিন আনন্দকে ডেকে চন্দ্রবাবু বললেন, 'ব্যাপার বড় ভালো বুঝছি না।'

—'কি ব্যাপার?'

—'যাবার সময়ে লীলা বলে গিয়েছিল নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র লিখবে। কিন্তু এক মাসেও তার একখানা চিঠিও এল না। এর কারণ কি?'

—'হয়তো তার অসুখ করেছে।'

—'আমারও সেই ভাবনা হচ্ছে। এখন কি করা উচিত বল দেখি?'

—'মোহনপুরে নিজে একবার যান না।'

—'মহারাজা যদি অসন্তুষ্ট হন?'

—'কেন?'

—'আমি গরিব। তুচ্ছ পোটো। সকলের সামনে আমাকে শ্বশুর বলে মানতে যদি তাঁর মানে বাধে?'

—'তবু আপনার যাওয়া উচিত।'

—'এ কথা ঠিক। লীলার প্রতিও তো আমার কর্তব্য আছে! বেশ আনন্দ, কালকেই আমি মোহনপুরে যাত্রা করব।'

কলকাতা থেকে মোহনপুর হচ্ছে প্রায় দুই শত মাইল।

মোহনপুর হচ্ছে একটি ছোটোখাটো শহর। প্রধান রাজপথটি মাঝারি আকারের, সোজা চলে গিয়ে শেষ হয়েছে রাজবাড়ির ফটকের সামনে। ফটকের মুখে বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দিচ্ছে সুসজ্জিত সিপাহী। প্রকাণ্ড প্রাসাদ— মাঝখানে মস্ত গম্বুজ।

চন্দ্রবাবু সিপাহীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হবে?'

—'ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।'

—'তিনি কোথায়?'

—'ঐ যে, এইদিকেই আসছেন।'

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাজবাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। চন্দ্রবাবু তাঁকে নমস্কার করলেন।

ম্যানেজার বললেন, 'মহাশয়ের কি চাই?'

—'একবার মহারাজা বাহাদুরের দর্শন প্রার্থনা করি।'

—'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

—'কলিকাতা থেকে।'

—'আপনি মহারাজ বাহাদুরকে চেনেন?'

—'কিছু কিছু চিনি।'

—'কি সূত্রে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?'

চন্দ্রবাবু ভেবেছিলেন, মহারাজার সঙ্গে তাঁর আসল সম্পর্কের কথা বাইরের কারুর কাছে ভাঙবেন না। কিন্তু এখন তাঁকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হয়েছে।'

ম্যানেজার চমকিত চোখে চন্দ্রবাবুর মুখের পানে তাকালেন। বললে, 'অসম্ভব!'

চন্দ্রবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, 'কেন, অসম্ভব কেন? আমার চেহারা হোমড়া-চোমরা নয় বলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীও কি মহারাজের অযোগ্যা?'

—'না মশাই, তা নয়। আমি সেজন্যে অসম্ভব বলছি না।'

—'তবে?'

—'আমাদের মহারাজা এখনো বিবাহ করেন নি।'

এইবারে চন্দ্রবাবুর বিস্মিত হবার পালা। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'এত বয়সেও তাঁর বিবাহ হয় নি, আমাকে কি এই কথা বিশ্বাস করতে হবে?

—'মশাই কি বলছেন? আমাদের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ এই সবে তেইশে পা দিয়েছেন!'

চকিত স্বরে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনাদের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ?'

—'হ্যাঁ, আমাদের মহারাজার ঐ নাম।'

—'তবে কি তিনি কলিকাতায় গিয়ে নাম ভাঁড়িয়েছিলেন?'

—'কলকাতায় কতদিন আগে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

—'মাসখানেক আগে।'

ম্যানেজার এইবারে হেসে বললেন, 'মশাই কোন জুয়াচোরের পাল্লায় পড়েছেন। আমাদের মহারাজা সবে গেল হপ্তায় বিলাত থেকে ফিরেছেন। বিলাতে তিনি আট মাস ছিলেন।'

চন্দ্রবাবুর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। তবে কি তিনি লীলাকে সমর্পণ করেছেন কোন প্রতারকের কবলে? তবু তিনি একটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বলে কেউ আছেন?'

—'একালে নেই। সেকালে ছিলেন।'

—'মানে?'

—'মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন বর্তমান মহারাজার পিতামহ। ষাট বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

চন্দ্রবাবু সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মন্ত্রাচ্ছন্ন স্তম্ভিতের মতন। তারপর তাঁর মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল আর এক ভয়াবহ সম্ভাবনার বিদ্যুৎ! তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, 'মহেন্দ্রনারায়ণের কোন প্রতিকৃতি আছে?'

ম্যানেজার হেসে বললেন, 'আপনি সন্দেহভঞ্জন করতে চান? বেশ, আসুন। রাজবাড়ির বৈঠকখানায় মহারাজার পূর্বপুরুষদের 'অয়েল পেন্টিং' আছে।'

প্রকাণ্ড বৈঠকখানা, রাজকীয় ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ—দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় নতুন ও পুরাতন মূর্তিচিত্র।

একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ম্যানেজার বললেন, 'ঐ দেখুন মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণকে। শুনেছি তাঁর মৃত্যুর তিনদিন আগে ছবিখানা আঁকা হয়। তিনি হঠাৎ মারা যান জলে ডুবে। তাঁর দেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি।'

কিন্তু এ-সব কথা চন্দ্রবাবুর কর্ণে প্রবেশ করছিল না। প্রায় বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে তিনি চিত্রাঙ্কিত মহেন্দ্রনারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন নিষ্পলকনেত্রে।

এই তো লীলার স্বামী মহেন্দ্রনারায়ণ! তবে তিনি দেখেছেন এক অপার্থিব মৃত মুখ, আর এ মুখ হচ্ছে জীবন্ত মানুষের—আকাশপাতাল তফাত, কিন্তু মুখ এক!

চন্দ্রবাবুর মনে হল ছবির মহেন্দ্রনারায়ণ যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে ক্রূর উপহাসের হাসি হাসলেন!

ম্যানেজার তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'মশাই, সাড়া দেন না কেন? এখন আপনার সন্দেহ মিটল তো?'

সুপ্তোত্থিতের মতন চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাঁ, কি বলছেন? হ্যাঁ, একমাস আগে এই মূর্তিই আমার বাড়িতে গিয়েছিল।'

—'পাগলের মতন প্রলাপ বকরেন না।'

চন্দ্রবাবু হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'পাগল এখনো হই নি, এইবারে হব'—বলতে বলতে তিনি অবশ হয়ে বসে পড়লেন গৃহতলে।

৭

অপার্থিব দুঃস্বপ্ন

রাত নয়টার সময়ে চন্দ্রবাবু শেষ-আহার করতেন। সেদিনও আনন্দের সঙ্গে তিনি আহারে বসেছিলেন।

গতকল্য তিনি মোহনপুর থেকে কলিকাতায় ফিরছেন। তাঁর মুখ থেকে সব শুনেছে আনন্দও।

দুজনেরই মনের অবস্থা ভালো নয়। কথা নেই কারুর মুখেই। হঠাৎ সজোরে বেজে উঠল সদর দরজার কড়াজোড়া। তারপর হল দরজা-খোলার শব্দ।

চন্দ্রবাবু বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'বেয়ারা কেন দরজা খুলে দিলে? এত রাত্রে কে আবার জ্বালাতে এল?'

সিঁড়ির উপরে লঘুপদের দ্রুত শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ছুটে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল লীলা!

কিন্তু কী মূর্তি! কী বেশ!

এলোমেলো এলানো চুল—যেন তেল-জলের সঙ্গে বহুকালের সম্পর্ক নেই! অসম্ভব আতঙ্কে চোখ দুটো যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গাল দুটো গেছে ভিতরে বসে এবং থর্ থর্ করে কাঁপছে সারা গা।

ধুলো-কাদা মাখা পরনের কাপড়ে পাট নেই, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া এবং সেখানা হচ্ছে সেই কাপড় যা পরে সে গিয়েছিল মোহনপুরে।

মাটির উপরে ধপাস্ করে বসে পড়ে লীলা চেঁচিয়ে উঠল, 'জল! জল! নইলে এখনি বুক ফেটে যাবে।'

আনন্দ তাড়াতাড়ি জল এনে দিলে, সে এক সঙ্গে ঢক্ ঢক্ করে তিন গেলাস জল খেয়ে ফেললে। যেন তার নির্জল মরুযাত্রীর তৃষা!

আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, 'খাবার! খাবার! নইলে এখনি আমি মরে যাব!'

চন্দ্রবাবু নিজের খাবারের পাত্রগুলো তখনি তার দিকে ঠেলে দিলেন। সে দুই হাতে গোগ্রাসে খাবারগুলো মুখে তুলে খেয়ে ফেললে, কিন্তু মিটল না তার দারুণ ক্ষুধা! নিজেই হুমড়ি খেয়ে আনন্দেরও খাবারের পাত্রগুলো টেনে নিয়ে আবার দুই হাতে খেতে আরম্ভ করলে—যেন তার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা!

চন্দ্রবাবু নির্বাক বিস্ময়ে লীলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করতে লাগলেন। আনন্দও।

পানাহার শেষ করেই সে ভীতস্বরে বলে উঠল, 'সব কথা পরে হবে। যদি

আমাকে বাঁচাতে চাও, শিগগির একজন ভাল রোজা ডেকে আনো! একটুও দেরি কোরো না—একটুও না!'

আনন্দ রোজা ডাকতে ছুটল। সেই পাড়াতেই এক বিখ্যাত রোজার বাড়ি ছিল।

মিনতি-ভরা কণ্ঠে লীলা বললে, 'জ্যেঠামশাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এ ঘরে আমাকে একলা ফেলে যেও না!'

—'যাব না মা, যাব না। আমি তোর কাছেই থাকব!'

—'হ্যাঁ, আমার কাছেই থাকো। একলা হলেই আবার আমি মরব!'

—'তোর কথার মানে বুঝতে পারছি না।'

আগেই বলেছি এ-ঘরের মাঝের এক দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায় এবং দেখাও যায় তার ভিতরটা! সেইদিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠে লীলা অতি আর্তস্বরে আবার চিৎকার করে উঠল, 'ওগো সে এসেছে, সে এসেছে!'

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কে এসেছে রে?'

—'সে, সে, সে! তার নাম নেই, তার দেহ নেই, কিন্তু আছে। জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই, তুমি কি পচা মড়ার দুর্গন্ধ পাচ্ছ না?'

চন্দ্রবাবু ভয় পেয়ে বললেন, 'কই, পাচ্ছি না তো!'

—'কিন্তু আমি পাচ্ছি। আমাকে সে ঠকাতে পারবে না।'

—'তুই কার কথা বলছিস্!'

—'সে আমাকে আবার নিয়ে যেতে এসেছে, সে!'

—'কোথায় সে?'

আঙুল দিয়ে পাশের ঘর দেখিয়ে কাঁদন-ভরা গলায় লীলা বললে, 'ঐখানে! ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! উঃ!'

পাশের ঘরের দিকে ত্রস্ত চক্ষে তাকালেন চন্দ্রবাবু। হ্যাঁ, ওখানে সুদীর্ঘ ছায়ার মতন কি একটা দেখা যাচ্ছে বলেই তো বোধ হচ্ছে! তারপর ভালো করে দেখে বুঝলেন, তাঁর চোখের ভ্রম। উপর থেকে সমুজ্জ্বল আলোর আঁধার ঝুলছে, ছায়া বা কায়া কোন-কিছুই নেই ওখানে। খালি ঘর।

বললেন, 'তুই ভুল দেখছিস্ লীলা। ও-ঘরে কেউ নেই।'

দুই বাহু দিয়ে চন্দ্রবাবুকে জড়িয়ে ধরে লীলা আকুল-স্বরে বললে, 'আছে, আছে, আছে! আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ও আমাকে আবার নিয়ে যাবে।' তুমি যদি একবার ছেড়ে যাও, ও আবার আমাকে নিয়ে যাবে।'

এমন সময়ে রোজাকে সঙ্গে করে আনন্দ পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল।

রোজা ভিতর এসেই বললে, 'আমি এই ঘরে কোন দুষ্ট আত্মাকে অনুভব

করছি।.......হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই। দুষ্ট আত্মা—পিশাচ, পিশাচ! রাজা নলের দেহে যেমন শনি ঢুকেছিল, সেও তেমনি কোন মানুষের মৃতদেহের মধ্যে ঢুকে পৃথিবীর উপর অত্যাচার করে বেড়ায়। ভীষণ পিশাচ! আমাকে আগে এই ঘরে বসেই কাজ আরম্ভ করতে হবে।'

আনন্দ ভীত ও সন্দিগ্ধনেত্রে পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল। কিন্তু সন্দেহ করবার মতন কোন-কিছুই দেখতে পেলে না। অথচ এইটুকু অনুভব করতে পারলে, ঘরের ভিতরে সে এবং রোজা ছাড়া অন্য কোন হিংস্র, ভয়ানকের অস্তিত্ব আছে।

উত্তেজনার পর উত্তেজনায় চন্দ্রবাবুর দেহ ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই রোজার কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ।

লীলা চোখের সামনে কি দেখতে পাচ্ছিল তা সেই-ই জানে, কিন্তু এইবারে সে দুই চক্ষু দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

রোজা মাটির উপরে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে উদ্যত হল—এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একটা প্রবল দম্‌কা হাওয়া—সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে বিলম্বিত আলোটা হল নির্বাপিত।

রোজা চিৎকার করে বললে, আলো, আলো—শিগগির আর একটা 'আলো আনো। অন্ধকারে ফুটে উঠেছে দুটো মারাত্মক দীপ্ত চক্ষু, এখনি সর্বনাশের সম্ভাবনা। শিগগির আলো,—আলো, আলো, আলো!'

চন্দ্রবাবু আত্মহারার মতন এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে টেবিলের উপর থেকে আলোটা তুলে ও-ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

লীলা তীক্ষ্ণস্বরে কেঁদে উঠে বললে, 'জ্যাঠামশাই যাবেন না—যাবেন না—আমাকে একলা ফেলে যাবেন না, জ্যাঠামশাই।'

'আমি তোর সামনেই আছি মা, আলোটা ও-ঘরে রেখেই আবার তোর পাশে এসে বসব'—বলতে বলতে চন্দ্রবাবু পাশের ঘরে গিয়ে আলোটা মেঝের উপরে বসিয়ে দিয়েই আবার এ-ঘরে ফিরে আসবেন—

এমন সময় আচম্বিতে মাঝের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে! পর মুহূর্তেই লীলার কণ্ঠে জাগল পরিত্রাহি চীৎকারের পর চীৎকার!

চন্দ্রবাবু পাগলের মতন মাঝের দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আনন্দ ও রোজা যোগ দিলে তাঁর সঙ্গে। ও-ঘরের মধ্যে লীলার বিষম চীৎকার ও ব্যাকুল ক্রন্দন আরো বেড়ে উঠল, কিন্তু তিনজনের সমবেতশক্তিও দরজার পাল্লা দুখানাকে এক চুল ফাঁক করতে পারলে না।

তারপরেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল লীলার কণ্ঠস্বর! ও-ঘরের বারান্দার

দিকের একটা দরজা খোলার শব্দ হল। এবং তারপরেই অকস্মাৎ খুলে গেল মাঝের ঘরের বন্ধ দরজাটা। যারা প্রাণপণে দরজা ঠেলছিল তারা সকলেই টাল সামলাতে না পেরে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ও-ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গেল হুম্‌ড়ি খেয়ে!

আলো এনে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

আনন্দ বারান্দায় যাবার খোলা দরজা দিয়ে ছুটে গেল বাইরে।

সেদিন উঠেছিল প্রতিপদের চাঁদ। চারিদিক করছে ধবধব।

বারান্দার তলাতেই একটি ছোট রাস্তা। তারপরেই একটা পুষ্করিণী এবং তার ভাঙা ঘাট।

সেই ভাঙা ঘাটের সামনে পুষ্করিণীর খানিকটা জল ঘুরছিল চক্রের পর চক্র দিয়ে। যেন এইমাত্র সেখানে কোন ভারি জিনিস পড়েছে কিংবা কেউ ঝাঁপ খেয়ে অতলে তলিয়ে গিয়েছে।

এক যুগ পরে

তারপর কেটে গিয়েছে বারো বৎসর—অর্থাৎ এক যুগ।

দেবতারা নাকি অমর, তাঁদের কথা বলতে পারি না; কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে এক যুগ বড় অল্পকালের কথা নয়। এই দেখ না, ধরতে গেলে বারো বৎসরের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীতে রক্তসাগরের ঢেউ খেলার জন্যে ধূমকেতুর মতন হিটলারের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান।

বারো বৎসর পরে লীলাকে না ভুললেও তার অভাব আনন্দকে আর তেমন ভাবে আঘাত দেয় না। চন্দ্রবাবু পরলোকে। নিজের সম্পত্তি তিনি দান করে গিয়েছেন আনন্দকেই এবং আনন্দও এখন একজন ভারতবিখ্যাত চিত্রকর। তার খ্যাতি হয়তো চন্দ্রবাবুর চেয়েও বেশী।

সেদিন আনন্দ চিত্রশালায় বসে নিজের মনে কাজ করছে। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। আনন্দ মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে।

আগন্তুক বললেন, 'আমি মোহনপুরের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

মোহনপুর, মোহনপুর! স্মৃতি-বীণার একটি পুরাতন তার নূতন করে বেজে উঠল অনেকদিন পরে!

বাইরে কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার কাছে কি দরকার?'

—'মহারাজা বাহাদুরের একখানা তৈলচিত্র আঁকবার জন্যে আপনি মোহনপুরে যেতে পারবেন? পারিশ্রমিক যা চাইবেন পাবেন।'

আনন্দ সম্মতি জানালে।

—'কবে যেতে পারেন?'

—'আগামী রবিবার।'

যথাসময়ে আনন্দ মোহনপুরে গিয়ে হাজির হল।

বৈঠকখানায় বসেছিলেন মহারাজা বাহাদুর। অতি সদালাপী লোক। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ আনন্দের দৃষ্টি পড়ল মহেন্দ্রনারায়ণের প্রকাণ্ড তৈলচিত্রের উপরে। মহারাজের কি-একটা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সে একেবারে থেমে গেল—বিস্ফারিতনেত্রে আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল ছবিখানার দিকে। তার মনে হল ছবির মুখ যেন তাকে দেখেই নির্দয় ব্যঙ্গভরা হাসি হাসছে।

মহারাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে আমার পিতামহের ছবি দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন! কেন বলুন দেখি?'

আনন্দ তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলে নিলে।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে আনন্দ বাসার দিকে ফিরে আসছে। মোহনপুর এবং তার আশেপাশে দেখবার কিছুই নেই, বন, মাঠ আর নদী ছাড়া।

তখন চাঁদ উঠেছিল। খণ্ডচাঁদ। অন্ধকার একটুখানি পাৎলা হয়েছিল বটে, কিন্তু ভালো করে নজর চলে না। তার উপরে আনন্দ যেখান দিয়ে আসছিল সেখানে পথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে বড় বড় গাছের পর গাছ সৃষ্টি করেছে অন্ধ-করা অন্ধকার।

তফাতে দেখা যাচ্ছে একটা আলো।

খানিক এগিয়ে আনন্দ দেখলে, আলো হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মূর্তি। আরো এগিয়ে বুঝলে মূর্তিটা স্ত্রীলোকের। কাছে এসে দেখলে, লীলার মূর্তি!

নিজের চোখকে আনন্দ বিশ্বাস করতে পারলে না, চমৎকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

লীলা নীরবে হাসলে—অতি মৃদু করুণ হাসি।

আনন্দ বললে, 'লীলা।'

ওষ্ঠাধরে তর্জনী রেখে লীলা কথা কইতে মানা করলে আনন্দকে। তারপর ইসারা করে বললে আনন্দকে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে। তারপর সে অগ্রসর হল।

লীলার পিছনে পিছনে যেতে যেতে তার হাতের লণ্ঠনের আলোতে আনন্দ এটাও লক্ষ্য করলে, আজও সে পরে আছে সেই কাপড়খানাই, যা পরে যাত্রা করেছিল মোহনপুরের দিকে।

বন। এত নিস্তব্ধ যে একটা ঝিঁঝিঁপোকাও ডাকছে না, গাছের একটা পাতার শব্দও হচ্ছে না। মরে গিয়েছে পৃথিবী। এটা যেন ইহলোক নয়, পরলোক।

বন শেষ। নদীর ধার, কিন্তু জলকলরোল শোনা যায় না। মরা চাঁদের আলো। বাতাসের দম বন্ধ।

একখানা পুরানো বাড়ীর খানিকটা ভেঙে পড়েছে, খানিকটা দাঁড়িয়ে আছে। লীলা তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একখানা মস্ত ঘর। তারই মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল লীলা এবং আনন্দ।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড পালঙ্ক—চারিধার তার মশারি দিয়ে ঘেরা।

মৌনমুখে ধীরপদে এগিয়ে গিয়ে লীলা মশারির কাপড় টেনে তুললে।

খাটের উপর একেবারে সিধে হয়ে বসে আছে মোহনপুরের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণের বিভীষণ মূর্তি!

বিকট চীৎকার করে আনন্দ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

পরদিন প্রভাতে নদীর ধারে মোহনপুরের শ্মশানে আনন্দকে পাওয়া গেল। তখনও তার মূর্চ্ছা ভাঙে নি। তার কাছে ছিল একটা সেকেলে লণ্ঠন।

জীবন্ত মৃতদেহ

এক

সুরমা সমুদ্র দেখেনি। এবার পূজার সময়ে সুরেশের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ল, 'দাদা আমাকে সমুদ্র দেখাও।'

সুরেশ মাথা নেড়ে বললে, 'এ-যাত্রায় হল না বোন!'

'কেন?'

'পূজার ছুটি পাব বটে, কিন্তু ছুটিতে কলকাতায় কাজও আছে। আমি বড়-জোর হপ্তাখানেক বাইরে থাকতে পারি। কিন্তু সমুদ্র দেখতে গেলে পুরীতে যেতে হয়। হপ্তাখানেকের জন্য পুরীতে গিয়ে কি হবে? মজুরীতে পোষাবে না।'

সুরেশের বন্ধু দীপক সেখানে বসেছিল। সে বললে, 'সমুদ্র দেখবার জন্যে উড়িষ্যা মুল্লুকে ছুটতে হবে কেন?'

—'কারণ বাঙালীর পক্ষে সেইটেই হচ্ছে 'সর্ট-কাট্'!'

—'দেখ সুরেশ, আমরা প্রায় ভুলেই যাই, সমুদ্রের স্পর্শ থেকে বাংলাদেশও বঞ্চিত নয়।'

—'হাঁ দীপক, আমিও তা জানি। কিন্তু কাছাকাছির ভিতরে পুরীর মতন অন্য কোথাও যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা নেই।'

দীপক বললে, 'সুরমা পুরীর চেয়ে ঢের কাছে তুমি সমুদ্রকে পেতে পারো।'

সুরমা সাগ্রহে বললে, 'কোথায়, দীপুদা?'

—'কাঁথিতে,' আমাদের দেশ কাঁথির কাছে।

—'সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়?'

—'নিশ্চয়, নইলে আর বলছি কেন! আমরা এখন কলকাতার বাসিন্দা হয়েছি বটে, কিন্তু দেশের বাড়িখানা আছে আমাদের পুরানো চাকর সনাতনের জিম্মায়। সুরেশ, দিন পাঁচ-ছয়ের ভিতরে যদি সুরমাকে নিয়ে সমুদ্র দেখে আবার কলকাতায় ফিরতে চাও, তবে বাঁধ মোট, কেনো টিকিট, চল আমাদের দেশ! তোমাদের রাজভোগ দিতে পারব না বটে, তবে অনাহারেও থাকতে হবে না। কি বল? রাজি?'

হয়তো অদৃষ্টেরই কারচুপি। নারাজ হবার মতন বুদ্ধি খুঁজে না পেয়ে সুরেশ বলতে বাধ্য হল, 'আচ্ছা, রাজি।'

—'তাহলে 'ষষ্ঠির' দিনই আমরা যাত্রা করব।'

—'হাঁ। দশমীর পরেই আমাকে আবার কলকাতায় ফিরতে হবে। জরুরী কাজ।'

দুই

কিন্তু দশমীর পরেই সুরেশ ফিরতে পারলে না কলকাতায়। দেবতা সাধলেন বাধ।

সুরমার ভাগ্যে সমুদ্র-দর্শন হল—ভালো করেই হল। সেই অনন্ত নীল সৌন্দর্যের দিকে প্রথমটা সে তাকিয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে। তারপর কচি মেয়ের মতন সকৌতুকে হাসতে হাসতে নাচের তালে তালে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল সাগর-সৈকতের বালুকা শয্যার উপর দিয়ে।

সুরেশ বললে, 'কলকাতার এত কাছে সমুদ্র, অথচ আমরা জেনেও জানি না। সমুদ্র দেখবার কথা উঠলেই পুরীর কথা মনে হয়।'

দীপক বললে, 'এটা অভ্যাসের দোষ ভায়া। বাংলাদেশের কত জায়গা থেকেই সমুদ্রের নাগাল পাওয়া যায়। 'সমতট' বা দক্ষিণ বাংলার বাসিন্দাদের তো সমুদ্রের ছেলে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যুগে যুগে বাঙালী বাংলার সমুদ্র-পথ দিয়ে যাত্রা করেছে পৃথিবীর দিগবিদিকে। বাংলার প্রথম বন্দর তাম্রলিপ্ত বা তমলুক থেকে খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগেও শত শত জাহাজ যাত্রা করত সমুদ্রের ভিতরে। বাংলার বীর ছেলে বিজয় সিংহ আর চীনা পর্যটক ফাহিয়ান তমলুক থেকেই সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। আজও সমুদ্রগামী জাহাজে অগুন্তি বাঙালী নাবিক কাজ করে। সমুদ্রের সঙ্গে যে বাঙালীর নাড়ীর যোগ আছে।'

সুরমা বললে, 'আমার মনে হচ্ছে দাদা, সমুদ্রকে দর্শন করাও যেন মস্তবড় একটা 'অ্যাডভেঞ্চার'। ও দীপুদা একখানা নৌকা ভাড়া কর না।'

—'কেন?'

—'একবার সমুদ্রের বুকে ভাসতে ইচ্ছে করছে।'

সুরেশ ধমকে দিয়ে বলে, 'না না অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়! সমুদ্র কি পুকুর, না খাল? ঢেউয়ের ধাক্কায় দৈবগতিকে নৌকা যদি ডুবে যায় কি বানচাল হয়, তাহলে সখের 'অ্যাডভেঞ্চারে'রই মজাটা ভালো করেই টের পাবি! যত-সব ছেঁদো কথা! 'অ্যাডভেঞ্চার'।'

তা 'অ্যাডভেঞ্চারে'র মজাটা হাড়ে-হাড়ে টের পেতে সুরমাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না।

আকাশ ছেয়ে গেল কালো কালো মেঘে। মেঘের পর মেঘ, মেঘের ভিতরে মেঘ। দেখতে দেখতে আরম্ভ হল বারিপাত। ক্রমে বৃষ্টি জোর পড়তে লাগল। দিন গেল রাত এল, রাত গেল দিন এল, আবার দিনের পর এল রাত—তবু প্রবল বৃষ্টি ঝরছে অবিশ্রান্ত, ঝুপ ঝুপ ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে আর স্থলে। তার সঙ্গীরূপে জাগ্রত হল ঝোড়ো হাওয়া।

এমন বিস্ময়কর বৃষ্টি সুরমা আর কখনো দেখেনি। বাড়ি থেকে এক পা বেরুবার যো নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে কেবল দেখা যায় বৃষ্টির ধারায় চিকের ভিতর দিয়ে দূরের অস্পষ্ট সমুদ্র এবং দিকে দিকে ঝাপসা বন-জঙ্গল, আর শোনা যায় থেকে থেকে পাগলা ঝড়ের হাহাকার!

তারপর আচম্বিতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল—তার মধ্যে যেন ডুবে গেল জল-স্থল-শূন্যের সমস্ত।

দীপক, সুরেশ ও সুরমা স্তম্ভিতনেত্রে দেখলে, সমুদ্র আকাশমুখো হয়ে লক্ষ

লক্ষ সফেন তরঙ্গ যাদু বিস্তার করে লাফিয়ে উঠেছে উর্দ্ধে, উর্দ্ধে আরো উর্দ্ধে! সর্বাঙ্গ তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারময়!

পৃথিবীর বুকের উপরে মহাশব্দে ভেঙে পড়ে সেই বিপুল জলরাশি ধেয়ে এল উগ্র বেগে! তারপর দিকে দিকে উঠল অগণ্য মানুষ ও জন্তুর কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ আর আর্তনাদ আর আর্তনাদ।

এ সেই চিরস্মরণীয় বন্যার আরম্ভ, যার কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সারা ভারতবর্ষ!

সুরমা অভিভূত কণ্ঠে বলল, 'মনে হচ্ছে, এ যেন প্রলয় পয়োধি জল।'

দীপক ভয়ার্তস্বরে বললে, 'এখন আর কাব্য নয় সুরমা! হ্যাঁ, এ হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্রোত! সমুদ্রের বন্যা ছুটে আসছে পৃথিবীর মাটিকে গ্রাস করতে।'

অজস্র ধারায় ঝরছে আকাশ প্রপাত, হা হা হা হা অট্টহাসি হাসছে দুর্দান্ত ঝটিকা, তাণ্ডব নৃত্যে ছুটে আসছে বন্য বন্যার উত্তাল তরঙ্গদল, কর্ণভেদী মৃত্যু-ক্রন্দন তুলেছে অসংখ্য অসহায় মানব, হুড়মুড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে শত শত ঘর-বাড়ি এবং বনস্পতি। যেন পৃথিবীর অন্তিমকাল উপস্থিত।

তিন

আমরা বন্যার ইতিহাস লিখতে বসিনি, যেটুকু ইঙ্গিত দিলুম সেইটুকুই যথেষ্ট।

বন্যা যখন বিদায় নিলে চারিদিকে দেখা গেল এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য, ভালো করে যা বর্ণনা করতে গেলে ভাষাও বোবা হয়ে যায়; সুতরাং সে অসম্ভব চেষ্টা করব না।

এইটুকু বললেই চলবে যে, কয়েকদিন ব্যাপী ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার পর সূর্যদেব মেঘ সরিয়ে এসে দেখলেন, এ অঞ্চলের বাইরে অধিকাংশ ঘর-বাড়ি একেবারে বিলুপ্ত কিম্বা জলময় হয়েছে এবং অনেক জায়গায় গ্রাম বা অঞ্চল ডুবিয়ে থই থই করছে অগাধ জলরাশি এবং তার উপরে দলে দলে ভাসছে গণনাতীত নর-নারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর মৃতদেহ। যেদিকে তাকাও, দৃষ্টিসীমা জুড়ে এই একই দৃশ্য!

দীপকদের এবং অন্যান্য কারুর বাড়ি ছিল উচ্চ ভূমির উপরে, তাই তারা

কোনক্রমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। কিন্তু দীপকদের বাড়িও একেবারে অক্ষত ছিল না, তার পিছন দিকের যে অংশটা ছিল বেশী পুরাতন তা অদৃশ্য হয়েছে। উঁচু জমির উপরে থাকলেও বাড়ির একতলায় ঢুকেছে বেনো জল, সকলে তাই বাস করছে দোতালায়। কারুর এক তালায় নামবার কোন উপায় নেই। কিন্তু তবু তো তাদের বলতে হবে ভাগ্যবান, কারণ জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কত লোক বাস করছে মুক্ত আকাশের তলায় জলমগ্ন ঘর-বাড়ির ছাদের উপরে বা বনস্পতির শাখায়-শাখায়, এবং এইভাবে হয়তো উপবাস করেই তাদের যে কতদিন থাকতে হবে তা কেউ জানে না।

সুরেশ বললে, 'দীপক, আমাদের যখন এখানে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলে তখন কী বলেছিলে, মনে আছে? তোমাদের অনাহারে থাকতে হবে না।' কিন্তু এখন কি বলতে চাও? আমি সাঁতার জানি না, সুরমাও তাই। বাড়ির নীচে চারিদিকে সমুদ্রের জল বয়ে যাচ্ছে কলকল করে। এই জলরাশি ভেদ করে যে আবার ডাঙা দেখা দেবে, ভগবান জানেন এর মধ্যে আমরা জঠর-জ্বালা নিবারণ করব কেমন করে?'

দীপক বললে, 'ভয় নেই ভায়া! অন্তত দিন তিনচার আমাদের অনাহারের ভয় নেই। কিছু চাল, কিছু ডাল আর কিছু শাক-সজ্জী আমি রক্ষা করতে পেরেছি।'

—'কিন্তু দিন তিন চার পরে?'

—'খুব সম্ভব জল তখন সরে যাবে। ভগবান আমাদের সহায়।'

—'এই যে কত শত মানুষ বানের তোড়ে ভেসে গেল, ভগবান কি তাদের সাহায্য করেছিলেন? ভগবান আমাদের সহায়। ওসব বাঁধা গৎ ছেড়ে দাও।'

—'বাঁধা গৎ নয় বন্ধু, বাঁধা গৎ নয়! ভগবানের উপর বিশ্বাস কখনও হারিয়ো না। যারা বানের জলে ভেসে গেল নিশ্চয়ই তাদের কাল পূর্ণ হয়েছিল, ভগবান তাই তাদের সাহায্য করেন নি। কিন্তু এত বড় দৈবদুর্বিপাকেও আমরা যখন এখনও বেঁচে আছি, তখন আমাদের কাল পূর্ণ হতে দেরী আছে।'

—'বেশ, দেখা যাক।'

খাবার গেল ফুরিয়ে। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ, জলাভাব। জল যা আছে, তা আজকের পক্ষেও অপ্রচুর। মানুষ অনাহারে থাকতে পারে দিন কয়, কিন্তু জলাভাব সহ্য করা অসম্ভব।

অথচ চারিদিকে এত জল! মাটির উপরে এখানে এত জল কেউ কোনদিন দেখেনি! কিন্তু তা হচ্ছে সমুদ্রের লবণাক্ত জল, মাটির জিবের গলা দিয়ে গলে না।

দীপক জানলার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বাহিরটা একবার দেখে নিয়ে বললে,

'সুরেশ, কোন দিকে এখনো জ্যান্ত মানুষের সাড়া পাচ্ছি না। আমার বাড়ির চারিপাশ থেকে জল এখন সরে গিয়েছে বটে, কিন্তু খুব সম্ভব গ্রাম এখন জনহীন। যারা বন্যাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে তারা পালিয়েছে প্রাণ নিয়ে। এমন অবস্থা এখানে হাট-বাজারও বসবে না। রেলপথও হয়তো এখনো জলের তলায়, সুতরাং ট্রেনও চলবে না। কলকাতায় যখন যাবার উপায় নেই, তখন আমাদের কি করা উচিত বল দেখি?'

—'তোমার দেশ, তুমি বল।'

—'নন্দীগ্রামে আমার মামার বাড়ি। এখান থেকে মামার বাড়ি পনেরো মাইলের কম হবে না। যদিও চারিদিকের অবস্থা দেখে সন্দেহ হচ্ছে, জলমগ্ন জমি এড়িয়ে সেখানে যেতে হলে আমাদের হয়তো পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথ পার হতে হবে। সেখানে যাবার চেষ্টা করব কি?'

—'নন্দীগ্রামের অবস্থাও যদি এখানকার মত হয়ে থাকে?'

—'হয়তো হয়েছে। হয়তো হয়নি। হয়তো সেখানে গেলে হয়তো পানাহারের অভাব হবে না। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে একবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?'

—'বোধহয়, উচিত। এখানে থাকলে খাবার আর জলের অভাবে আমরা মারা পড়ব সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।'

সুরমা সভয়ে বললে, 'উঃ। পায়ে হেঁটে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল!'

সুরেশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'হাঁ, তাই! তোর জন্যেই তো এই বিপদ! তোর জন্যেই তো বাংলাদেশে বসে সমুদ্র দেখতে এলুম! এই বাংলাদেশ হচ্ছে ঈশ্বর-বর্জিত দেশ। পুরীতে গিয়ে কেউ এমন বিপদে পড়ে না—সেখানকার সমুদ্র হিংসুক রাক্ষসের মতন নয়, তাই সবাই যেতে চায় সেখানে!'

সুরমা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে, 'রাগ করো না দাদা, কিন্তু তুমি কথা কইছ ঠিক একটি আস্ত বোকার মতন!'

সুরেশ আরো রেগে উঠে বললে, 'তুই 'অ্যাডভেঞ্চার' চেয়েছিলি না? এখন দ্যাখ, কত ধানে কত চাল!'

দীপক বললে, 'শান্ত হও বন্ধু, শান্ত হও! এখন মাথা গরম করবার সময় নয়।....সনাতন, নিরেট খাবার তো খতম। এখন যেটুকু জল আছে একটা 'ফ্লাস্কে' ভরে নাও। তারপর চল, আমরা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি।'

চার

চোখের সামনে দেখলে তারা যে মর্মান্তিক দৃশ্য, যে ভীষণতা ও যে বীভৎসতা, তার পূর্ণ বর্ণনা না দেওয়াই ভালো। কবি দান্তে নরকের যে সব ছবি এঁকেছেন তাও এমন ভয়াবহ নয়।

জনহীনতার মধ্যে বিরাজ করছে যেন এক বিরাট সমাধি-ভূমির শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা। জনহীনতাই বা বলি কেন, যেখানে সেখানে রয়েছে মনুষ্য-মূর্তি—একক, জোড়া-জোড়া বা দলে-দলে; তাদের সংখ্যা গোণা অসম্ভব। কিন্তু তারা সকলেই মৃত। এ হচ্ছে মৃত জনতার দেশ! কত দেহ জলে ভাসছে, কত দেহ পুঞ্জীভূত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে মাটির উপরে।

মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জলমগ্ন জলের উপর অংশ। সে-সব গ্রামে যারা থাকত তাদের অনেকেই ভেসে গিয়েছে বন্যাস্রোতে, বাকী সবাই করেছে প্রাণ নিয়ে পলায়ন।

থেকে থেকে সুদূর বা অল্প দূর থেকে ভেসে আসছে 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনি। আত্মীয়েরা যে-সব দেহের সন্ধান পেয়েছে তাদের নিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে।

সব-আগে দীপক, তারপর সুরেশ, তারপর সুরমা এবং সব শেষে মোট-ঘাট নিয়ে পথ চলছে বৃদ্ধ ভৃত্য সনাতন। তাদের মনের ভিতর কি হচ্ছিল জানি না, কিন্তু তাদের মুখের পানে তাকালে বোধহয়, যেন তারা এগিয়ে যাচ্ছে চোখ থাকতেও অন্ধের মতন।

সত্যই তাই। ইচ্ছে করেই তারা এদিকে ওদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল না, কারণ তা দেখলে হয়তো বন্ধ হয়ে যেতো তাদের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া।

প্রত্যেকেই পদচালনা করছে কলের পুতুলের মতন কারুর মুখে কথা নেই বললেও চলে। এই মড়ার মুলুকের মৌন ব্রতের মধ্যে কথা কইতে যেন ভয় হয়, শিউরে উঠে প্রাণ। মনে হয় পরিচিত জীবনের বাণী শুনলে দেহহীন আত্মারা আবার ফিরে আসতে চাইবে আপন আপন দেহের মধ্যে।

পথ ধরে সোজা চলতে পারলে হয়তো তারা সন্ধ্যার আগেই গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারত। কিন্তু পথ ও মাঠের অধিকাংশই এখনো জলমগ্ন। যেখানে জল নেই সেখান দিয়ে অনেক ঘুরে তবে তারা অগ্রসর হতে পারছে।

অবশেষে সন্ধ্যা হল। চাঁদ উঠল—শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চাঁদ! কিন্তু মানুষ যে-চোখে দেখে, চাঁদকে মনে হয় সেইরকম। তারা ভাবলে, ও চাঁদের মুখ যেন মড়ার মতন হলদে!

জ্যোৎস্নার আলোতে তফাতের সব দৃশ্য আর স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না—এ তবু মন্দের ভালো। অন্তত খানিকটা কমল ভয়াবহতা।

সুরমা কাতরস্বরে বললে, 'দাদা, জল।'

সুরেশ বললে, 'এইতো একটু আগে জল খেলি!'

—'কি করব দাদা, আজ আমার গলা যে খালি খালি শুকিয়ে যাচ্ছে!'

—'শুকিয়ে গেলে কি করব বোন, 'ফ্লাস্কে' যে আর এক ফোঁটাও জল নেই।'

একটা অস্ফুট আর্তধ্বনি করে সুরমা চুপ মেরে গেল।

দীপক বললে, 'পচা মড়ার দুর্গন্ধ ক্রমেই বেড়ে উঠেছে! আর যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে!'

সুরেশ বললে, 'পথের আর কত বাকি?'

—'আমাদের এখনো মাইল সাত-আট যেতে হবে।'

—'ওঃ!'

—আবার সবাই নীরব। কিন্তু রাত্রি আজ নীরব নয়। একটানা শোনা যেতে লাগল শৃগাল-কুকুরের চীৎকার-ধ্বনি। মড়ার অধিকার নিয়ে তারা ঝগড়া করছে পরস্পরের সঙ্গে।

খানিক পরে সুরমা আর পারলে না, অবশ হয়ে বসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'দাদা গো' বলে চেঁচিয়ে উঠে এলিয়ে পড়ল এক দিকে!

দীপক ও সুরেশ ছুটে এসে তাকে ধরে তুলে দাঁড় করালে। দেখা গেল, সুরমা বসে পড়েছিল একটা নারীর মৃতদেহের উপরে।

সুরমা কাঁদতে লাগল।

সুরেশ বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি হবে বোন? চল, যত তাড়াতাড়ি পারি এই নরকের বাইরে পালাই চল!'

—'তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আর আমি হাঁটতে পারব না।'

—'তাহলে তোকে কি আমাদের কোলে নিয়ে যেতে হবে?'

এত দুঃখেও ম্লান হাসি হেসে সুরমা বললে, 'কী যে বল দাদা।'

—'তবে এগিয়ে চল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরমা আবার অগ্রসর হল।

চাঁদের আলো আরো জ্বল-জ্বলে। ওদিকে তেপান্তরের মাঠটাকে দেখাচ্ছে অপার সমুদ্রের মতন। চন্দ্রকিরণ তার বুক জুড়ে খেলছে যেন লাখো-লাখো হীরা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

এদিকে খানিকটা খোলা জমি। তার এখানে ওখানে অস্বাভাবিক সব

ভঙ্গিতে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে রয়েছে কতগুলো দেহ—কেউ নর, কেউ নারী, কেউ শিশু। তিন-চারদিন আগেও তারা ছিল এই উৎসবময়ী ধরণীর গর্বিত প্রাণী। স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি নিজেদের এমন ভয়ানক পরিণাম।

পাশের বনের ভিতরে উঠছে ঘনঘন হরিধ্বনি। শবযাত্রীরা যাচ্ছে শ্মশানের দিকে।

হঠাৎ সনাতন আঁতকে উঠে বললে, 'বাবু।'

দীপক ফিরে বললে, 'কি রে সনাতন?'

সনাতন ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।'

—'মড়া জ্যান্ত হয়েছে কি রে?'

—'ঐ দেখুন, ঐ দেখুন।' সে সেই খোলা জমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

ফিরে দেখে সকলেরই বুক শিউরে উঠল।

জমির উপরে যে মৃতদেহগুলো ছিল, তাদের একটা শুয়ে শুয়েই অগ্রসর হচ্ছে।

সুরমা ভয়ে চোখ মুদে ফেললে।

সনাতন বললে, 'পালিয়ে আসুন বাবু, পালিয়ে আসুন। মড়াটাকে দানোয় পেয়েছে।'

খুব তীক্ষ্ণ চোখে জ্বলন্ত মূর্তিটাকে দেখে দীপক বললে, 'ধেৎ! অসম্ভব কখনো সম্ভব হয়? ওটা কুমীর।'

—'কুমীর?'

—হাঁ, এখানে এসেছিল মড়ার লোভে। আমাদের দেখে জলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই আমরা ভূত দেখি।'

পাঁচ

অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে সুরমা বললে, 'জল, জল।'

সুরেশ বললে, সুরো জল যখন নেই তখন 'জল জল' করে মিছে কেঁদে কেন আমাদের কষ্ট দিচ্ছিস?'

—'জল জল করছি কি সাধে দাদা? আমি যে আর পারছি না!'

দীপক বললে, 'ভয় নেই সুরমা, পথের আর মাইল তিন বাকী।'

—'মাগো, সে যে অনেক দূর।'

কেউ আর কিছু বললে না।

কিছু দূরে দেখা গেল দু'টো লণ্ঠনের আলো। জন মানুষকেও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

দীপক বললে, 'ওখানে একটা শ্মশান আছে।'

সুরেশ বললে, 'একটা কথা মনে হচ্ছে। যারা শ্মশানে এসেছে তারা এখানকার পানীয় জলের অভাবের কথা নিশ্চয়ই জানে। ওরা কি সঙ্গে পানীয় জল আনেনি!'

—'আনা তো উচিত।'

—'সুরমার অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। একবার জলের খোঁজে ওদের কাছে যাব নাকি?'

—'চল।'

সকলে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হল।

যখন তারা শ্মশানে এসে উপস্থিত হল তখন কয়েকজন লোক চিতায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। তারা তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

চিতা জ্বলল। আগুনের রক্ত শিখা ক্রমেই উঠতে লাগল উপর দিকে।

হঠাৎ এক অভাবিত কাণ্ড!

প্রথমেই জাগল যন্ত্রণা-বিকৃত নারী কণ্ঠের তীব্র এক আর্তনাদ।

তারপরেই দেখা গেল, চিতার উপরকার কাঠগুলো ঠেলে ফেলে দিয়ে চিতার উপরে বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে উঠল এক শীর্ণ-বিশীর্ণ জীবন্ত নারীমূর্তি—তার পরনের কাপড়, তার এলান চুলে-চুলে দংশন করছে ক্রুদ্ধ সর্পশিশুর মতন অগ্নিশিখারা।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, 'জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম।'

মূর্তি চিতার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। যারা দাহ করতে এসেছিল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলে প্রাণপণে।

সেই ভয়ঙ্করী অগ্নিময়ী মূর্তির চোখ দুটো ঠিকরে পড়ছে। সে দুই হাত বিস্তার করে বেগে দৌড়ে আসতে আসতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম। রক্ষা কর, রক্ষা কর!'

দীপক, সুরেশ, সুরমা ও সনাতন দ্রুতপদে না পালিয়ে পারলে না।

ছয়

অনেকদূরে ছুটে এসে তারা থামল।

খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়বার পর দীপক বললে, 'কী কাপুরুষ আমরা। কার ভয়ে পালিয়ে এলুম? জ্যান্ত মানুষ কেউ মারা গেছে ভেবে ভুল করে শ্মশানে নিয়ে আসার কথা তো আগেও শুনেছি। এ-ও নিশ্চয় সেই ব্যাপার!'

সুরেশ বললে, 'আমারও এখন সেই সন্দেহ হচ্ছে। চল, শ্মশানের দিকে আর একবার গিয়ে দেখে আসি।'

সুরমা সভয়ে কেঁদে উঠে বললে, 'ওরে বাবা, আমি পারব না।'

'কে তোকে যেতে বলছে! তুই সনাতনের কাছে বসে থাক।'

কিন্তু তাদের বিফল হয়ে ফিরে আসতে হল। সেই অদ্ভুত মূর্তি একেবারেই অদৃশ্য!

সনাতন মাথা নেড়ে মত জাহির করলে, 'যে মূর্তি দুনিয়ার নয়, তাকে কি আর দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায়?'

অভিশপ্ত মূর্তি

(ক)

রমেশের মতে গরম যখন চরম হইয়া উঠে এবং বিশুদ্ধ বাতাস না পাইয়া প্রাণপাখী 'খাঁচা-ছাড়ি খাঁচা-ছাড়ি' করিতে থাকে, বিকালে তখন গড়ের মাঠের 'কার্জন-পার্কে' গিয়া হাঁ করিয়া হাঁপ ছাড়াই, বাঁচিবার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত এবং সহজ উপায়। অতএব, তারা কয় বন্ধুতে প্রত্যহ এই প্রশস্ত ও সহজ উপায় অবলম্বন করিত।

সেদিনও তারা 'কার্জন-পার্কে' গিয়া জমিয়াছিল।

রমেশ ঘাসের উপরে উড়ানি বিছাইয়া শুইয়াছিল, যোগেশ একটা মৌরির বিড়ি বারংবার নিবিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্রমেই চটিয়া উঠিতেছিল, সুরেশ একমনে একখানা বিলাতী ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছিল এবং উমেশ সকৌতুকে দূরের এক বেঞ্চের দিকে স্থিরচক্ষে তাকাইয়াছিল ;—সেই বেঞ্চখানার উপরে দু-জোড়া সাহেব-মেম বসিয়াছিল—তার মধ্যে যে সাহেবটি তাকিয়ার মতন মোটা তাঁর মেমটি বাঁখারির মতন রোগা, আর যে সাহেবটি বামনের মতন

বেঁটে তাঁর মেমটি প্রায় জিরাফের মতন ঢ্যাঙা—এমন বিসদৃশ চার-চারটি চেহারা এক জায়গায় দেখিতে পাওয়ার সৌভাগ্য, বড় দুর্লভ!

হঠাৎ পিছন হইতে চেনাগলায় একজন বলিল, 'ওহে, আমি যে তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলুম।'

সবাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখিল, পরেশ। অমনি একসঙ্গে প্রশ্ন হইল, 'কিহে, তুমি না পুরী গিয়েছিলে?' 'কবে ফিরলে হে?' 'জায়গাটি কেমন লাগল?' 'আর কোথাও গিয়েছিল নাকি?'

পরেশ আগে সকলকার মাঝখানে আসিয়া বসিল। তারপর কোঁচানো উড়ানিখানি খুলিয়া সাবধানে কোলের উপর রাখিয়া বলিল, 'ভাই, আমি চতুর্মুখ নই, সুতরাং একসঙ্গে তোমাদের চার-চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একে একে বলছি শোন। হ্যাঁ, আমি পুরী গিয়েছিলুম। আজ সকালে ফিরেছি। জায়গাটা ভালই লাগল—দোষের মধ্যে আমাদের কালো রং সেখানকার জল-হাওয়ায় ঘোরতর হয়ে ওঠে। পুরী থেকে আমি কণারকে গিয়েছিলুম—'

রমেশ চমকাইয়া বলিল, 'অ্যাঃ, কণারকে!'

—'ওকি, কণারকের নামে তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?'

—'না, না ও কিছু নয়, তুমি যা বলছিলে বল!'

—'সে হবে না! আগে বল তুমি চমকালে কেন?'

—'সে অনেক কথা!'

—'তা হোক—বল!'

—'শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে না।'

—'যদি ভাল লাগে আর মাসিকপত্রের ছোট গল্পের মতন চর্বিত-চর্বণ না হয়, তাহলে আমরা উনিশবার জেল-ফেরতা দাগী চোরের কথাও বিশ্বাস করতে রাজী আছি!'

—'কিন্তু—কিন্তু—'

—'কিন্তু তুমি বড় বেশী ল্যাজ খেলছ রমেশ!'

অগত্যা বাধ্য হইয়া রমেশ তার কথা শুরু করিল :—

(খ)

অনেকদিন আগেকার কথা ; আমরা কয় বন্ধুতে কণারক দেখতে গিয়েছিলুম। কণারকের মন্দিরের কথা তোমরা অনেকেই জান, সুতরাং আমি আর মন্দিরের কথা বলতে চেষ্টা করব না।

কণারকের আশেপাশে মাঝে-মাঝে দু-চারখানি ছোটখাট গাঁ আছে ; এ-সব গাঁয়ে লোকজন খুব কম, যারা থাকে তারা হচ্ছে চাষাভূষো ও গয়লা শ্রেণীর।

কণারক দেখতে যেদিন আমাদের আসবার কথা, সেইদিন বৈকালে আমরা অমনি একখানি গাঁয়ের ধার দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলুম।

কৌতূহলী চোখে এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে আসছি, হঠাৎ একটা গাছতলায় পুতুলের মতন কি-একটা নজরে ঠেকল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই এক পাথরের মূর্তি—তার নীচের দিকটা বালিতে পুঁতে গিয়েছে।

মূর্তিটি রমণীয়—গড়ন দেখে মনে হল কণারকের সেকেলে শিল্পীদের কেউ এটিকে গড়েছে! কেননা তেমন রূপে-ভরা দেহ, হাসি-ভরা মুখ, ভাবে-ভরা চোখ বড় যে-সে কারিগরের কল্পনায় সম্ভব নয়,—উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পের এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

এ-হেন মূর্তি এখানে অযত্নে পড়ে আছে কেন, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমন সময়ে দেখি 'অসুছন্তি ব্রজবাসী' বলে গান গাইতে-গাইতে, পাশ দিয়েই একজন গাঁয়ের লোক যাচ্ছে।

তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁরে, এ পুতুলটা এখানে পড়ে আছে কেন?'

উড়িষ্যা-ভাষায় সে যা বললে তার মর্ম বুঝলুম এই যে, গাঁয়ের মধুসূদন শ্রীচন্দনের বাড়িতে এ-মূর্তিটি আগে ছিল, কিন্তু সে মরে যাবার পর তার ছেলেরা এটাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

—'ফেলে দিয়ে গেছে কেন রে?'

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে লোকটি বললে, 'কেন যে সে তা জানে না।' তার মুখ দেখে মনে হল, সে যেন কি লুকোচ্ছে।'

—'আচ্ছা, তু এই পুতুলের গা থেকে বালিগুলো সরিয়ে ফেল দেখি! বখশীষ পাবি।

লোকটা কেমন শিউরে উঠে তিনহাত পিছিয়ে গেল। তারপর দংশনোদ্যত সাপের দিকে লোকে যেমন করে তাকায় তেমনি ভীরু চোখে মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললে, 'সে পারবে না।'

খামকা লোকটা আঁৎকে উঠল কেন? মূর্তিটির দিকে তার পাষাণ নয়ন তুলে সে যেন করুণ হাসি হাসছে ; আপনার নীরব ভাষায় যেন বলছে, 'আমাকে উদ্ধার কর—এই আসন্ন সমাধি থেকে আমাকে উদ্ধার কর।'

লোভে আমার মনটা ভরে গেল। অপূর্ব শিল্পের এই উজ্জ্বল রত্নটিকে যদি কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার বাড়ি আলো হয়ে উঠবে।

ফিরে দেখি, পিছনে সে লোকটা আর নেই, হনহন করে তাড়াতাড়ি সে গাঁয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

বন্ধুরাও আমাকে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন, চেঁচিয়ে ডাকতে সবাই ফের ফিরে এলেন।

সকলে মিলে বালি সরিয়ে মূর্তিটাকে আবার টেনে তুললুম। সেটি একটি নর্তকীর নগ্নমূর্তি ; এতক্ষণ তার আধখানা বালির ভিতরে ঢাকা ছিল বলে তার অপরূপ রূপ ভাল করে বুঝতে পারিনি, এখন তার সবটা দেখতে পেয়ে আমাদের চোখে যেন তাক লেগে গেল। কী সুন্দর তার দাঁড়াবার ভঙ্গী, কী অপূর্ব তার হাত-পায়ের শ্রী-চাঁদ! আর পাথরের মূর্তি যে এতটা জীবন্ত হতে পারে, আমি তা জানতুম না ; মনে হল, শিল্পী আর একটু চেষ্টা করলেই এর মৌনব্রত ভঙ্গ হয়ে যেত!

ভেবেছিলুম মূর্তিটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে গেলে, গাঁয়ের লোকে নিশ্চয়ই উড়িয়া-ভাষায় যৎপরোনাস্তি রুদ্ররস প্রকাশ করবে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কেউ টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করলে না।

(গ)

সন্ধ্যার পর আমরা কণারকের কালো দেউলের কালো ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে, সীমাহীন বালুকা-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ালুম।

আমরা চারখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করেছিলুম। অন্য তিনখানা গাড়িতে দু-জন করে লোক উঠল, কিন্তু আমায় গাড়িতে সেই মূর্তিটি ছিল বলে আমি ছাড়া আর কারুর জায়গা হল না।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ঘুমন্ত সেই অনন্ত বালু-প্রান্তরকে চাকার শব্দে জাগ্রত করে, গরুর গাড়িগুলো ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে চলতে লাগল। উপরে আকাশ, নীচে সেই ধূ-ধূ মরুভূমি—চারিদিকে আর কিছুই নেই—না গ্রাম, না মানুষ, না গাছপালা!

সারাদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে দেহ-মন যেমন এলিয়ে পড়েছিল—আস্তে আস্তে গাড়ির ভিতরে দেহটাকে ছড়িয়ে দিলুম ; আর আমার পাশেই নর্তকীর সেই পাষাণ মূর্তিটি স্তব্ধ মৃতদেহের মতন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল।...

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম...সেই পাষাণী নর্তকী যেন প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। টানা টানা বিদ্যুৎভরা চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে, কুন্দদন্তে অধর চেপে সে ফিক্ করে হেসে ফেললে, তারপর সামনের দিকে ধীরে ধীরে তার দু-হাত বাড়িয়ে দিলে—আমাকে ধরবার জন্যে!

সেই জীবন্ত পাষাণীর স্পর্শ থেকে তাড়াতাড়ি যেমন সরে আসতে যাব অমনি চট করে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ কচলে উঠে বসে দেখি, পাথরের প্রতিমূর্তিটা গাড়ির ভিতরে পাতলা অন্ধকারে আবছায়ার মতন দেখা যাচ্ছে ; হঠাৎ দেখলে মনে হয় সে মূর্তি যেন এক ঘুমন্ত মানুষের। বাইরে মরার মতন হলদে আধখানা চাঁদ একরাশ এলোমেলো কালো মেঘের উপরে স্তম্ভিত হয়ে আছে। গভীর রাত্রি অত্যন্ত স্তব্ধ—কেবল খুব দূর থেকে চিরজাগ্রত সমুদ্রের অশ্রান্ত হাহাকার বাতাসের ঠাণ্ডা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ভেসে-ভেসে আসছে!

হঠাৎ আমার কানে একটা শব্দ গেল! গাড়ির ভিতরে কে ফোঁশ করে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। প্রথমে ভাবলুম, আমার ভ্রম! কিন্তু তারপর ভাল করে শুনে বুঝলুম—না, ভ্রম নয়, ভিতর থেকে নিশ্চয় কারুর নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে!

গাড়োয়ান ছোঁড়াটা তখন নেমে গাড়ির আগে আগে হেঁটে চলছিল।

প্রতিমূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে তেমনি স্থির ভাবে পড়ে আছে।—

ঝাঁ-করে মনে হল, কণারকের সেই গেঁয়ো লোকটার রহস্যপূর্ণ আচরণ। বকশিসের লোভেও সে এই মূর্তিটার গায়ে হাত দিতে রাজী হয়নি।....এ মূর্তিটাকে নিয়ে কিছু গোলমাল আছে নাকি? নইলে, দেখতে যাকে এত সুশ্রী, তাকে গাছতলায় অমন করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কেন?

নিঃশ্বাস তখনো উঠছে পড়ছে! শুধু তাই নয়—গাড়ির ভিতরে বিছানার তলায় খড় বিছানো ছিল—সেই খড়গুলো হঠাৎ খড়্ খড়্ করে উঠল—কে যেন এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরে শুল।

আমি ভূত মানি না। কিন্তু তবু কেন জানি না আমার বুকের কাছটা কেমন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে উঠল। গাড়ির ভিতর পানে চাইতে আর ভরসা হল না—খালি মনে হতে লাগল, যেন কার দু-দুটো পাথুরে চোখের থম্‌থমে্ চাহনি ধারালো ছুরির কন্‌কনে্ ফলার মতন ক্রমাগত আমার পিঠের উপরে এসে বিঁধছে আর বিঁধছে। শেষটা এমনি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল যে, আমি আর কিছুতেই সেখানে তিষ্ঠতে পারলুম না,—এক লাফে সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে অন্য এক গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। সেখানে আমার দুই বন্ধু শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন ; গুঁতোগুঁতি করে কোনগতিকে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলুম।

ভোর হল। প্রান্তর তখনো শেষ হয়নি।

নিজের গাড়িতে ফিরে আসতেই দেখি, আমার বিছানার উপরে একটা কুকুরছানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে!

কান ধরে সেটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিলুম। ছানাটা কেঁউ-কেঁউ করে উঠতেই গারোয়ান-ছোঁড়া ছুটে এল। বললে, 'বাবু, মের না, মের না, ও আমার কুকুর!'

'তোর কুকুর!'

—'হ্যাঁ বাবু, ওর মা মরে গেছে—তাই ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িতেই থাকে।'

বুঝলুম, গেল রাত্রে গাড়িতে কার নিঃশ্বাস শুনেছিলুম! কিন্তু, তবু—

(ঘ)

কলকাতায় এসে নর্তকীর সেই প্রতিমূর্তিটিকে আমার বাইরের ঘরের একটি ছোট টেবিলের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

আমার স্ত্রী তাকে দেখবার জন্যে একদিন বাইরের ঘরে নেমে এলেন। অনেক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভঙ্গিভরে ব্যঙ্গ করে তার দিকে চেয়ে বললে,—'কালামুখীর দাঁড়াবার আর ঢং দ্যাখ না—দি ঠাস করে গালে এক চাপড়।' রমা মূর্তির গালে সকৌতুকে একটি চড় বসিয়ে দিলে।

—কিন্তু সেইসঙ্গেই সে আর্তনাদ করে দু পা পিছিয়ে গেল! আমি অবাক হয়ে দেখলুম, তার মুখ একেবারে পাঙ্গাশ হয়ে গেছে!

—'কি হল রমা, অমন করে উঠলে কেন?'

—'আমার হাত ও কামড়ে দিয়েছে।'

—'কামড়ে দিয়েছে! ক্ষেপে গেলে নাকি?'

—'ওকে চড় মারতেই ও-যেন আমাকে কটাস করে কামড়ে দিলে! বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, হাত দিয়ে আমার রক্ত পড়ছে!'

তাই ত, রমার হাত দিয়ে সত্যিই রক্ত গড়াচ্ছে যে! হতভম্বের মতন মূর্তির দিকে চাইলুম—কিন্তু তখনি বুঝতে পারলুম আসল ব্যাপারটা কি! নর্তকীর নাকের ডগাটি শিল্পী অত্যন্ত সূক্ষ্ম করে ক্ষুদেছে, রমার হাত তার উপর গিয়ে পড়াতেই আঁচড়ে গেছে আর কি।'

কিন্তু রমা বিশ্বাস করলে না। আমার মুখে সে আগেই শুনেছিল, এ মূর্তিকে আমি কি করে কেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম। সে বললে, 'একে যখন লোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, তখন এ আপদকে ঘাড়ে করে বয়ে তোমার বাড়িতে আনবার কি দরকার ছিল?'

স্ত্রীলোকের কী কুসংস্কার! আমি হেসে বললুম, 'যাও, যাও, আর পাগলামি করতে হবে না—হাতে জল দাও-গে যাও!'

ভয়ে-ভয়ে নর্তকীর দিকে তাকাতে তাকাতে রমা ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল।

আমিও কিন্তু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নর্তকীর দিকে চেয়ে রইলুম। রূপের-গরবে-ভরা হাসিমুখে, আমার দিকে দুখানি নিটোল বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—যেন কার অভিশাপেই সে আজ নিশ্চল পাষাণে পরিণত হয়ে নিস্তব্ধ, নইলে ঐ মুখের কলহাস্যরোলে এবং ঐ চরণের রুণু-ঝুণু নূপুরনিক্কণে এখনি আমার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত!

(৬)

বিনোদকে তোমরা সকলেই জান বোধহয়। এখন তার যে ভয়ানক দশা হয়েছে, তার জন্য দায়ী কে জান? নর্তকীর ঐ প্রতিমূর্তিটা। বিনোদ যদি ঐ নর্তকীর প্রতিমা না দেখত, তাহলে ভাল আঁকিয়ে বলে দেশ-বিদেশে আজ তার নাম ছড়িয়ে পড়ত—সে একজন মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠত।...বিনোদের শোচনীয় পরিণাম তোমাদের কারুর অজ্ঞাত নেই, কিন্তু তার আসল কারণ খালি আমিই জানি।

বিনোদ কলকাতায় থাকত না। কলকাতায় যখন আসত তখন আমার বাড়িতেই এসে উঠত। আমি ছিলুম তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

সেবারে কলকাতায় এসে দেবদাসীর এই মূর্তিটা দেখে, সে আনন্দে একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'রমেশ, এ যে অমূল্য রত্ন! বন্ধু, তুমি লাখ টাকা পেলেও আজ আমি এত খুসী হতুম না!' বিনোদ কাছে দূরে আশপাশ সুমুখ ও পিছন থেকে নানারকমে ঘুরে-ফিরে প্রতিমূর্তিটা দেখলে। তারপর তার গায়ের পরে আপনার হাত রেখে আবার বললে, 'এ সেই অতীতের বিশ্বকর্মার গভীর সাধনার ফল, এ যুগের সাধ্য কি এমন প্রতিমা গড়তে পারে: দেখ বন্ধু, এক পাষাণ-দেহে কি অপূর্ব সুষমা, হাত-পায়ের কি বিচিত্র ভঙ্গিমা!....আমি যদি সম্রাট হতুম আর এ যদি মানুষ হত, এর একটি চাহনির জন্যে আমি সাম্রাজ্য বিকিয়ে দিতুম! হায়, এ হচ্ছে পাষাণী—একে ভালবাসলেও প্রতিদানে আমি কিছুই পাব না! তবু দেখ, এ পাষাণও শিল্পীর হাতের মায়াস্পর্শ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যেন এই কঠিন পাথরের আড়ালে আড়ালে প্রাণের লুকানো ধারা চুপি-চুপি বয়ে যাচ্ছে—হাত দিলে যেন হাতে তার উত্তাপ পাওয়া যায়।'—

এই বলে বিনোদ সেই প্রতিমার গায়ে হাত দিলে—কিন্তু পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের হাতের মতন হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

আচমকা তার এই ভাবান্তর দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কিহে, ব্যাপার কি?'

বিনোদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর একবার সেই মূর্তির দিকে, আর একবার আমার দিকে ফ্যালফেলে চোখে চেয়ে আমতা-আমতা করে বললে, 'এ কি সত্যি?'

—'কি সত্যি হে?'

—'দেখ রমেশ, এই মূর্তির গায়ে যেমনি হাত রাখলুম অমনি আমার কি মনে হল জান? মনে হল ওর দেহের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা দুপদুপিয়ে নেচে উঠল!'

আমি উচ্চস্বরে হেসে বললুম, 'মূর্তিটা দেখে তোমার এত আনন্দ হয়েছে যে তুমি একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসে আছ!'

বিনোদ প্রতিমার গায়ে আবার হাত দিয়ে একটু হেসে বললে, 'তাই বটে—আমারই ভ্রম। কৈ, এখন তো আর তা মনে হচ্ছে না—এ দেহ এখন স্তব্ধ, স্থির, মৃত্যুর মতন শীতল! তারপর থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললে, 'হায়রে, পাষাণকে কি বাঁচানো যায়! তা যদি পারতুম, তাহলে আমরা,—শিল্পীরা, আজ শত শত নিখুঁত আদর্শ মানুষ গড়ে সমস্ত সংসারকে সুন্দর করে তুলতুম!'

(চ)

আমার একটি বদ অভ্যাস আছে। রাত অন্তত দেড়টা-দুটো না বাজলে সহজে আমার ঘুম হয় না। প্রথম রাতটা আমি বই-টই পড়ে কাটিয়ে দিই।

সে রাত্রে যখন পড়া সাঙ্গ করে উঠলুম, ঘড়িতে তখন দুটো বাজতে দশ মিনিট। আলো নিবিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পেলুম।

এত রাতে জেগে কে? একটু আশ্চর্য হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিনোদ! বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সে অস্থিরভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সে রাত্রে গরমটা পড়েছিল কিছু অতিরিক্ত ; ভাবলুম, গরমে বোধহয় তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই সে বাইরে বাতাস পাবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। এই ঠিক করে তাকে আর না-ডেকেই আমি শুয়ে পড়লুম।....

পরদিন সকাল বেলায় বিনোদের সঙ্গে যখন দেখা হল, বললুম, 'কিহে, কাল ভাল করে ঘুম হয়নি বুঝি?'

সে বিস্মিত স্বরে বললে, 'তুমি জানলে কি করে?'

আমি বললুম, 'কাল রাত দুটোর সময় তুমি যখন বারান্দায় এসেছিলে আমি তখন জেগেছিলুম।'

বিনোদ আমার কাছে সরে এসে খুব মৃদুস্বরে বললে, 'ভাই, কাল এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।'

—'কি-রকম?'

—'নর্তকীর মূর্তিটার একটা নকল তুলতে তুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম জানো? দেখলুম, প্রতিমা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠলো—যদিও তার দেহ যেমন ছিল তেমনি পাথরেরই রইল। এক-পা এক-পা করে আমার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে সে বললে, 'তোমার কথা আমি শুনেছি, তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও, না?' আমি বললুম, হ্যাঁ'।

—'তাহলে আমিও তোমাকে ভালবাসব, আর কখনও ছাড়ব না'—এই বলে সে আমাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করলে! তার সেই শক্ত পাথরের হাতের চাপে আমার দম যেন আটকে আসতে লাগল। আমি জোর করে যেমন তার হাত ছাড়াতে যাব অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর কিছুতেই আর ঘুম আসে না। সেই বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের কথা কোনমতেই আর ভুলতে পারলুম না—সেটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে মাথাটা এমনি গরম হয়ে উঠল যে শেষটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। কাল সারারাত অনিদ্রায় কেটেছে।'

কণারকের প্রান্তরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেটাও অনেকটা এই ধরনের। আমার বুক কি-এক বিপদভয়ে গুরগুর করে উঠল। তবে কি সত্যসত্যই এ মূর্তিটার ভিতরে অস্বাভাবিক কিছু আছে? একটু উত্তেজিত স্বরে বললুম, 'বিনোদ, ও ঘরে আর তুমি শুয়ো না।'

আমার স্বরে চমকে উঠে বিনোদ বললে, 'কেন বল দেখি?'

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'তুমি ও মূর্তিটার কথা বড় বেশী ভাবছ। হয়ত আজও তুমি ওকে আবার স্বপ্নে দেখবে।'

বিনোদ হাসতে হাসতে বললে, 'দেখলুমই-বা, তাতে হয়েছে কি!—স্বপ্ন ত সত্য নয়!'

তাকে আমি আর কখনও হাসতে দেখিনি, সেই হাসিই তার শেষ হাসি।

(ছ)

তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি—যে রাত্রির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

সে রাত্রেও আমি টেবিলের সামনে বসে একখানা বই পড়ছিলুম। রাত তখন একটার কাছাকাছি। চারিদিকে স্তব্ধতা যেন থমথম করছে।

কোথাও কিছু নেই,—হঠাৎ একটা ভারি জিনিষ-পড়ার শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক এক আর্তনাদ!—সে কী চিৎকার,—চারিদিকের গভীর নীরবতার মধ্যে সে আর্তনাদ যে আকুলভাবে ঝাঁপ দিয়ে কোথাও থৈ না পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডুবে গেল!

একলাফে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম।

আমার স্ত্রীও ধড়মড়িয়ে জেগে, বিছানায় উঠে বসে সভয়ে বললে, 'ও কী গো, ও কী!'

আবার আর্তনাদ! এবার তত জোরে নয়—কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাভরা! এ যে বিনোদের স্বর!

আমি আর দাঁড়ালুম না, ঝড়ের মতন বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে গেলুম।

বাইরের ঘরের দরজা ঠেলতেই দড়াম করে খুলে গেল, ভিতরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার—মনে হল, সে অন্ধকার হা করে আমাকে গিলতে আসছে!

শুনলুম সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে অতি কষ্টে গোঁঙিয়ে-গোঁঙিয়ে বিনোদ বলছে, 'ছাড়, ছাড়,—ওরে পিশাচী, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—ছে—' আর কথা বেরুল না,—কেউ যেন তাকে এত জোরে চেপে ধরলে, যে তার স্বর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

তোমরা বুঝবে না—সে যে কি এক মহা ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ নেতিয়ে পড়ল। পারলে, তখনি আমি ছুটে পালাতুম—কিন্তু সে শক্তিও আমার ছিল না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে মাটির উপরে আমি দু-হাতে ভর দিয়ে বসে পড়লুম! অন্ধকার ঘরের ভিতরে কেমন একটা অস্পষ্ট ঝটপটানি শব্দ হতে লাগল—কেউ যেন কারুর সঙ্গে বোঝাবুঝি করছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুক্তিলাভ করতে পারছে না!.....ক্রমে ক্রমে সেই ঝটপটানি শব্দটা থেমে এল—তারপর, সব চুপচাপ! আর একটু তেমনভাবে থাকলেই আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতুম কিন্তু বাড়ির যে যেখানে ছিল সবাই জেগে উঠে হৈ-চৈ করতে-করতে সে ঘরে ছুটে এল, আলো দেখে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।.....

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, নর্তকীর সেই প্রতিমূর্তিটা টেবিলের উপর থেকে মাটিতে উপুড় হয়ে সটান পড়ে আছে, আর তারই তলায় বিনোদের মৃতদেহ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে!

সবাই মিলে ধরাধরি করে পাথরের সেই ভারি মূর্তিটি বিনোদের উপর থেকে তুলে ফেললুম। বিনোদের বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, সে বেঁচে আছে।

তখনি ডাক্তার ডেকে আনা হল।

•

সেই মূর্তির চাপে বিনোদের দেহ আষ্টেপৃষ্ঠ থেঁৎলে গিয়েছিল ; অনেক কষ্টে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। এখন তার কাছে গেলে সে ক্রমাগত বলতে থাকে, পাষাণীর স্পর্শে বুক তার পাষাণ হয়ে গেছে!

(জ)

রমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ শ্রোতারা কেউ কোন কথা কহিল না।

তারপর যোগেশ আপনার নিবন্ত বিড়িতে খুব একটা জোর টান মারিয়া বলিল, 'সে লক্ষ্মীছাড়া মূর্তিটার কি হল?'

রমেশ বললে, 'তাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়েছি।'

সুরেশ বললে, 'সেটা নিশ্চয়ই ভৌতিক মূর্তি, নইলে—'

রমেশ বাধা দিয়ে বললে, 'না, আমি ভূত মানি না।'

—'তাহলে বিনোদের অমন দশা হল কেন?'

—'মূর্তিটা বোধহয় কোন গতিকে তার ঘাড়ের উপর পড়ে গিয়েছিল। এর-মধ্যে ভৌতিক কি আছে?'

—'তবে সেটাকে ভাঙ্গলে কেন?

—'তারই জন্যে আমার বন্ধুর অমন অবস্থা হল, সেই রাগে।......কিন্তু মূর্তিটাকে ভাঙ্গবার সময়েও আর এক কাণ্ড ঘটে। চাকররা যখন হাতুড়ি দিয়ে মূর্তিটার উপরে ঘা মারছিল, তখন হঠাৎ তার গা থেকে একখানা ভাঙ্গা পাথর ঠিকরে একটা চাকরের কপালে গিয়ে এমনি জোরে লাগে যে, সে তখনি অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে যায়।'

উমেশ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'কি ভয়ানক। তবু তুমি বলতে চাও, এটা ভৌতিক ব্যাপার নয়?'

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না, আমি ভূত মানি না।'

— ইতি —

যক্ষপতির রত্নপুরী

১

চীনে হোটেল

অনেকে অভিযোগ করেন, আমার জীবন নাকি অস্বাভাবিক!

তাঁদের মতে, স্বাভাবিক মানুষের জীবন এমন ঘটনাবহুল হতে পারে না।

যদিও নিজেকে আমি পাগল বা গণ্ডমূর্খের মতন নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করছি না, তবে তর্কের খাতিরে এখানে কেবল এই প্রশ্ন বোধহয় করতে পারি—নেপোলিয়ন কি স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না? তিনি মাত্র বাহান্নো বৎসর বেঁচে ছিলেন। তার ভিতর থেকে প্রথম পঁচিশ বৎসর অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু বাকি মাত্র সাতাশ বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়নের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যে ঘটনার পর ঘটনার প্রচণ্ড বন্যা, তাদের অবলম্বন করে কি অসংখ্য নাটক ও উপন্যাস রচনা করা চলে না?

না-হয় নেপোলিয়নের মতন মহামানুষ ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কথা ছেড়ে দি, কারণ তাঁর জীবনে ঘটনা ঘটবার স্বাভাবিক সুযোগ ছিল প্রচুর। তাঁর বদলে আমি মধ্য-যুগের এক শিল্পীর কথা উল্লেখ করতে চাই। তাঁর নাম বেন্‌ভেনুতো শেলিনি। তিনি ছিলেন ইতালীর এক বিখ্যাত ভাস্কর ও ওস্তাদ স্বর্ণকার। তিনি একখানি প্রসিদ্ধ আত্মচরিতও লিখে গেছেন। সাধারণ শিল্পীদের জীবনের সঙ্গে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র সম্পর্ক থাকে না বললেই চলে। কিন্তু বেন্‌ভেনুতোর ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনী যোগাতে পারে বহু বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর ও প্রায়-অসম্ভব উপন্যাসের উপকরণ। এজন্যে তাঁর আত্মচরিতকে অস্বাভাবিক বলে অভিযোগ করা চলে না। কারণ তাঁর জীবনের ঘটনাবলি সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

এক-একজন মানুষের জীবনই হচ্ছে এমনি বিচিত্র! হয় ঘটনা-প্রবাহ আকর্ষণ করে তাদের জীবনকে, নয় তাদের জীবনই আকর্ষণ করে ঘটনা-প্রবাহকে।

বরাবরই লক্ষ্য করে দেখছি, আমি স্বেচ্ছায় কোন রোমাঞ্চকর আবহ সৃষ্টি করতে না চাইলেও, কোথা থেকে আচম্বিতে আমার জীবনের উপরে এসে ভেঙে পড়েছে অদ্ভুত সব ঘটনার প্রবাহ। আমার বন্ধু কুমার হয়তো এ-সব ঘটনা-চক্রের বাইরেই পড়ে থাকত, কিন্তু সে হচ্ছে আমার নিত্যসঙ্গী, তার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কাজেই তাকেও জড়িয়ে পড়তে হয় এই সব ঘটনার পাকে পাকে। অর্থাৎ প্রবাদে যাকে বলে—'পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।'

এবারেও কেমন করে আমরা নিজেদের অজান্তেই হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা-প্রবাহের দ্বারা আক্রান্ত হলুম, এইখানে সেই কথাই লিখে রাখছি :

সেদিন সন্ধ্যায় কুমার এসে বললে, 'কী সব বাজে বই নিয়ে মেতে আছ? চল, আজ কোন হোটেলের দিকে যাত্রা করি।'

বই মুড়ে বললুম, 'আপত্তি নেই। কিন্তু কোন্ হোটেলে?'

—'সেটা তুমিই স্থির কর।'

—'চৌরঙ্গীর দিশী আর বিলিতী হোটেলে খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। চল আজ ছাতাওয়ালা গলির চীনে-পাড়ায়।'

—'ন্যান্‌কিনে? সেও তো বিলিতীর নকল।'

—'না হে না, আমরা যাব খাঁটি চীনে হোটেলে, খাঁটি চীনে খানা খেতে।'

—'উত্তম প্রস্তাব। রাজি!'

বাইরে বেরুবার জামা-কাপড় পরছি দেখে বাঘাও গাত্রোত্থান করে গৃহত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হল।

কুমার বললে, 'ওরে বাঘা, আজ আর তুই সঙ্গে আসিস্ নে। হোটেলঅলারা বদ-রসিক রে, কুকুর-খদ্দের হয়তো পছন্দ করবে না!'

কিন্তু বাঘা মানা মানতে রাজি নয় দেখে রামহরিকে স্মরণ করলুম।

রামহরি এসে বললে, 'দুই স্যাঙাতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

—'চীনে হোটেলে খানা খেতে।'

—'সর্বনাশ! চীনেরা তো তেলাপোকা খায়! তোমাদেরও খাবার সখ হয়েছে নাকি?'

—'রামহরি, চীনেম্যানদের নামে ও-অপবাদটা একেবারেই মিথ্যে। তারা তেলাপোকা খায় না, তবে পাখির বাসার ঝোল খায় বটে!'

—'রাম রাম! পাখির বাসাও আবার খাবার জিনিস নাকি?'

—'তবু তুমি তাদের আর-একটা খানার নাম শোনো নি। তারা পঞ্চাশ, ষাট, আশী, একশো বছরের পুরানো ডিম খেতে ভারি ভালোবাসে!'

—'ওয়াক্! ও খোকাবাবু, শুনেই যে আমার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত উঠে আসছে! ওয়াক্!'

—'হাঙরও তাদের কাছে সুখাদ্য!'

—'পায়ে পড়ি খোকাবাবু, আর বোলো না! ছি ছি, ঐ সব সিষ্টিছাড়া খাবার তোমরা খেতে চাও?'

—'না রামহরি, হাঙর বা একশো বছরের পচা ডিম খাবার সৎসাহস আজও আমাদের হয় নি। তবে বাঘা বোধহয় হাঙর পেলে ছাড়বে না, ওকে তুমি সামলাও।'

আমি আর কুমার বেরিয়ে পড়লুম।

চীনে-পাড়ার খাঁটি চীনে-হোটেলে বাঙালীর দেখা পাওয়া যায় না। আর কিছুই নয়, রামহরির মতন অধিকাংশ বাঙালীরই আসল চীনে-হোটেল সম্বন্ধে ভয়াবহ কুসংস্কার আছে—তাই তাদের দৌড় বড়-জোর 'ন্যান্‌কিন' বা 'চাঙ্গুয়া' পর্যন্ত।

কিন্তু আমরা যে চীনে-হোটেলে গেলুম সেখানে ভয় পাবার বা বমন ওঠবার মতন কিছুই ছিল না। চারিধার সাজানো-গুছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাবারগুলিও সুস্বাদু—যদিও আমাদের দেশী-বিলাতী খাবারের সঙ্গে তাদের কিছুই মিল নেই। পরিবেশন করছিল একটি চীনে মেয়ে।

সর্বশেষে মেয়েটি নিয়ে এল চীনে চা। এ চা তৈরি করবার পদ্ধতিও অন্য রকম। মেয়েটি দুটি কাঁচের বা পোর্সিলেনের বাটি আনলে। একটি বাটিতে গরম জল ঢেলে তাতে শুক্‌নো ও পাকানো একখণ্ড চায়ের পাতা দিয়ে উপরে দ্বিতীয় বাটিটি চাপা দিয়ে চলে গেল। মিনিট তিন-চার পরে সে ফিরে এসে উপুড় করা বাটিটি নামিয়ে দিতেই দেখি, সেই গুটানো চায়ের পাতাখানি সমস্ত বাটি ভরে ছড়িয়ে পড়ে জলের উপরে ভাসছে। ব্যস্, চা প্রস্তুত— এখন খালি চিনি মেশাও, আর চুমুক দাও! কিন্তু এ চায়ের স্বাদ অধিকাংশ বাঙালীরই ধাতে সইবে না।

কুমার চায়ের পেয়ালা তুলে বললে, 'বিমল, চীনে-হোটেলের ভেতর বসে চীনে খানা খেতে খেতে আর চুং চাং—চুং চিং কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে, আমরা যেন আরব্য উপন্যাসের মায়া-গালিচায় চেপে হঠাৎ বাংলা ছেড়ে চীনদেশেই এসে পড়েছি। ও-পাশের ঘরে ঐ চীনেম্যানদের দেখছ? ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে কথাবার্তা কইছে বটে, কিন্তু ওদের মুখে কোন ভাবের ছাপ নেই—ওরা যেন রহস্যময় মূর্তি!'

কুমারের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই আমার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হল।

ঠিক আমাদের পাশের ঘরেই জাগল হঠাৎ এক ক্রুদ্ধ গর্জন—সঙ্গে সঙ্গে বিষম হুড়োহুড়ি ও চেয়ার-টেবিল উল্টে-পড়ার শব্দ! তারপরেই এক আর্তনাদ!

রাত্রিবেলায় এই চীনে-পাড়া মারামারি হানাহানির জন্যে বিখ্যাত। পাছে অন্যের হাঙ্গামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয় সেই ভয়ে আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম।

পর-মুহূর্তেই একটা মাঝবয়সী রক্তাক্ত চীনেম্যানের মূর্তি টলতে টলতে আমাদের কামরার কাছ-বরাবর এসে হেলে পড়ে গেল এবং তার দেহটা এসে পড়ল কামরার ভিতরে একেবারে কুমারের বুকের উপরে।

তারপরেই দেখলুম আমাদের কামরার সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল প্রায়

আট-দশ জন চীনেম্যান—তাদের চেহারা দেখলে ভালো মানুষের প্রাণ ধড়্‌ফড়্ করে উঠবে। কিন্তু আমরা দুজনেই ভালো মানুষ নই।

সব-আগে রয়েছে, লম্বায় না হোক চওড়ায় মস্ত-বড় এক মূর্তি, তার ডানহাতে একখানা আধ-হাত লম্বা রক্তমাখা ছোরা। সেইখানা উঁচিয়ে সে আমাদের ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়বার উপক্রম করলে!

মারলুম এক ঘুসি ঠিক চোয়ালের উপরে—আমার গায়ের সব শক্তি ছিল সেই মুষ্টির পিছনে। কারণ আমি জানি, মারামারির সময়ে দরদ করে মারলে ঠকতে হয় নিজেকেই।

লোকটা ঠিক্‌রে পড়ে গেল ঠিক বজ্রাহতের মতনই।

তারপরেই শুনলুম অনেকগুলো ভারি ভারি জুতোর দ্রুত শব্দ! চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আমাদের ঘরের সামনে থেকে সমস্ত জনতা হল অদৃশ্য! কিন্তু পর-মুহূর্তেই হোটেলের অন্যদিকে আবার নতুন গোলমাল উঠল—কাদের সঙ্গে আবার কাদের মারামারি ঝটাপটি চলছে! খুব সম্ভব পুলিশ এসে পড়েছে।

এতক্ষণে কামরার ভিতরে নজর দেবার সময় হল।

কুমার তখন আহত লোকটাকে সযত্নে মাটির উপর শুইয়ে দিয়েছে!

কিন্তু তার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলুম, আর কোন আশা নেই।

লোকটাও বুঝেছিল। তবু সেই অবস্থাতেও সে চোখ নেড়ে আমাকে তার কাছে যাবার জন্যে ইশারা করলে। আমি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলুম।

নিঃশ্বাস টানতে টানতে অস্ফুট স্বরে ইংরেজীতে সে বললে, 'আমি আর বাঁচব না। আমার জামার বোতাম খুলে ফ্যালো।'

তাই করলুম!

—'আমার গলায় ঝুলছে একখানা লকেট। সেটা তাড়াতাড়ি বার করে নাও।'

লকেটখানা বার করতেই সে বললে, 'লুকিয়ে রাখো! ছুন্-ছিউ দেখতে পেলে তুমিও বাঁচবে না।'

—'ছুন্-ছিউ কে?'

সে প্রথমটা উত্তর দিতে পারলে না, কেবল হাঁপাতে লাগল। তারপর অনেক কষ্টে থেমে থেমে বললে, 'যে আমাকে মেরেছে।...কিন্তু আমি যখন মরবই...গুপ্তধন তাকেও ভোগ করতে দেব না...হ্যাঁ, এই আমার প্রতিশোধ...মাটির ভিতরে... গুপ্তধন—' তার কথা বন্ধ হল, সে চোখ মুদলে।

ভাবলুম, লোকটা বোধহয় এ-জন্মের মতন আর কথা কইতে পারবে না।

কুমার বললে, 'এ কী বলছে, বিমল? কিছুই তো বোঝা গেল না! গুপ্তধন কোথায় আছে?'

লোকটা আবার চোখ খুললে। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে টেনে টেনে বললে, 'কি-পিন্...কি-পিন্...সেখানে যেও...কি-পিন্—' হঠাৎ তার বাক্য-রোধ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ কপালে উঠে স্থির হয়ে গেল!...

বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, তার হৃৎপিণ্ড আর নড়ছে না।

২

কি-পিন্ কাহিনী

খুনোখুনি, হানাহানি বা কোনরকম রোমাঞ্চকর কাণ্ডের কথা পর্যন্ত আমি ভাবি নি, কিন্তু দেখ একবার ব্যাপারখানা! এখানেও ছোরাছুরি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি? আবার গুপ্তধন—আবার দুর্বোধ্য হেঁয়ালি, 'কি-পিন্'? আবার বুঝি আমার চির-চঞ্চল দুষ্টগ্রহটি সজাগ হয়ে উঠেছেন—কলুর বলদের মতন আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারবার জন্যে?

কুমার ব্যস্তভাবে বললে, 'চটপট সরে পড়ি চল ভায়া। নইলে পুলিশ-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

হোটেলের একদিক থেকে তখনো আসছিল প্রচণ্ড ছুটোছুটি হুড়োহুড়ির শব্দ, নিশ্চয় গুণ্ডাদের সঙ্গে চলেছে পুলিশের দাঙ্গা।

সেই ফাঁকে আমরা সরে পড়লুম। সদর দরজার কাছেও পুলিশের লোক ছিল, বোধহয় আমাদের বাঙালী দেখেই বাধা দিল না।

একেবারে সিধে বাড়িতে এসে উঠলুম।

হতভাগা রামহরি বুড়ো হয়েছে, তবু তার চোখের জেল্লা কি কম? আমাদের দেখেই বললে, 'কার সঙ্গে মারামারি করে আসা হল শুনি?'

—'কে বললে আমরা মারামারি করেছি?'

—'থামো খোকাবাবু, মিছে কথা বলে আর পাপ বাড়িও না। নিজেদের জামা-কাপড়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি। ও আবার কি? কুমারের জামায় যে রক্তের দাগ!'

কুমার হেসে বললে, 'ধন্যি তুমি রামহরি! পাহারাওয়ালার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এলুম, কিন্তু—'

—'কি সর্বনাশ! এর মধ্যে আবার পাহারাওয়ালাও আছে? এই বুঝি তোমাদের খেতে যাওয়া? এমন সব খুনে ডাকাত নিয়ে আর যে পারা যায় না। হাড় যে ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। জামা-টামা খুলে ফ্যালো, দেখি কোথায় লাগল?'

বাঘাও ঘরের কোণে বসে আমাদের লক্ষ্য করছিল। রামহরির কথাবার্তা শুনে ও হাবভাব দেখে তারও মনে বোধহয় কেমন সন্দেহ জাগল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমাদের জামা-কাপড় শুঁকতে শুরু করে দিলে।

কোনগতিকে মানুষ রামহরি ও পশু বাঘার কবল ছাড়িয়ে, জামা-কাপড় বদলে বাইয়ে গিয়ে বসলুম।

কুমার বললে, 'এইবার ধুকধুকিখানা বের কর দেখি।'

কুমারের মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই হোটেলের সেই হতভাগ্য চীনেম্যানের দেওয়া লকেটখানা আমি বার করে ফেললুম —সেখানাকে ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে আমারও মনের কৌতূহল রীতিমত অশান্ত হয়ে উঠেছিল। সাধারণত ধুকধুকি বা লকেটের আকার যে-রকম হয় এখানা তার চেয়েও বড়। রুপোয় তৈরি এই ধুকধুকির উপরকার কারুকার্য দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এ হচ্ছে বিখ্যাত হুনুরী চীনে কারিকরের কীর্তি!

কারিকুরির মধ্যে মাঝখানে একটি মূর্তি আঁকা রয়েছে। মূর্তিটি এত ছোট যে, ভালো করে দেখবার জন্যে অনুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হল।

পাকা শিল্পী এতটুকু জায়গার মধ্যে অতি-সূক্ষ্ম রেখায় সম্পূর্ণ নিখুঁত এক মূর্তি এমন কায়দায় ক্ষুদে ফুটিয়ে তুলেছে যে, দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু কি কুৎসিত মূর্তি! মস্ত ভুঁড়িওয়ালা মোটাসোটা এক চেহারা, দুই চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে যেন ঐশ্বর্যের বা ক্ষমতার দর্প, মুখের ফাঁক দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে বড়-বড় আটটা দাঁত এবং পা রয়েছে তিনখানা।

বললুম, 'কুমার, এ হচ্ছে কোন খেয়ালী শিল্পীর উদ্ভট কল্পনা, এর মধ্যে কিছু বস্তু নেই। এইবার ধুকধুকির ভিতরটা দেখা যাক।'

আঙুলের চাপ দিতেই ধুকধুকির ডালা খুলে গেল। ভিতরে রয়েছে একখানা ভাজ-করা খুব পুরু কাগজ—প্রায় কার্ড বললেও চলে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। যদিও তার উপরে কোন লেখা নেই, তবু একটা নতুনত্ব আছে বটে!

চামড়ার বা ধাতুর চাদরের উপরে যেমন নক্সা emboss করা থাকে, এর উপরেও রয়েছে তেমনি উঁচু-করে তোলা কতকগুলো 'ডট্' বা বিন্দু। কোথাও একটা, কোথাও দুটো, কোথাও চারটে বা আরো বেশি বিন্দু!

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, 'ও বিমল, এ আবার কি-রকম ধাঁধাঁ হে?'

—'চীনে ধাঁধাঁ হওয়াই সম্ভব। বাঙালীর মাথায় ঢুকবে না।'

ধুকধুকির ভিতর থেকে আর কিছুই আবিষ্কার করা গেল না।

কিন্তু বিন্দুগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে, নইলে এত যত্নে কেউ এই কাগজখানাকে ধুকধুকির ভিতরে পুরে রেখে দিত না। সেই মৃত চীনেম্যানটা মরবার আগে যে দু-তিনটে কথা বলে গিয়েছিল তার দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে, ছুন্-ছিউ নামে কোন দুরাত্মা তাকে আক্রমণ করেছিল এই ধুকধুকির লোভেই। সে এমন ইঙ্গিতও দিয়ে গেছে, 'কি-পিন্' নামক স্থানে গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, আর তার রহস্য এই ধুকধুকির মধ্যেই লুকানো আছে।

কুমার বললে, 'বিমল, প্রথমে যখন আমরা রূপনাথ গুহায় গুপ্তধন* আনতে যাই, তখন মড়ার মাথায় সাঙ্কেতিক লিপির পাঠ উদ্ধার করেছিলে তুমিই। এ বিষয়ে তোমার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভালো করে ভেবে দেখ, এবারেও তুমি সফল হবে।'

এক ঘণ্টা গেল, দু-ঘণ্টা গেলু, বিন্দুগুলো নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করলুম, কিন্তু ব্যর্থ হল আমার সকল চেষ্টাই।

শেষটা সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললুম, 'চুলোয় যাক ধুকধুকির রহস্য! তার চেয়ে 'কি-পিন্' কথাটা নিয়ে আলোচনা করি এস। 'কি-পিন্' কোথায়?'

কুমার বললে, 'কি-পিন্' হয়তো চীনে মল্লুকের কোন জায়গা।'

—অসম্ভব। যাও তো কুমার, আমার লাইব্রেরী থেকে নিয়ে এস 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' আর 'গেজেটিয়ার'!'

কুমার তখনি ছুটে গেল আর বই নিয়ে ফিরে এল। দুজনে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু কোন ফলই হল না। কোথাও 'কি-পিন্' নামে কোন দেশের কথাই লেখা নাই।

কুমার বললে, 'মরবার সময়ে সেই চীনে বুড়ো যে আমাদের সঙ্গে "প্র্যাকটিক্যাল জোক' করে গেছে, এ-কথা বিশ্বাস হয় না! 'কি-পিন্' বলে কোন জায়গা নিশ্চয়ই আছে।"

আমি বললুম, 'থাকতে পারে। কিন্তু হয়তো সেটা তুচ্ছ গণ্ডগ্রাম। বাইরের কেউ তার কথা জানে না।'

সেদিন এই পর্যন্ত। কুমার বাড়ি ফিরে গেল। আমিও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের ঘোর এসে মুছে দিলে 'কি-পিন্', ধুকধুকি আর গুপ্তধনের রহস্য!

---

* আমার লেখা 'যকের ধন' উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

পরের দিন সকাল বেলা। আমি আর কুমার চা পান করছি, বাঘাও এসে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে তার প্রভাতী দুধের বাটির লোভে।

এমন সময়ে কমলকে নিয়ে বিনয়বাবু এলেন। যাঁরা আমাকে চেনেন এঁ-দুজনের সঙ্গেও নিশ্চয়ই তাঁদের পরিচয় আছে।

সকাল-বেলায় পরীক্ষা করতে করতে ধুকধুকিখানা চায়ের টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলুম, বিনয়বাবু এসেই সেখানা দেখতে পেয়ে বললেন, 'ওটা কি হে বিমল?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল বিনয়বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা। সারা জীবন ধরে তিনি জ্ঞান-সমুদ্রের ডুবুরীর কাজ করে আসছেন। আজ বয়সে পঞ্চাশ পার হয়েছেন, তবু বিদ্যাচর্চা ছাড়া আর কোন আনন্দই তাঁর নেই। তিনি হচ্ছেন আশ্চর্য এক বৃদ্ধ ছাত্র এবং এই বিশ্ব হচ্ছে তাঁর কাছে বিদ্যালয়ের মতন। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব—যে-কোন বিষয় নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছি, কখনো সঠিক উত্তরের অভাব হয় নি। কুমার তো তাঁর নাম রেখেছে—'জীবন্ত অভিধান'! কাজেই তাঁকে পেয়ে আশান্বিত হয়ে ধুকধুকিটা তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে তুলে দিলুম।

বিনয়বাবুর দুই চোখ ধুকধুকির দিকে চেয়েই কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন, 'আরে এরকম লকেট তো কখনো দেখি নি। এটা তো এদেশে তৈরি নয়। হুঁ, চীনের জিনিস। কোথায় পেলে?'

—'এক চীনেম্যানের দান। কিন্তু ওপরের ঐ মূর্তিটা কি অদ্ভুত দেখেছেন?'

—'অদ্ভুত? হ্যাঁ, মূর্তির মুখখানা চীনে ছাঁচের বটে, কিন্তু আসলে এ হচ্ছে, আমাদেরই পৌরাণিক মূর্তি।'

সবিস্ময়ে বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে হিন্দু যক্ষরাজ কুবেরের চেহারা। অষ্টদন্ত, তিনপদ। উদ্ভট, কুৎসিত চেহারার জন্যেই যক্ষরাজের নাম হয়েছে কুবের। তবে ঐশ্বর্যের মহিমায় তাঁর শ্রীহীনতার দুঃখ বোধ হয় দূর হয়েছে।'

কুমার বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি কুবেরকে তো চিনলেন। কিন্তু বলতে পারেন 'কি-পিন্' বলে কোন জায়গা আছে কিনা?'

বিনয়বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'কি-পিন্'?...'কি-পিন্'। হুঁ নামটা শুনেছি বোধহয়। বুড়ো হয়েছি ফস করে সব কথা স্মরণ হয় না। বোসো ভায়া, মনে করবার জন্যে একটু সময় দাও।'

আগ্রহ-ভরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মিনিট তিনেট পরেই সমুজ্জ্বলমুখে বিনয়বাবু বললেন, 'মনে পড়েছে, মনে

পড়েছে। কিন্তু 'কি-পিন্' নিয়ে তোমাদের এমন আশ্চর্য মাথাব্যথা কেন? তোমরা কি আজকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ?'

আমি বললুম, 'রক্ষে করুন, আমাদের ইতিহাসবিদ বলে উপহাস করবেন না। আমরা খালি জানতে চাই 'কি-পিন্' কোন্ দেশ?'

—'কি-পিন্' বা 'কা-পিন্ হচ্ছে অনেক শতাব্দী আগেকার নাম। নামটি দিশীও নয়, চীনে। সপ্তম শতাব্দীতে 'কি-পিন্' বলতে বোঝাত উত্তর-পূর্ব আফগানিস্থানের 'কপিশ' নামে জায়গাকে। তার আগে আর এক সময়ে ভারত সীমান্তের গান্ধার প্রদেশকেও 'কি-পিন্' বলে ডাকা হত। চীনে লেখকরা ভারতের আরো কোন-কোন দেশকে 'কি-পিন্' বা 'কা-পিন্' নামে জানতেন। তোমরা কোন 'কি-পিনে'র কথা জানতে চাও বুঝতে পারছি না। তবে সপ্তম শতাব্দীর 'কি-পিন্' সম্বন্ধে বড় বড় ঐতিহাসিক একটি অদ্ভুত গল্প বলেছেন, তোমাদের ধুকধুকির উপরে কুবেরের মূর্তি দেখে সেটা আমার মনে পড়ছে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা বিনয়বাবু, আগে গল্পটাই শুনি।'

বিনয়বাবু চেয়ারের উপরে হেলে পড়ে বলতে লাগলেন, 'এই ঐতিহাসিক গল্প নিয়েও অল্প বিস্তর মতান্তর আছে, ও-সব গোলমালের মধ্যে ঢুকে দরকার নেই। চীনা পর্যটক হুয়েন্ সাংয়ের ভ্রমণ আর জীবন কাহিনীতে যে গল্পটি আছে, সেইটিই তোমাদের কাছে বলব। ভিন্‌সেন্ট্ এ. স্মিথের *Early History of India* নামে বিখ্যাত ইতিহাসেও (২৭৯ পৃষ্ঠায়) এ গল্পটি পাবে। কিন্তু গল্পটি বলবার আগে আমাকে আরো কয় শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে।

'শক-জাতীয় কণিষ্ক তখন ভারত-সম্রাট। দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা। তখন সারা এশিয়ায় চীনাদের বড় প্রভুত্ব। শকেরা ভারত দখল করেও চীনাদের কর দিতে বাধ্য ছিল। দু-একবার বিদ্রোহ প্রকাশ করেও চীনাদের কাছে তারা সুবিধা করে উঠতে পারে নি। সম্রাট কণিষ্কই সর্বপ্রথমে চীনাদের জাঁক ভেঙে দিলেন। তিনি কেবল কর দেওয়াই বন্ধ করলেন না, তিব্বত ছাড়িয়ে চীন সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকে পড়ে দেশের পর দেশ জিতে তবে ফিরে এলেন এবং আসবার সময়ে জামিন স্বরূপ সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চীনের কয়েকজন রাজপুত্রকে—কেউ কেউ বলেন, তাঁদের মধ্যে চীন-সম্রাটের এক ছেলে ছিলেন।

'আফগানিস্থানকে সে সময়ে ভারতেরই এক প্রদেশ বলে ধরা হত। চীন-রাজপুত্ররা শীতের সময়ে পাঞ্জাবে থাকতেন, আর গরমের সময়ে থাকতেন আফগানিস্থানে, "শা—লো—কা" নামে বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের এক মঠে। এই মঠটি ছিল "কপিশ" পাহাড়ের এক ঠাণ্ডা উপত্যকায়। একথা বোধহয় না বললেও চলবে যে, তখন পৃথিবীতে মুসলমান ধর্মের সৃষ্টি হয় নি। আফগানিস্থানে

তখন বাস করত হিন্দু আর বৌদ্ধরাই। আজও আফগানিস্থানের চারিদিকে তখনকার বৌদ্ধমঠের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

'কিছুকাল পরে চীন-রাজপুত্রদের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হল। যাবার সময়ে তাঁরা "শা—লো—কা" বা "কপিশ" মঠকে দান করে গেলেন বিপুল বিত্ত, তাল তাল সোনা, কাঁড়ি কাঁড়ি মণি-মুক্তা! সেকালের সেই ঐশ্বর্যের পরিমাণ একালে হয়তো হবে কোটি কোটি টাকা। চীন-রাজপুত্ররা কেবল টাকা দিয়েই গেলেন না, ভারতকে শিখিয়ে গেলেন ন্যাসপাতি ও পীচফল খেতেও। তাঁরা আসবার আগে এ অঞ্চলে ও-দুটি ফলের ফসল ফলত না।

'এইবার হুয়েন্ সাংয়ের কথা। তিনি ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। 'শা—লো—কা' 'কপিশ' মঠে ৩৬০ খ্রিস্টাব্দে গিয়ে বর্ষাকালটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। অত দিন পরেও মঠের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দ্বিতীয় শতাব্দীর সেই চীন-রাজপুত্রদের অসাধারণ দানের কথা নিয়ে হুয়েন্ সাংয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেন নি।

'সন্ন্যাসীরা আর এক বিষয় নিয়ে হুয়েন্ সাংয়ের কাছে ধর্ণা দিলেন। সন্ন্যাসীরা বললেন, "কপিশ" মঠে যক্ষরাজ কুবেরের প্রকাণ্ড এক পাথরের মূর্তি আছে। এবং তাঁরই পায়ের তলায় পোঁতা আছে চীন-রাজপুত্রদের দেওয়া অগাধ ঐশ্বর্য।

'সেই ঐশ্বর্য উদ্ধার করবার জন্যে হুয়েন্ সাংকে অনুরোধ করা হল। হুয়েন্ সাং জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা যখন গুপ্তধনের সন্ধান জানেন, তখন আমাকে অনুরোধ করছেন কেন?"

'সন্ন্যাসীরা জানালেন, "ভয়াবহ যকেরা ঐ গুপ্তধনের উপরে পাহারা দেয় দিন-রাত! একবার এক অধার্মিক রাজা গুপ্তধন অধিকার করতে যান। কিন্তু যকেরা এমন উৎপাত শুরু করে যে রাজা প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আমরাও যতবার গুপ্তধন নেবার চেষ্টা করেছি ততবারই ভৌতিক উৎপাত হয়েছে। রাজপুত্ররা অর্থ দিয়েছিলেন মঠের উন্নতির জন্যে। কিন্তু সংস্কার অভাবে মঠের আজ অতি দুর্দশা হলেও ধন-ভাণ্ডারে হাত দেবার উপায় নেই। আপনি সাধু ব্যক্তি। আপনার উপরে হয়তো যকেরা অত্যাচার করবে না।"

'হুয়েন্ সাং রাজি হয়ে ধূপ-ধুনো জ্বেলে উপাসনা করে যক্ষদের উদ্দেশ করে বললেন, "হে যক্ষ, হে গুপ্তধনের রক্ষক! আমার উপরে প্রসন্ন হও! আমি মন্দির-মঠের মেরামতির জন্যে যে অর্থের দরকার কেবল তাই নিয়ে বাকি সব ঐশ্বর্য যথাস্থানে রেখে দেব!"

'যকেরা হুয়েন্ সাংকে বাধা দিলে না। গুপ্তধনের অধিকাংশই হয়তো এখনো মাটির তলায় লুকানো আছে। আমার গল্প ফুরুল।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমাদের গল্প এইবার শুরু হবে!'

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসু চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে?'

—'পরে সব বলছি। আপনার এই ঐতিহাসিক গল্পটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু আলো দেখতে পেয়েছি বটে, কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। ধাঁধাঁয় পড়ে আছি এই কাগজখানা নিয়ে। এর রহস্য উদ্ধার করতে পারেন কি?' বলেই আমি ধুক্‌ধুকির ভিতর থেকে পুরু কাগজখানা বার করে তাঁর হাতে দিলুম।

বিনয়বাবু কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়েই সহজ স্বরে বললেন, 'এতো দেখছি "ব্রেল্"-পদ্ধতিতে লেখা!'

কুমার লাফিয়ে উঠে বললে, "ব্রেল্"-পদ্ধতিতে লেখা? অর্থাৎ যে-পদ্ধতিতে অন্ধেরা লেখাপড়া করে?'

—'হ্যাঁ, এই পদ্ধতিতে এক থেকে ছয়টি মাত্র বিন্দুকে নানাভাবে সাজিয়ে বর্ণমালা প্রভৃতির সমস্ত কাজ সারা যায়। আমি অন্ধ না হলেও কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এ-পদ্ধতিটা শিখে নিয়েছি।'

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, 'তাহলে লেখাটা আপনি এখনি পড়তে পারবেন?'

—'নিশ্চয়! খুব সহজেই!'

কুমার আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠল, 'জয় বিনয়বাবুর জয়!'

৩

ছুন্-ছিউ

আমরা সবাই কৌতূহলী চোখে বিনয়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

ধুক্‌ধুকির ডালা খুলে বাঁ-হাতের উপরে সেখানা রেখে বিনয়বাবু আগে সেই emboss করা বিন্দুগুলোর উপরে ডানহাতের আঙুল বুলিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'এর ওপরে ইংরেজী ভাষায় লেখা রয়েছে—'শা-লো-কো : পশ্চিম দিক : ভাঙা মঠ : কুবের মূর্তি : গুপ্ত গুহা : '—ব্যাস্, আর কিছু নেই!'

আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে কথাগুলো মনে-মনে নাড়াচাড়া করে দেখলুম, তারপর বললুম, 'বিনয়বাবু, আপনার মতে শা-লো-কা, কি-পিন, কা-পিন, কপিশ বলতে এক জায়গাকেই বোঝায়?'

—'আমার মত নয় বিমল, এ হচ্ছে ঐতিহাসিকদের মত।'

—'ওখানে গুপ্তধন আছে, এটাও ঐতিহাসিক সত্য?'

—'একে ঐতিহাসিক সত্য না বলে ঐতিহাসিক গল্প বলা উচিত। এ গল্প বলেছেন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং। ঐতিহাসিকেরা গল্পটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ এর সত্য-মিথ্যার জন্যে ঐতিহাসিকরা দায়ী নন।'

—'তাহলে শা-লো-কা বা কপিশ মঠের কথাও গল্পের কথা?'

—'না, কা-পিন, কি-পিন, শা-লো-কা বা কপিশ—যে নামেই ডাকো, ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে।'

—'উত্তর-পূর্ব আফগানিস্থানে?'

—'হ্যাঁ। ও-জায়গাটির আধুনিক নাম হচ্ছে কাফ্রিস্থান।'

কুমার বললে, 'কাফ্রিস্থান? ও বাবা, সে যে হিন্দুকুশ পাহাড়ের ওপারে! সেখানেও বৌদ্ধ মঠ, হিন্দু দেবতা কুবের!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কুমার, আজকের দিনে ভারতবাসী পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা পেয়ে নিজেকে সভ্যতায় অগ্রসর হয়েছে বলে মনে করে বটে, কিন্তু স্বদেশ আর স্বজাতি সম্বন্ধে হয়েছে রীতিমত অন্ধ। তোমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজরা আফগানিস্থানের এপারেই ভারতের সীমারেখা টেনেছে বলে সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নেবার কারণ নেই। এক সময়ে ভারত-সম্রাটের সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল ইংরেজরা আজও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। আফগানিস্থান নামে কোন দেশের নাম কেউ তখন স্বপ্নেও শোনে নি। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুকুশেরও ওপারে। আজ বিলাতী জিওগ্রাফি যাকে আফগানিস্থান বলে ডাকে, তখনকার পৃথিবী তাকে ভারতবর্ষ বলেই জানত, আর সেখানে বাস করত ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনরাই। ওখানে যে বৌদ্ধ মঠ আর হিন্দু দেবতা থাকবে, এ আর আশ্চর্য কথা কি? ভারতের গৌরবের দিনে উত্তরে চীনদেশে, দক্ষিণে জাভা, বালি, সুমাত্রা দ্বীপে আর পূর্বে কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু দেবতাদের যাতায়াত ছিল। তোমরা সত্যিকার ভারতের ইতিহাস পড় ভাই, নিজেদের এমন ছোট করে দেখো না!'

আমি বললুম, 'উত্তম! তাহলে দু-চার দিনের মধ্যেই আমরা কাফ্রিস্থানে ভারতের পূর্বগৌরব দেখবার জন্যে যাত্রা করব, আর আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন আপনিই!'

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমাদের এই আকস্মিক উৎসাহ অত্যন্ত সন্দেহজনক!'

—'কেন?'

—'বিমল-ভায়া, আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না, আমি তোমাদের

খুব ভালো করেই চিনি! ধুক্‌ধুকির ওপরে ব্রেল-পদ্ধতিতে লেখা এই অদ্ভুত কথাগুলো আর কা-পিন্, কি-পিন্ বা কপিশ মঠ সম্বন্ধে তোমাদের আগ্রহ দেখেই বুঝতে পেরেছি, আবার তোমরা নতুন কোন 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র গন্ধ পেয়েছ! আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি?'

আমি তখন হাসতে হাসতে চীনে-হোটেলের ঘটনাটা বর্ণনা করলুম।

সমস্ত শুনে বিমলবাবু হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'বিমল! কুমার! তোমাদের মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

—'কেন?'

—'কণিষ্ক ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ। গুপ্তধনের কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও আমি বলতে বাধ্য যে, এতকাল পরে সেখানে গিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না।'

—'কারণ?'

—'কারণ ঐতিহাসিক গল্পেই প্রকাশ, প্রাচীনকালেও ঐ গুপ্তধনের কাহিনীটি ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত, তাই আরো অনেকে তা লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছিল।'

—'কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতেও হুয়েন্ সাং স্বচক্ষে সেই গুপ্তধন দেখেছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী বড় কম দিনের কথা নয়।'

—'তারপর কত বিদেশী দস্যু দ্বিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ঠিক ঐ অঞ্চল দিয়েই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, এ-কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? তারা কি ঐ গুপ্তধনের কথা শোনে নি?'

—'না শোনাও আশ্চর্য নয়! তারপর ভারতে কতবার অন্ধযুগ এসেছে। বার বার কত রাজ্যের, কত ধর্মের উত্থান-পতন হয়েছে। মঠ গেছে ভেঙে, সন্ন্যাসীরা গেছে পালিয়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লবের মধ্যে পড়ে লোকে গুপ্তধনের কথা না ভুললেও ঠিকানা হয়তো ভুলে গিয়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত গুপ্তধনের গল্প শোনা যায়, যার কথা সকলেই জানে কিন্তু যার ঠিকানা কেউ জানে না!'

কুমার বললে, 'তারপর আরো একটা কথা ভেবে দেখুন, বিনয়বাবু! আপনি ইতিহাসের যে গল্পটা বললেন আমরা কেউই তা জানতুম না। কিন্তু সেই হতভাগ্য চীনেম্যানের কাছ থেকে আমরা যে ধুক্‌ধুকিটা পেয়েছি, তার সঙ্গে ঐ গল্পের প্রধান কথাগুলো অবিকল মিলে যাচ্ছে। যেমন শা-লো-কা, ভাঙা মঠ, কুবের মূর্তি। আপনি বলছেন, শা-লো-কা বা কপিশ মঠ ছিল পাহাড়ের উপত্যকায়, ধুক্‌ধুকির লেখাতেও রয়েছে গুপ্তগুহার কথা, আর গুহা থাকে পাহাড়েই। তারপর সেই চীনেম্যান মরবার আগে কি-পিন্-এরও নাম করেছিল। এখেকেই বোঝা

যাচ্ছে, যেমন করেই হোক্ একালের কেউ কেউ ঐ প্রাচীন ঐতিহাসিক গুপ্তধনেরই ঠিকানা জানতে পেরেছে।'

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'না ভায়া, আমি তোমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারব না। তোমরা যতই যুক্তি দেখাও, বুনো হাঁসের পিছনে ছোটবার বয়স আর আমার নেই। তারপর অত লোভও ভাল নয়। ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। আবার গুপ্তধনের উদ্দেশে দেশ-দেশান্তরে ছুটাছুটি করা কেন?'

বিনয়বাবু আমাদের ভুল বুঝেছেন দেখে আমি আহত স্বরে বললুম, 'বিনয়বাবু, আপনি তো জানেন, টাকাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান নয়! এ গুপ্তধন হচ্ছে আমাদের ঘর ছেড়ে পথে বেরুবার একটা ওজর বা উপলক্ষ মাত্র। গেল-জন্মে আমি আর কুমার নিশ্চয়ই বেদুইন ছিলুম—শান্ত শ্যামলতার সুখ-স্বপ্নের চেয়ে অশান্ত মরুভূমির বিভীষিকাই আমাদের কাছে লাগে ভালো। দখিন বাতাসের চেয়ে কালবৈশাখীর ঝড়ই আমরা বেশি পছন্দ করি।'

এমন সময়ে রামহরি ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, 'খোকাবাবু, চারটে চীনেম্যান এসেছে এ-বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'চীনেম্যান? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

কুমার চিন্তিত স্বরে বললে, 'চীনে হোটেলের কর্তারা নয়তো? হয়তো পুলিশ-হাঙ্গামে পড়ে আমাদের সাক্ষী মানতে এসেছে।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব। তারা ঠিকানা জানবে কেমন করে?'

কুমার বললে, 'তাও বটে!'

—'তাই তো, কে এরা? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কলকাতায় ভদ্র অভদ্র কোন চীনেম্যানের সঙ্গেই তো আমার আলাপ-পরিচয় নেই!'

রামহরি বললে, 'কি গো, ওদের কি বলব?'

—'এখানে আসতে বল।'

রামহরি চলে গেল। ধুক্‌ধুকিটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে আমি জামার পকেটে রেখে দিলুম।

ঘরের ভিতরে প্রথমেই যে মূর্তিটা এসে দাঁড়াল তাকে দেখেই চিনতে আমার একটুকুও বিলম্ব হল না। কাল রাত্রে হোটেলে এই লোকটাই ছোরা হাতে করে সেই চীনে-বুড়োকে মারাত্মক আক্রমণ করেছিল!

আমি হতভম্বের মতন তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে একগাল হেসে ইংরেজীতে বললে, 'কি বাবু, তুমি কি আমাকে চিনে ফেলেছ? হা হা হা হা—আমরা পুরানো বন্ধু, কি বল?'

আমি রুক্ষ স্বরে বললুম, 'এখানে তোমার কি দরকার?'

—'বলছি। আগে ভালো করে একটু বসি।' তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। এবং তার আরো তিন জন সঙ্গীও ঘরের ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল ঠিক তিনটে পাথরের মূর্তির মতন।

কুমার ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'তোমরা হচ্ছ হত্যাকারী। এখনি পুলিশে খবর দেব।'

প্রথম চীনেম্যানটা আবার একগাল হেসে বললে, 'বেশ বাবু, তাই দিও। কিন্তু এতটা তাড়াতাড়ি কেন? আগে আমার কথাই শোনো।'

আমি বসে বসে লোকটাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলুম। আগেও দেখেছিলুম এখনো দেখলুম, মাথায় সে পাঁচ ফুটও উঁচু হবে না, কিন্তু তার দেহটা চওড়ায় সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। অসম্ভব চওড়া দেহের উপরে মঙ্গোলীয় ছাঁচে গড়া মুখ—আমার সামনে বসে আছে যেন মানুষের ছদ্মবেশে বীভৎস একটা ওরাং-উটাং!

সে হাসতে হাসতে বললে, 'বাবু, হোটেলে কাল তুমি আমার মুখের উপরে যে-ঘুসিটা চালিয়েছিলে, আমি এখনও তা ভুলি নি!'

আমি বললুম, 'ও, সেইজন্যেই কি তুমি আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছ?'

—'মোটেই নয় বাবু, মোটেই নয়! আমি তোমার ঘুসির তারিফ করি!'

জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগলুম, লোকটার উদ্দেশ্য কি?

সে বললে, 'ভগবান আমাকে ঢ্যাঙা করেন নি, কিন্তু আমার গায়ে শক্তি দিয়েছেন। এজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। একহাতে আমি তিন মণ মাল মাথার ওপরে তুলে ষোল হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি! কিন্তু আমার মতন লোককেও তুমি এক ঘুসিতে কাবু করেছ! যদিও আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত থাকলে এমন অঘটন ঘটত না, তবু তুমি বাহাদুর!'

—'তোমার নাম কি ছুন্-ছিউ?'

সে চম্‌কে উঠল। তারপর বললে—'তাহলে তুমি আমার নাম পর্যন্ত আদায় করেছ? ভালো কথা নয়—ভালো কথা নয়'—বলতে বলতে ধাঁ-করে পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করলে একটা রিভলভার।

তার পিছনের তিন মূর্তিও সঙ্গে সঙ্গেই এক-একটা রিভলভার বার করে ফেললে!

আমাদের চোখের সামনে স্থির হয়ে রইল চার-চারটে রিভলভারের চক্‌চকে নল্‌চে!

৪

রামহরির ভীমরতি হয় নি

ছুন্-ছিউ'র রিভলভারটার লক্ষ্য ঠিক আমার দিকেই!

এ-ভাবে চোখের সামনে রিভলভার তুললে কারুরই মনে স্বস্তি হয় না, আমারও হল না।

কুমার, বিনয়বাবু ও কমলের মুখের পানে একবার আড়-চোখে চেয়ে দেখলুম। রিভলভারের মহিমায় তাদের কারুরই ভাবান্তর হয় নি দেখে বিস্মিত হলুম না। আমরা সকলেই একই বপদ-পাঠশালার পাঠ গ্রহণ করেছি বহুবার, রিভলভার দেখেই আর্তনাদ করবার অভ্যাস আমাদের নেই।

ঘরের এদিকে-ওদিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। আমাদের পিছনে ঘরের দেওয়াল। আমার ডানপাশে কুমার, বাঁ পাশে বিনয়বাবু, তাঁর পাশে কমল বসে আছে। আমার সামনেই একটা গোল মার্বেলের টেবিল। তার ওপাশে বসে ছুন-ছিউ এবং তার পিছনে এক সারে দাঁড়িয়ে আছে আর তিনটে চীনেম্যান। তাদের পিছনেই এ-ঘর থেকে বেরুবার একমাত্র দরজা। পিছনে হটবার উপায় নেই, চীনেদের এড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়াও অসম্ভব। নিজের ঘরেই ফাঁদে পড়ে গিয়েছি, পালাবার পথ একবারে বন্ধ।

টেবিলের তলায় স্থির হয়ে বসে আছে বাঘা। অন্য কোন কুকুর হলে এতক্ষণে নিশ্চয় গর্জন করে তেড়ে যেত। কিন্তু রিভলভারের সামনে গর্জন করলে বা তেড়ে গেলে যে মহা বিপদের সম্ভাবনা, এটা বুঝতে তার দেরি লাগল না—এমনি শিক্ষিত কুকুর সে!

ছুন-ছিউ হাসতে হাসতে বললে, 'বাবু কি দেখছ, কি ভাবছ? বুঝতে পারছ তো এ-বাড়ির মালিক হচ্ছি এখন আমি?'

হতভাগার বাঁদুরে মুখে হাসি দেখে গা যেন জ্বলে গেল। বললুম, 'ছুন্-ছিউ, তোমার রিভলভার নামাও। তুমি ভুলে যাচ্ছ এটা চীনদেশ নয়।'

ছুন্-ছিউ বললে, 'না বাবু, ভুলি নি। আমি জানি এটা বাংলাদেশ, আর এখানে বাস করে কাপুরুষ বাঙালীরা।'

—'আমরাও সশস্ত্র হলে এ-কথা বলবার সাহস তোমার হত না।'

—'চুপ কর বাবু! তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে আসি নি। কাল হোটেল থেকে তোমরা একটা লকেট চুরি করে এনেছ। ভালো চাও তো সেখানা ফিরিয়ে দাও।'

—'ছুন্-ছিউ, তুমি চণ্ডু খেয়ে স্বপ্ন দেখছ। লকেট! সে আবার কি?'

—'আকাশ থেকে খসে পড়বার চেষ্টা কোরো না বাবু! তুমি বলতে চাও তোমার কাছে একখানা রুপোর লকেট নেই?'

আমার যুক্তি হচ্ছে, চোর-ডাকাত খুনেকে ঠকাবার দরকার হলে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না। অতএব কোন রকম দ্বিধা না করে বললুম, 'না। সোনার বা রুপোর বা পিতলের কোনরকম লকেট-ফকেটের ধার আমি ধারি না।'

কুমার মস্ত একটা হাই তুলে বললে, 'ওহে ছুন্-ছিউ, তোমার ছাতা-পড়া দাঁতগুলো দেখে আমার গা বমি বমি করছে। তুমি দাঁত বার করে আর না হাসলেই বাধিত হব।'

বিনয়বাবু টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিলেন।

কমলও কম দুষ্ট নয়। বললে, 'ছুন্-ছিউ, তুমি একটা লক্ষ্ণৌ ঠুংরী শুনবে?'

বাঘা যেন নাচারের মতন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সামনের দিকে দুই থাবা বাড়িয়ে দিয়ে তার উপরে নিজের মুখ স্থাপন করলে—কিন্তু তার দৃষ্টি রইল চীনেম্যানদের দিকেই।

ছুন্-ছিউ বললে, 'ওহে বাবু, আমার সঙ্গে রসিকতা করা নিরাপদ নয়। মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি, চোখে দেখবার আগেই আমি মানুষ খুন করে বসি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু চোখে দেখেও তুমি দয়া করে আমাদের খুন করছ না কেন শুনি!'

—'লকেটখানা কোথায় রেখেছ এখনো টের পাই নি বলে।'

—'তাহলে লকেটখানা পেলেই তোমরা আমাদের খুন করবে?'

—'না। তোমরা ভদ্র ব্যবহার কর, আমরাও ভদ্র ব্যবহার করব।'

—'ধন্যবাদ। কিন্তু লকেট আমাদের কাছে নেই।'

—'নেই নাকি? কিন্তু হোটেলে কাল তুমি যখন মরো-মরো বুড়ো চ্যাংয়ের গলা থেকে লকেটখানা খুলে নিচ্ছিলে, আমাদের লোক তা দেখেছিল। তারপর তোমাদের পিছু ধরে এসে আমাদের লোক এই বাড়িখানাও দেখে গিয়েছে। বুঝেছ? আমরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে এখানে আসি নি!'

ঠিক সেই সময়ে দেখলুম, দরজার বাইরে রামহরির মুখ একবার উঁকি মেরেই সাঁৎ করে সরে গেল! আগেই বলেছি, দরজার দিকে পিছু ফিরে তিনটে চীনেম্যান এক সারে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল ছুন্-ছিউ। সুতরাং তারা কেউ এই দৃশ্যটা দেখতে পেলে না।

আমি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলুম—এবং কুমার ও কমলের মুখ দেখে বুঝলুম, তারাও দেখেছে এই দৃশ্যটা।

বিনয়বাবু হঠাৎ হাতের বইখানা টেবিলের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর গোঁফদাড়ির ফাঁকে একটুখানি হাসির ঝিলিক্ ফুটেই মিলিয়ে গেল। হুঁ, বিনয়বাবু তাহলে বই পড়তে পড়তে চোরা চোখেও তাকাতে পারেন!

বাঘা টপ করে উঠে পড়ে একটা ডন্ দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল এবং ঘন ঘন নাড়তে লাগল তার ল্যাজটা।

ছুন্-ছিউ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আরে, আরে, কুকুরটা খামোকা দাঁড়িয়ে উঠে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে কেন?'

আমি বললুম, 'এতক্ষণ পরে ও তোমাকে বন্ধু বলে চিনে ফেলেছে!'

ছুন্-ছিউ চট্ করে একবার পিছন দিকটা দেখে নিয়ে বললে, 'আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি! না, আর দেরি নয়! হয় লকেট দাও, নয় মরো!' সে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে দুই পা এগিয়ে এল!

কুমার বললে, 'অতটা এগিয়ে এস না ছুন্-ছিউ, অতটা এগিয়ে এস না! তাহলে আমি খপ্ করে হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারি!'

ছুন্-ছিউ আবার পিছিয়ে পড়ে বললে, 'কেড়ে নিবি? দানব মানব, ভগবান-শয়তান—ছুন্-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে?...ওরে, এই বাঙালী-বাবুদের কেউ একটা আঙুল নাড়লেই তোরা গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দিবি, বুঝেছিস?'

তারা চারজনে আমাদের এক-একজনের দিকে লক্ষ্য স্থির করে রিভলভার তুলে ধরলে।

এইবারে সত্য-সত্যই ছুন্-ছিউর দুই চক্ষে ফুটে উঠল হত্যাকারীর জ্বলন্ত দৃষ্টি! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বললে, 'এই আমি তিন গুণছি! এর মধ্যে লকেট না দিলে আর তোদের রক্ষে নেই!...এক...দুই—'

ছুন্-ছিউ দুই গোণবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপথে আবার রামহরির আবির্ভাব! পা টিপে টিপে সে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল—এক গাছা লম্বা, মোটা দড়ির দুই মুখ দুই হাতে ধরে! তারপর সে গাছাকে 'স্কিপিং'-দড়ির মতন শূন্যে তুলেই সে একসঙ্গে তিন চীনে-মূর্তির মাথার উপর দিয়ে ফেলে খুব জোরে মারলে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচ্‌কা-টান! বয়সে রামহরি পঞ্চান্ন পার হলেও এখনো সে শক্তিহীন হয় নি—পর-মুহূর্তেই তিন চীনে-মূর্তি একসঙ্গে ঠিকরে পপাত ধরণীতলে! বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার ও কমল সেই মুহূর্তেই এক এক লাফে সেই ভূপতিত দেহ তিনটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

—'ছুন্‌-ছিউ, তুমি চণ্ডু খেয়ে স্বপ্ন দেখছ। লকেট! সে আবার কি?'

—'আকাশ থেকে খসে পড়বার চেষ্টা কোরো না বাবু! তুমি বলতে চাও তোমার কাছে একখানা রুপোর লকেট নেই?'

আমার যুক্তি হচ্ছে, চোর-ডাকাত খুনেকে ঠকাবার দরকার হলে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না। অতএব কোন রকম দ্বিধা না করে বললুম, 'না। সোনার বা রুপোর বা পিতলের কোনরকম লকেট-ফকেটের ধার আমি ধারি না।'

কুমার মস্ত একটা হাই তুলে বললে, 'ওহে ছুন্‌-ছিউ, তোমার ছাতা-পড়া দাঁতগুলো দেখে আমার গা বমি বমি করছে। তুমি দাঁত বার করে আর না হাসলেই বাধিত হব।'

বিনয়বাবু টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিলেন।

কমলও কম দুষ্ট নয়। বললে, 'ছুন্‌-ছিউ, তুমি একটা লক্ষ্ণৌ ঠুংরী শুনবে?'

বাঘা যেন নাচারের মতন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সামনের দিকে দুই থাবা বাড়িয়ে দিয়ে তার উপরে নিজের মুখ স্থাপন করলে—কিন্তু তার দৃষ্টি রইল চীনেম্যানদের দিকেই।

ছুন্‌-ছিউ বললে, 'ওহে বাবু, আমার সঙ্গে রসিকতা করা নিরাপদ নয়। মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি, চোখে দেখবার আগেই আমি মানুষ খুন করে বসি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু চোখে দেখেও তুমি দয়া করে আমাদের খুন করছ না কেন শুনি!'

—'লকেটখানা কোথায় রেখেছ এখনো টের পাই নি বলে।'

—'তাহলে লকেটখানা পেলেই তোমরা আমাদের খুন করবে?'

—'না। তোমরা ভদ্র ব্যবহার কর, আমরাও ভদ্র ব্যবহার করব।'

—'ধন্যবাদ। কিন্তু লকেট আমাদের কাছে নেই।'

—'নেই নাকি? কিন্তু হোটেলে কাল তুমি যখন মরো-মরো বুড়ো চ্যাংয়ের গলা থেকে লকেটখানা খুলে নিচ্ছিলে, আমাদের লোক তা দেখেছিল। তারপর তোমাদের পিছু ধরে এসে আমাদের লোক এই বাড়িখানাও দেখে গিয়েছে। বুঝেছ? আমরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে এখানে আসি নি!'

ঠিক সেই সময়ে দেখলুম, দরজার বাইরে রামহরির মুখ একবার উঁকি মেরেই সাঁৎ করে সরে গেল! আগেই বলেছি, দরজার দিকে পিছু ফিরে তিনটে চীনেম্যান এক সারে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল ছুন্‌-ছিউ। সুতরাং তারা কেউ এই দৃশ্যটা দেখতে পেলে না।

আমি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলুম—এবং কুমার ও কমলের মুখ দেখে বুঝলুম, তারাও দেখেছে এই দৃশ্যটা।

বিনয়বাবু হঠাৎ হাতের বইখানা টেবিলের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর গোঁফদাড়ির ফাঁকে একটুখানি হাসির ঝিলিক্ ফুটেই মিলিয়ে গেল। হুঁ, বিনয়বাবু তাহলে বই পড়তে পড়তে চোরা চোখেও তাকাতে পারেন!

বাঘা টপ করে উঠে পড়ে একটা ডন্ দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল এবং ঘন ঘন নাড়তে লাগল তার ল্যাজটা।

ছুন্-ছিউ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আরে, আরে, কুকুরটা খামোকা দাঁড়িয়ে উঠে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে কেন?'

আমি বললুম, 'এতক্ষণ পরে ও তোমাকে বন্ধু বলে চিনে ফেলেছে!'

ছুন্-ছিউ চট্ করে একবার পিছন দিকটা দেখে নিয়ে বললে, 'আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি! না, আর দেরি নয়! হয় লকেট দাও, নয় মরো!' সে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে দুই পা এগিয়ে এল!

কুমার বললে, 'অতটা এগিয়ে এস না ছুন্-ছিউ, অতটা এগিয়ে এস না! তাহলে আমি খপ্ করে হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারি!'

ছুন্-ছিউ আবার পিছিয়ে পড়ে বললে, 'কেড়ে নিবি? দানব মানব, ভগবান-শয়তান—ছুন্-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে?...ওরে, এই বাঙালী-বাবুদের কেউ একটা আঙুল নাড়লেই তোরা গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দিবি, বুঝেছিস?'

তারা চারজনে আমাদের এক-একজনের দিকে লক্ষ্য স্থির করে রিভলভার তুলে ধরলে।

এইবারে সত্য-সত্যই ছুন্-ছিউর দুই চক্ষে ফুটে উঠল হত্যাকারীর জ্বলন্ত দৃষ্টি! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বললে, 'এই আমি তিন গুণছি! এর মধ্যে লকেট না দিলে আর তোদের রক্ষে নেই!...এক...দুই—'

ছুন্-ছিউ দুই গোণবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপথে আবার রামহরির আবির্ভাব! পা টিপে টিপে সে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল—এক গাছা লম্বা, মোটা দড়ির দুই মুখ দুই হাতে ধরে! তারপর সে গাছাকে 'স্কিপিং'-দড়ির মতন শূন্যে তুলেই সে একসঙ্গে তিন চীনে-মূর্তির মাথার উপর দিয়ে ফেলে খুব জোরে মারলে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচ্‌কা-টান! বয়সে রামহরি পঞ্চান্ন পার হলেও এখনো সে শক্তিহীন হয় নি—পর-মুহূর্তেই তিন চীনে-মূর্তি একসঙ্গে ঠিকরে পপাত ধরণীতলে! বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার ও কমল সেই মুহূর্তেই এক এক লাফে সেই ভূপতিত দেহ তিনটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

এদিকে শব্দ শুনে চমকে ছুন্-ছিউ যেই ভুলে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি বাঘা তড়াক্ করে লাফ মেরে তার রিভলভারশুদ্ধ ডান হাতের কব্জিতে কামড় মেরে ঝুলে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ধাক্কা মেরে সামনের টেবিলটা সরিয়ে ছুন্-ছিউর চোয়ালের উপরে দিলুম বিষম এক 'নক্-আউট ব্লো'! হঠাৎ গোড়া-কাটা গাছের মতন ছুন্-ছিউ সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের মেঝের উপরে!

সমস্ত ব্যাপারটা বলতে এতগুলো লাইনের দরকার হয় বটে, কিন্তু এগুলো ঘট্‌তে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে নি!

হাতে মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা পরে চোয়ালের ঠিক জায়গায় ঘুসি মারতে পারলে প্রতিপক্ষ তখনি কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বেই পড়বে! কিন্তু দস্তানা-হীন হাতে চোয়ালের যথাস্থানে ঘুসি মারলেও প্রায়ই দেখা যায়, চোয়াল ভেঙ্গে রক্তাক্ত হয়ে গেলেও এবং কাবু হয়ে পড়লেও প্রতিপক্ষ জ্ঞান হারায় নি!

ছুন্-ছিউও জ্ঞান হারালো না। মাটিতে পড়েই সে আবার ওঠবার উপক্রম করছে দেখে আমি তারই হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটা তুলে নিয়ে ধমক দিয়ে বললুম, 'চুপ করে শুয়ে থাক্ চীনে-বাঁদর! নড়লেই মরবি—তোকে মারলে আমার ফাঁসী হবে না!'

আচ্ছন্ন হতভম্বের মতন আমার হাতের রিভলভারের দিকে তাকিয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

ফিরে দেখি, বিনয়বাবু, কুমার ও কমলেরও হাতে গিয়ে উঠেছে তিন চীনেম্যানের তিন রিভলভার! রামহরি আনন্দে আটখানা হয়ে হাততালি দিচ্ছে এবং বাঘা 'ঘেউ-ঘেউ' রবে ঘরময় ছুটে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

বললুম, 'রামহরি, নিয়ে এস আরো খানিকটা দড়ি! এই চার বেটার হাত-পা বেঁধে ফ্যালো!'

রামহরি তখনি আরো দড়ি নিয়ে এসে চীনেম্যানগুলোকে বাঁধতে বসল।

কুমার বললে, 'একেই ইংরেজীতে বলে টেবিল উল্টানো! চীনেদের হল্‌দে হাতের রিভলভারগুলোই এসেছে এখন আমাদের বাদামি হাতে!'

কমল বললে, 'দানব-মানব, ভগবান-শয়তান—ছুন্-ছিউর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেবে কে?—কেড়ে নেবে আমাদের প্রিয়তম বাঘা! দানব-মানব, ভগবান-শয়তানের যা অসাধ্য কুকুর বাঘার এক কামড়ে তা সাধ্য হল!'

ছুন্-ছিউ রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, 'তোমরা এখন আমাদের নিয়ে কি করতে চাও?'

আমি বললুম, 'রামহরি, ও-ঘরে গিয়ে থানায় "ফোন" করে দিয়ে এস তো!'

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, তুমি আমাকে মনে কর কি? বুড়ো হলেও

এখনো আমার ভীমরতি হয় নি—আর লেখাপড়া না জানলেও বুদ্ধিতে আমি তোমাদের কারুর চেয়ে কম নই! এই চার চীনে-হনুমানের রকম-সকম উঁকি মেরে দেখেই আমি খানিক আগে থানায় 'ফোন' করে দিয়েছি—পুলিশ এসে পড়ল বলে!'

বিনয়বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'ধন্য রামহরি, ধন্য! আজকের এই নাট্যাভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় তোমার কৃতিত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি!'

৫

রাতের আঁধারে

এইবার বিনয়বাবুকে রাজি করিয়েছি।

তাঁর কাফ্রিস্থানে যেতে নারাজ হবার প্রধান কারণই ছিল, প্রাচীন বৌদ্ধমঠের মধ্যে এখনো যে গুপ্তধন আছে এটা তিনি সত্য বলে মানতে পারছিলেন না। কিন্তু চীনেম্যানগুলোর কাণ্ড দেখে এখন তিনি মত বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন, গুপ্তধনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত না হলে ঐ চীনে দুরাত্মার দল এত মরিয়া হয়ে এমন সব সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে পারত না।

এখন তিনি বলছেন, 'ওহে, ঐ লকেটের পিছনে সত্যই কোন গুপ্তরহস্য আছে! গুপ্তধনের লোভ আমি করি না, কিন্তু রহস্যটা কি জানবার জন্যে ভারি আগ্রহ হচ্ছে।'

আগ্রহ নেই খালি রামহরির। সে থেকে থেকে বলে, 'ছি ছি! বিনয়বাবু, এই বয়সে কোথায় জপ-তপ আর হরিনাম নিয়ে থাকবেন, তা না করে আপনিও কিনা ঐ গোঁয়ার ছোঁড়াগুলোর দলে গিয়ে ভিড়লেন।'

বিনয়বাবু যুৎসই জবাব খুঁজে না পেয়ে অসহায় ভাবে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

কুমার বলে, 'ভ্যাংচি দিও না রামহরি, দল ভাঙাবার চেষ্টা করো না। তোমার যদি এতই অমত, তবে থাকো না তুমি কলকাতায় পড়ে। আমরা তো মাথার দিব্যি দিয়ে তোমাকে সাধাসাধি করছি না? কি বলিস রে বাঘা?'

বাঘা বোধ করি সায় দেবার জন্যেই একবার কুমার আর একবার রামহরির মুখের পানে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে।

—'আরে মোলো, পাজী কুকুর! তুইও ঐ দলে?' রামহরি রেগে চড় মারতে যায়, বাঘা কুমারের পিছনে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

আমাদের যাত্রার তোড়জোড় চলছে। এতদিনে আমরা বেরিয়েও পড়তুম, কিন্তু যেতে পারছি না কেবল ঐ হতভাগা ছুন্-ছিউয়ের জন্যে। এখনো তার বিচার শেষ হয় নি, আর আমরা হচ্ছি সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী।

পুলিশের তদারকে প্রকাশ পেয়েছে, ছুন্-ছিউ হচ্ছে চীনদেশের এক বিখ্যাত ডাকাতসর্দার, তার দলের লোক অনেক। সে যে কবে চীন ছেড়ে ভারতে হাজির হয়েছে এবং তার এই আসার উদ্দেশ্যই বা কি, পুলিশ এখনো তা জানতে পারে নি।

কিন্তু আমরা আন্দাজ করছি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গুপ্তধন।

পুলিশ আর একটা তথ্য সংগ্রহ করেছে। হোটেলে যে বুড়ো চীনেম্যানটা খুন হয়েছে, সেও নাকি আগে ছুন্-ছিউর দলে ছিল। বোধহয় লকেটটা কোন রকমে হাতিয়ে সে দল ছেড়ে সরে পড়ে এবং তারপর ভারতে আসে। তাকে অনুসরণ করে এসেছে ছুন্-ছিউ আর তার দলবল।

আমরা স্থির করেছি, ছুন্-ছিউ যদি প্রকাশ না করে, তাহলে আমরাও আদালতে লকেটের কথা জাহির করব না।

এখন পর্যন্ত ছুন্-ছিউ হাটে হাঁড়ি ভাঙে নি। কেবল এইটুকুই বলেছে, ঐ লকেটখানা সে এত পবিত্র বলে মনে করে যে, ওর জন্যে একশোটা নরহত্যা করতেও তার আপত্তি নেই।

তার এই লুকোচুরির মানে বোঝা যায়। ফাঁসী কাঠের ছায়ায় দাঁড়িয়েও সে আজ পর্যন্ত লকেটের আশা ছাড়তে পারে নি। তার বিশ্বাস, লকেটের লেখা ও তার মর্ম এখনো কারুর কাছে ধরা পড়ে নি।

বিচার যে-ভাবে চলছে তাতে বেশ বলা যায় ছুন্-ছিউর প্রাণদণ্ডই হবে।

এদিকে আমাদের থাকতে হয়েছে অতি সাবধানে। অনুমান করতে পেরেছি, ছুন্-ছিউ হাজতে বাস করছে বটে, কিন্তু তার দলের লোকেরা আমাদের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে ভোলে নি। কেননা আমাদের এ পাড়ায় চীনেম্যানদের আনাগোনা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। কেউ খেলনা, কেউ চেয়ার, কেউ কাপড়ের বস্তা বেচতে এসে আমার বাড়ির কড়া নাড়তে থাকে, কিছু কিনব না বললেও সহজে নড়তে চায় না। একদিন একটা ছিনেজোঁক চীনেম্যানকে তাড়াবার জন্যে বাঘাকে লেলিয়েও দিতে হয়েছিল! এই সব শুনে পুলিশ আমার বাড়ির দরজায় একজন পাহারাওয়ালা রাখবার ব্যবস্থা করেছে।

হঠাৎ বিনয়বাবু একদিন এলেন অদ্ভুত সংবাদ নিয়ে।

উত্তেজিত মুখে ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, 'ও হে, আজকের কাগজ পড়েছ?'

—'না।'

—'ছুন্-ছিউ হাজত থেকে পালিয়েছে!'

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'সে কি! কেমন করে?'

—'কাল আদালত থেকে তাকে হাজতে পাঠাবার জন্যে যখন নীচে নামিয়ে আনা হচ্ছিল, তখন হঠাৎ সে চোঁচা দৌড় মারে। প্রহরীরা পিছনে তাড়া করে। পথে অপেক্ষা করছিল খুব দ্রুতগামী একখানা বড় মোটর। সে লাফ মেরে তার উপরে গিয়ে ওঠে, আর গাড়ীখানা যেন হাওয়ার আগে উড়ে চলে যায়। পুলিশ তখনি অন্য গাড়িতে উঠে পিছনে অনুসরণ করে। খানিকক্ষণ এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ছোটাছুটির পর ছুন্-ছিউর গাড়িখানা ধরা পড়ে। তার মধ্যে দুটো চীনেম্যান ছিল, কিন্তু ছুন্-ছিউ ছিল না। সে কোন্ ফাঁকে কোথায় নেমে পড়ে পুলিশের চোখে বেমালুম ধুলো দিয়েছে!'

কুমার বললে, 'এতো ভারি বিপদের কথা!'

বিনয়বাবু বললেন, 'বিপদ? হুঁ, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা! ছুন্-ছিউ হয়তো আবার লকেট উদ্ধারের চেষ্টা করবে। সাবধান বিমল, সাবধান!'

আমি বললুম, 'ছুন্-ছিউর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সুযোগ হবে, এটাও অনুমান করতে পারছি।'

বিনয়বাবু বললেন, 'লকেটখানা পুলিশের হাতে সমর্পণ কর, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক্।'

'লকেটের কথা অস্বীকার করবার পর আর তা করা চলে না। আমাদের সামনে এখন খোলা আছে একমাত্র পথ।'

—'কি পথ?'

—'কাফ্রিস্থানে যাত্রা করবার পথ। ছুন্-ছিউকে আমরা প্রস্তুত হবার অবসর দেব না। কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ছুন্-ছিউ এসে দেখবে, খাঁচা খালি, পাখি নেই।'

কুমার উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'ঠিক, ঠিক! উত্তম প্রস্তাব।'

বিনয়বাবু বললেন, 'যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বটে। কিন্তু তুমি কি মনে কর বিমল, ছুন্-ছিউ কি আমাদের সঙ্গ নিতে পারবে না?'

জবাব দিতে যাব—হঠাৎ ঝন্-ঝন্ করে জানলার একখানা সার্সি ভেঙ্গে গেল এবং ঘরের মেঝের উপর সশব্দে এসে পড়ল একখণ্ড পাথর, তার সঙ্গে সূতো-দিয়ে-বাঁধা একখানা কাগজ!

সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি, কুমার ছুটে গিয়ে কাগজশুদ্ধ পাথরখানা কুড়িয়ে নিল। তারপর কাগজখানার দিকে চেয়েই বলে উঠল, 'বন্ধুবর ছুন্-ছিউর চিঠি।'

ইংরেজীতে লেখা :

—'এখনো লকেট ফিরিয়ে দাও। নইলে মৃত্যু অনিবার্য!'

—ছুন্‌-ছিউ

কুমার দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে বললে, 'না রাস্তায় কেউ কোথাও নেই। পাহারাওলা বললে, এখানে সে কোন চীনেম্যানকে দেখে নি।'

আমি বললুম, 'ছুন্‌-ছিউ এরি মধ্যে আবার জাল ফেলেছে! বেশ, আমরাও অপ্রস্তুত নই। কালই আমাদের যাত্রার দিন।'

রামহরি নিশ্চয় ঘরের বাহির থেকে সমস্ত শুনছিল। সে চীৎকার করে উঠল, 'হে মা কালী! হে মা দুর্গে! ও বাবা মহাদেব! খোকাবাবুর দিকে কৃপা-কটাক্ষে একটু নিরীক্ষণ করো!'

বোধ হয় রামহরির বিশ্বাস, খুব জোরে চেঁচিয়ে না ডাকলে সুদূর স্বর্গের দেবদেবীরা মানুষের প্রার্থনা শুনতে পান না!

পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আয়োজন করতে করতে কেটে গেল। এর মধ্যে শত্রুপক্ষ আর কোন সজাগতার লক্ষণ প্রকাশ করে নি। এমন কি পথের চীনে-জনতা পর্য্যন্ত একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বিনয়বাবু বললেন, 'এ হচ্ছে ঝড়ের আগেকার শান্তি!'

কমল বললে, 'ঝড় উঠলেই বজ্রনাদ করবার জন্যে আমাদের বন্দুকগুলো তৈরি আছে!'

বিনয়বাবু বললে, 'থামো ফাজিল ছোক্‌রা! এক ফোঁটা মুখে অত বড় বড় বুলি ভালো শোনায় না।'

সন্ধ্যার সময় স্টেশনে যাত্রা করা গেল। ফার্স্টক্লাস কামরা রিজার্ভ করেছি। মেল ট্রেন। পথে বা স্টেশনে একবারও সন্দেহ হল না যে, আমাদের গতিবিধি কেউ লক্ষ্য করেছে। স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে একখানাও মঙ্গোলীয় ছাঁচের হল্‌দে মুখ নজরে ঠেকল না। গাড়ির প্রত্যেক কামরায় উঁকি মেরে এসেছি। কোথাও সন্দেহজনক কিছুই নেই। আপাতত ছুন্‌-ছিউকে ফাঁকি দিতে পেরেছি ভেবে আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ঘণ্টা দিলে। ট্রেন ছাড়ল।

কুমার বললে, 'অজানার অভিমুখে আবার হল অভিযান শুরু! সুদূরের যাত্রী আমরা, অদৃষ্ট আমাদের জন্যে আবার কি নতুন উত্তেজনা সঞ্চয় করে রেখেছে, মনে মনে সেইটেই আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি।'

কমল 'আইস-ক্রিম' চুষতে চুষতে বললে, 'এবারে আমরা অদৃষ্টের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করব!'

বিনয়বাবু কট্‌মট্‌ করে তার দিকে তাকালেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করতে করতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লুম। জেগে রইল কেবল রামহরি। রেলগাড়িতে তার ঘুম হয় না।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, আচম্বিতে জেগে উঠেই অনুভব করলুম বিষম এক বেদনা। তারপরেই বুঝলুম, উপর থেকে ছিট্‌কে নীচে পড়ে গিয়েছি।

রামহরি, কুমার, কমল ও বিনয়বাবুর দেহও নীচে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে এবং বাঘা করছে প্রাণপণে চীৎকার!

হতভম্বের মতন উঠে বসেই আর এক সত্য উপলব্ধি করলুম। ট্রেন চলছে না—ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাইরের দৃশ্য বিলুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলুম বহুলোকের চীৎকার!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন—'অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাক্সিডেন্ট!'

রামহরি চ্যাঁচালে, 'হে মা কালী, হে বাবা মহাদেব!'

কুমার বললে, 'বিমল, বিমল, তোমার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে।'

আমি তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, ঝুপ-ঝাপ করে বৃষ্টি পড়ছে এবং গাড়ী যেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই আবছায়ার মধ্যে দেখা যায় একটা উঁচু পাহাড়।

দূরে গাড়ীর বাইরে ছুটোছুটি করছে কতকগুলো আলো—গোলমাল আসছে সেই দিক থেকেই।

তারপরেই কামরার পর কামরার দরজাগুলো দুমদাম করে খুলে রেলপথের ওপরে নেমে পড়তে লাগল দলে দলে যাত্রী!

ব্যাপার কি?

৬

বিপদগ্রস্ত পৈতৃক প্রাণ

এই অস্থানে কেন হঠাৎ গাড়ি থামল? আলো নিয়ে জলে ভিজেই-বা অত লোক কেন ছুটোছুটি করছে?

পৃথিবীকে সশব্দ করে অন্ধকার আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছিল হুড়্‌-হুড়্‌ এবং

কামরার জানালা দিয়ে বেরিয়ে-পড়া আলোক-রেখার মধ্যে এসে সেই ঝরা জল উঠছিল চক্-চক্ করে। কিন্তু দেখতে দেখতে বৃষ্টির তোড় এল কমে।

আমি তাড়াতাড়ি বর্ষাতি বার করে পরতে লাগলুম।

বিনয়বাবু শুধোলেন, 'বিমল, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ?'

—'হ্যাঁ, আপনারাও আসুন। কামরায় কেবল রামহরি থাক।' বলেই আমি রিভলভারটাও বার করে পকেটের ভিতরে রাখলুম।

—'ও কি, ওটা নিয়ে আবার কি হবে?'

—'সাবধানের মার নেই।'

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, 'বাঘা আমাদের সাজগোছ দেখে কি-রকম উত্তেজিত হয়েছে দেখ! ওকেও সঙ্গে নেব নাকি?'

—'নিতে চাও, নাও।'

সবাই সশস্ত্র হয়ে কামরা ছেড়ে বাইরে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন ট্রেনের প্রত্যেক কামরা থেকে ভীত যাত্রীরা বেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড জনতা সৃষ্টি করেছে। ট্রেনের অনেক কামরার ভিতর থেকে আর্তনাদ ও শিশুদের কান্নাও শোনা যাচ্ছে; অত্যন্ত আচমকা ট্রেনের গতি রুদ্ধ হওয়াতে হয়তো বহু লোক চোট খেয়েছে অল্পবিস্তর।

দূরের আলোকগুলো লক্ষ্য করে ভিড় ঠেলে আমরা দ্রুতপদে এগুতে লাগলুম। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম ট্রেনের ড্রাইভার, গার্ড ও আরো কয়েকজন কর্মচারী রেললাইনের উপরে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কি পরীক্ষা করছে।

সেই সময়ে এক সাহেব-যাত্রী এসে প্রশ্ন করাতে গার্ড বললে, 'কারা এখানে গাড়ি উল্টে দেবার চেষ্টা করেছিল। এই দেখুন, লাইনের দুখানা রেল একেবারে খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে! ভাগ্যে 'ড্রাইভার' সতর্ক ছিল, তাই 'ব্রেক' কষে কোনরকমে শেষমুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে ফেলতে পেরেছে!'

রেলপথের দিকে তাকিয়ে দেখে গা শিউরে উঠল! ট্রেন থেমে পড়েছে লাইনের ভাঙা অংশের মাত্র হাত-কয়েক আগে! চালক যদি দেখতে না পেত বা একটু অন্যমনস্ক থাকত, তাহলে এই শত শত পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুতে পরিপূর্ণ দ্রুতগামী মেল-ট্রেনের অবস্থা যে কি ভয়ানক হত, সেটা ভাবলেও স্তম্ভিত হয়ে যায় বুক!

অনেকে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে গিয়ে সাদরে ড্রাইভারের করমর্দন করে তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে ধন্যবাদের পাত্র! তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ না হলে এতক্ষণে হয়তো আমাদের সমস্ত সম্পর্ক লুপ্ত হয়ে যেত মাটির পৃথিবীর সঙ্গে। বেঁচে থাকলেও

হয়তো হাত বা পা হারিয়ে চিরজীবনের মতন পঙ্গু হয়ে দিন কাটাতুম—মৃত্যুর চেয়ে সে-অবস্থা ভয়ঙ্কর।

কুমার বললে, 'বিমল এ কাজ কার? এর মধ্যে ছুন্-ছিউর হাত নেই তো?'

গোলমালে ছুন্-ছিউর কথা ভুলে গিয়েছিলুম, কুমারের মুখে তার নাম শোনবামাত্র আমার সারা মন চমকে উঠল!

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, না, অসম্ভব!'

কুমার বললে, 'অসম্ভব কেন? সে যে আমাদের ভোলে নি, গত কালই তার প্রমাণ পেয়েছি! কে বলতে পারে, আমাদের গতিবিধির উপরে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে নি? হয়তো কাল যখন আমরা গাড়ি রিজার্ভ করতে স্টেশনে এসেছিলুম, তখনো তার চর ছিল আমাদের পিছনে পিছনে। টিকিট-ঘর থেকেই আমাদের গন্তব্যস্থানের খোঁজ নেওয়া কিছুই অসম্ভব নয়! হয়তো ছুন্-ছিউ ভেবেছিল, ট্রেন-দুর্ঘটনায় গাড়িশুদ্ধ লোক যখন হত বা আহত হবে, চারিদিকে যখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে, তখন সে সদলবলে সেই গোলে-হরিবোলে এসে আবার লকেটখানা উদ্ধার করবে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'তোমার আজগুবি কল্পনাকে সংযত কর! তুচ্ছ একখানা লকেটের লোভে ছুন্-ছিউর এতখানি বুকের পাটা কিছুতেই হতে পারে না।'

—'কেন হতে পারে না। ছুন্-ছিউ কত বড় গোঁয়ার, ভেবে দেখুন দেখি। কলকাতার জনতায় ভরা হোটেলে মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপে না, কলকাতার মতন শহরে দিনের বেলায় আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে সে পিছপাও হয় নি, কলকাতার পুলিশ-কোর্ট থেকে সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সে লম্বা দিয়েছিল—এমন সব দুঃসাহসের কাহিনী আর কখনো শুনেছেন? অদ্ভুত এই চীনে-দস্যু! আমার বিশ্বাস সে সব করতে পারে।

আমি এ তর্কে যোগ দিলুম না। আমি তখন ভাবছিলুম, ঘটনাস্থলে অদৃশ্য অপরাধী কোন চিহ্ন রেখে গেছে কিনা? বিজলী-মশালের আলো ফেলে রেলপথটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। সেখানে পাথর-ভাঙা নুড়িগুলোর উপরে কোন চিহ্নই নাই! উঁচু বাঁধের ঢালু গায়ে রয়েছে ঘাসের আগাছার আবরণ। সেখানেও কিছু পেলুম না। আঁধার রাত্রি তখনো টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি বর্ষণ করছিল—বাঁধের তলায় দেখলুম কর্দমাক্ত জমি! অপরাধীরা নিশ্চয়ই পাখি হয়ে উড়ে পালায় নি। বাঁধের এপাশে কি ওপাশে মাটির উপরে তাদের কোন চিহ্নই কি পাওয়া যাবে না? ভাবতে ভাবতে নীচে নামতে লাগলুম। বাঘা আমার অনুসরণ করলে। এ রকম কাজ পেলে সে ভারি খুশি হয়, ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সেইটেই বোধ করি আমাকে জানিয়ে দিতে চাইলে!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'ওকি হে, ওদিকে কোথায় নামছ? শেষটা সাপের কামড়ে মারা পড়বে?'

কোন জবাব দিলুম না। একেবারে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম। ঝির্-ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছে, গোঁ-গোঁ করে ঝড় ডাকছে, অন্ধকার ফুঁড়ে দূর অরণ্যের কোলাহল ভেসে আসছে। অদৃশ্য কালো মেঘকে দৃশ্যমান করে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে মাঝে মাঝে। খানিক তফাতে আঁধার-পটে আরো আঁধার-রং দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা ছোট বন, নীচের দিকে কালি-মাখা ঝোপ-ঝাপ, উপর দিকে টলোমলো গাছ—যেন কতকগুলো শিকলে-বাঁধা দানব মুক্তিলাভের চেষ্টায় ছট্‌ফট করছে।

বাঁধের তলাতেই পেলুম আমি যা খুঁজেছিলুম। কুমারকে ডাকতেই সে ছুটে নেমে এল।

সে বললে, 'এ যে অনেকগুলো লোকের পায়ের দাগ! দাগ দেখে মনে হচ্ছে লোকগুলো মাঠের দিকে গিয়েছে!''

বাঘা গম্ভীরভাবে সশব্দে মাটি শুঁকতে লাগল! তারপর চাপা-গলায় গর্জন করে বোধ করি পলাতক শত্রুদেরই ধমক দিলে।

বাঁধের উপর থেকে কৌতূহলী গার্ডও নেমে এসে বললে, 'বাবু, তোমরা কি করছ?'

আমি অঙ্গুলনির্দেশে মাটির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

গার্ড খানিকক্ষণ নীরবে দাগগুলো পরীক্ষা করে বললে, 'দেখছি টাট্‌কা পায়ের দাগ!'

বললুম, 'হ্যাঁ, এদের বয়স বেশিক্ষণ নয়। সেইজন্যেই মনে হচ্ছে এই দাগগুলো অপরাধীদেরই পায়ের। কারণ এমন দুর্যোগে এতগুলো লোক নিশ্চয়ই এখানে ফুর্তি করে হাওয়া খেতে আসে নি।'

গার্ড বললে, 'বাবু, ঐ কুকুরটা মাটির ওপরে কি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে!'

—'পায়ের চিহ্নর ভিতরে ও শত্রুদের গন্ধ আবিষ্কার করেছে।'

গার্ড বিস্মিত স্বরে বললে, 'ওটা তো দেখছি দেশি কুকুর, ও আবার পায়ের দাগের কি মর্ম বুঝবে?'

কুমার বললে, 'যত্ন আর শিক্ষা পেলে আমাদের দেশী কুকুর তোমাদের বিলিতী হাউন্ডের চেয়ে কম কাজ করে না। বাঘা শত্রুদের গন্ধ চেনে।'

বাঘার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও রেলপথের তারের বেড়া পার হয়ে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল আরো অনেক কৌতূহলী লোক—তাদের ভিতরে সাহেব আছে, বাঙালী আছে, হিন্দুস্থানী আছে।

খানিক পরে একটা ঝোপ। গার্ডকে ডেকে বললুম, 'এইবার দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ!'

—'কি দেখব?'

—'খানিক আগে মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ছিল বলে পায়ের ছাঁচগুলো ছিল জলে ভর্তি! কিন্তু এখানকার পায়ের ছাঁচ ভিজে হলেও জলে ভর্তি নয়।

—'তাতে কি বোঝায়?'

এই বোঝায় যে অপরাধীরা একটু আগেই ঝোপের আড়ালে ছিল দাঁড়িয়ে। বোধ হয় অপেক্ষা করেছিল ট্রেনখানা ওল্টাবার জন্যে। কিন্তু ট্রেন রক্ষা পেয়েছে আর আমরা আসছি দেখে তারা চটপট সরে পড়েছে।

—'বাবু, তোমার যুক্তি বুঝলুম না।'

—'মুষল-ধারার পর যখন টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হয় অপরাধীরা তখনই এখান থেকে পালিয়েছে। তাই এখান থেকে যে-সব পায়ের ছাপ শুরু হয়েছে তাদের ভিতরটা এখনও জলে পূর্ণ হবার সময় পায় নি।

গার্ড বললে, 'বাবু, তুমি কি পুলিশে কাজ কর?'

—'না।'

—'তবে তুমি এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি পেলে কেমন করে?'

—'ভগবান দিয়েছেন বলে। ভগবান সবাইকে চক্ষু দেন বটে, কিন্তু সকলকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেন না।'

গার্ড বললে, 'ঠিক বাবু, তোমার কথা আমি স্বীকার করি! পায়ের দাগগুলো আমিও দেখেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। অথচ এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এটুকু আমার অনায়াসেই বোঝা উচিত ছিল।......বাবু, তুমি আর কিছু বুঝতে পেরেছ?'

—'এখান থেকে প্রায় দুশো গজ তফাতে একটা জঙ্গলের আবছায়া দেখা যাচ্ছে। পায়ের দাগগুলো ঐদিকেই গিয়েছে। অপরাধীরা নিশ্চয় ঐ জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে আছে।'

গার্ড বললে, 'না, এখন আমাদের ফিরতে হবে!'

—'কেন?'

—'আমার উপরে রয়েছে অপরাধী গ্রেপ্তার করার চেয়েও বড় কর্তব্যের ভার। রেল-লাইন ভেঙেছে, এই খবর দেবার জন্যে আমাকে এখন গাড়ী নিয়ে পিছনের ষ্টেশনে ফিরে যেতে হবে! নইলে কোন ডাউন-ট্রেন এসে পড়লে বিষম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, আর সেজন্যে দায়ী হব আমিই।'

গার্ডের কথা সত্য। তার উপরে আমরা ঠিক প্রস্তুত হয়েও আসি নি, সঙ্গে

যে লোকেরা রয়েছে তারা হয়তো এই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে ঐ অচেনা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ভরসা করবে না। আর এমন রাতে অপরাধীদের খুঁজতে যাওয়াও হবে হয়তো বুনো হাঁসের পিছনে এলোমেলো ছুটোছুটি করার মতন। খুব সম্ভব তাদের খুঁজে পাব না, আর খুঁজে পেলেও ছুন্-ছিউ ও তার দলবলকে গ্রেপ্তার করা বড় চারটিখানিক কথা নয়! হয়তো তারা দলে ভারী আর সশস্ত্র।

বিনয়বাবু বললেন, 'ওহে বাপু বিমল! চুপ করে ভাবছ কি? গোঁয়ার্তুমি করবার ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?'

আমি হেসে বললুম, 'মোটেই নয়! গার্ড-সাহেবের পিছু পিছু আমিও পলায়ন করতে চাই!'

কুমার বললে, 'যঃ পলায়তি স জীবতি! সেকালে কোন বুদ্ধিমান বাঙালীও বলে গেছেন, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমরা হচ্ছি পিতৃভক্ত পুত্র, বাপের নাম করবার সুযোগ পাব বলেই পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করা দরকার।'

আমি বললুম, 'কিন্তু কুমার, বাঘা বোধহয় পশু বলেই পৈতৃক প্রাণের মর্যাদা বোঝে না। ঐ দেখ, সে আবার বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!'

বাঘা খালি এগুচ্ছে না, উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ চীৎকারও করছে। তার ওরকম চীৎকারের অর্থ আমরা বুঝি। মানুষের পক্ষে অসাধারণ বাঘার পশু-দৃষ্টি তিমির-যবনিকা ভেদ করে নিশ্চয়ই কোন শত্রু আবিষ্কার করেছে।

বাঘা ফিরতে রাজি নয় দেখে কুমার দৌড়ে গিয়ে তার বগ্‌লোস্ চেপে ধরলে। কিন্তু তবু সে বাগ্ মানতে চাইলে না—বার বার জঙ্গলের দিকে ফিরে ফিরে দেখে আর কুমারের হাত ছাড়াবার জন্যে টানা-হ্যাঁচড়া করে। তার ক্রুদ্ধ চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মতন।

ওদিকে তাকিয়ে আমি কিন্তু খালি দেখলুম, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-বাহু আকাশে আন্দোলিত করে জঙ্গল করছে মর্মর-হাহাকার। তবে এ সন্দেহটা বারংবারই মনের মধ্যে জাগতে লাগল যে, ঐ অন্ধকার-কেল্লার ভিতরে যারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা একটুও অচেতন নয়—ঝোপঝাপের ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়ে আছে তাদের হিংস্র চক্ষুগুলো।

গার্ড বললে, 'আর দেরি নয়, সবাই ফিরে চল!'

কমল আফ্‌শোষ করে বললে, 'হায় রে হায়, একটা নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চার একেবারেই মাঠে মারা গেল!'

খাপ্পা হয়ে বিনয়বাবু বললেন, 'চুপ, চুপ! একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ!'

হঠাৎ বাঘা জঙ্গলের দিকে চেয়ে একেবারে যেন হন্যে হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কুমার আর তাকে ধরে রাখতে পারে না!

গার্ড আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কুকুরটা হঠাৎ এমন করছে কেন?'

তার প্রশ্নের উত্তর এলো জঙ্গলের দিক থেকে। আচম্বিতে অন্ধ রাত্রিকে কাঁপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম করে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল—চোখের উপরে জ্বলেই নিবে গেল দুটো বিদ্যুতের চমক!

যে কৌতূহলী যাত্রীগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিল, তারা সভয়ে প্রাণপণে দৌড় মারলে রেলপথের দিকে, আমাদের চারজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল খালি গার্ড ও একজন সাহেব।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ঐ ঝোপের আড়ালে চল—ঝোপের আড়ালে চল!'

ঝোপের পাশে গিয়ে গার্ড উত্তেজিত স্বরে বললে, 'বাবু, বাবু, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়?'

কুমার বললে, 'করতে চায় কি, আক্রমণ করেছে! ঐ দেখ, জঙ্গলের দিক থেকে কতগুলো সাদা কাপড় পরা মূর্তি ছুটে আসছে!'

আমি রিভলভার বার করে বললুম, 'দেখছেন বিনয়বাবু, সঙ্গে কেন অস্ত্র আনতে বলেছিলুম?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'ভাই বিমল, আমাদের পৈতৃক প্রাণগুলো এ-যাত্রা শনির দৃষ্টি বুঝি আর এড়াতে পারলে না।'

৭

রামহরির ধূলিশয্যা

একটা ঝোড়ো দম্‌কা হাওয়া আচমকা জেগে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে টলোমলো গাছপালাগুলো কেঁদে উঠল আরো বেশি উচ্চস্বরে। তারপরেই আবার এল ঝেঁকে বৃষ্টি! গড়্‌-গড়্‌ গড়্‌-গড়্‌ বাজের ধমক—চক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ বিদ্যুৎ-চমক!

একে মেঘে কাজল-মাখা রাতের অন্ধকার, তার উপরে সেই ঘন বৃষ্টিধারার পর্দা। চোখ আর এদের ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারল না। শত্রুরাও নিশ্চয় এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।

যে সাহেবটা শত্রুদের বন্দুকের ভয়ে পালায় নি সে বললে, 'বাবু, এখন আমাদের কর্তব্য কি?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কি নিরস্ত্র?'

—'না, আমার কাছে রিভলভার আছে।'

—'তাহলে এই ঝোপের আড়ালে আমাদের মতন হাঁটু গেড়ে বসে পড়! শত্রুদের আমাদের রিভলভারের নাগালের ভেতরে আসতে দাও। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমরা নিতান্ত অসহায় নই।'

গার্ড বললে, 'কিন্তু শত্রুদের কারুকেই তো দেখা যাচ্ছে না! তারা—'

তার মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই আবার শোনা গেল দুটো বন্দুকের শব্দ! কিন্তু সে হচ্ছে লক্ষ্যহীনের বন্দুক, গুলি যে কোন্ দিকে ছুটল আমরা তা টেরও পেলুম না।

কুমার বললে, 'বন্দুকের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে! ওরা বন্দুক ছুঁড়ছে আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'এই সুযোগে দৌড়ে আমাদের গাড়ির দিকে যাওয়া উচিত।'

কুমার বললে, 'পিছনে সশস্ত্র শত্রু নিয়ে গাড়ির দিকে দৌড়োতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

অন্ধকার বিদীর্ণ করে আকাশের বুকে জ্বলে উঠল একটা সুদীর্ঘ বিদ্যুৎ এবং তারই আলোকে দেখা গেল, খানিক তফাতে একদল লোক দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে!

গার্ড ত্রস্ত স্বরে বললে, 'ওরা ট্রেনের দিকে যাচ্ছে—ওরা ট্রেনের দিকে যাচ্ছে! ওরা ভেবেছে আমরা আর এখানে নেই!'

বিনয়বাবু বললেন, 'কি সর্বনাশ! ওরা কি ট্রেন আক্রমণ করতে চায়?'

কুমার বললে, 'বিমল, বিমল! ওদের দেখা যাচ্ছে! ওদের নাগালের মধ্যে পেয়েছি!'

আমি বললুম, 'ছোঁড়ো রিভলভার!'

প্রায় একসঙ্গে আমাদের পাঁচটা রিভলভার গর্জন করে উঠল—এবং পরমুহূর্তেই জাগল একটা বিকট আর্তনাদ!

আবার ডাকল বাজ—আবার জ্বলল বিদ্যুৎ-শিখা! এবং আবার গর্জন করলে আমাদের রিভলভারগুলো!

কমল চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরা পালাচ্ছে—ওরা পালাচ্ছে!'

আমি বললুম, 'আবার ছোঁড়ো রিভলভার!'

আমাদের পাঁচটা রিভলভার আর একবার চীৎকার করে উঠল।

রাত্রের শরীরী অভিশাপের মতন অস্পষ্ট মূর্তিগুলো আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকার ও বৃষ্টিধারার অন্তঃপুরে।

বাঘার উৎসাহিত গর্জনে কান পাতা দায়! ভাগ্যে কুমার তাকে সজোরে

নিজের দুই হাঁটুর ভিতরে চেপে, বাঁ-হাতে তার বগ্‌লোস্ টেনে ধরেছিল, নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে শত্রুদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত!

কমল আহ্লাদে নৃত্য করতে করতে বললে, 'জয়, আমাদের জয়! বৎসগণ! ভেবেছিল ফাঁকতালে করবে কেল্লা ফতে! হুঁ হুঁ, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ তো দেখ নি!'

তখনি কমলের একখানা হাত ধরে বিনয়বাবু তার নৃত্যোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিলেন।

আমি বললুম, 'এই হচ্ছে সরে পড়বার সুযোগ! ছোটো সবাই ট্রেনের দিকে!'

অন্ধকার আর বৃষ্টিধারা কেবল শত্রুদেরও ঢেকে রাখে নি, তাদের আশ্রয় পেয়ে আমরাও নিরাপদে ট্রেনের কাছে গিয়ে পড়লুম।

যাত্রীরা কেউ বাইরে ছিল না। বন্দুক আর রিভলভারের শব্দ লুপ্ত করে দিয়েছে তাদের সমস্ত কৌতূহল। প্রত্যেক কামরার দরজা ও খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিয়ে তারা হয়তো তখন ইষ্টদেবতর নাম জপ করছিল।

আমাদের সঙ্গের সাহেব বললে, 'ইন্ডিয়া কী ক্রমে আমেরিকা হয়ে উঠল? সশস্ত্র ডাকাত এসে ট্রেন আক্রমণ করে, এদেশে এমন কথা কে কবে শুনেছে?'

গার্ড বললে, 'কামরায় গিয়ে ও-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো! ইঞ্জিন এখনি গাড়িকে পিছনের স্টেশনে নিয়ে যাবে।' বলেই সে দ্রুতপদে চলে গেল।

এমন সময়ে হঠাৎ উপরি-উপরি আরো কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল এবং কাঠ-ফাটা শব্দ শুনে বুঝলুম, একটা গুলি ট্রেনের কোন কামরার গায়ে এসে লাগল।

ডাকাতরা কি আমাদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে? তারা কি আবার আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?

অন্য ক্ষেত্র হলে আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে আবার তাদের উচিতমতন অভ্যর্থনা করতুম। কামরার ভিতরেই আছে আমাদের 'অটোমেটিক' বন্দুকগুলো। তাদের প্রত্যেকটা মিনিটে পঁয়ত্রিশটা গুলি বৃষ্টি করতে পারে। সেগুলো হাতে থাকলে আমরা পাঁচজনে দুইশত শত্রুকেও বাধা দিতে পারি।

কিন্তু সে সময় পেলুম না। দূর থেকে বেজে উঠল গার্ডের বাঁশী—গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই! 'টর্চে'র আলো ফেলে তাড়াতাড়ি আমাদের কামরা আবিষ্কার করতে বাধ্য হলুম। কোনরকমে গাড়িতে উঠে পড়বার সময় মাত্র পেলুম।

গাড়ি ছাড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই মাঠের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা কোলাহল। সে হচ্ছে মুখের গ্রাস পালিয়ে গেল দেখে ডাকাতদের হতাশার চীৎকার! হতভাগারা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েছিল, সমস্তই ব্যর্থ হল।

ট্রেন পিছু হেঁটে চলেছে—তার গতি খুব দ্রুত নয়। আমাদের কামরার ভিতরেও ঘুট্-ঘুট্ করছে অন্ধকার।

কুমার বললে, 'ছি রামহরি, ছিঃ! তুমিও ভয়ে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ইঁদুরের মতন লুকিয়ে আছ!'

রামহরি কেমন যেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'মোটেই নয় কুমারবাবু, মোটেই নয়। একবার আলো জ্বেলে দেখ না!'

কমল আলো জ্বাললে।

বিপুল বিস্ময়ে দেখলুম, কামরার মেঝের উপরে শুয়ে রয়েছে রামহরি, তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা!

বিস্ফারিত চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'রামহরি, এ কি ব্যাপার!'

ম্লান হাসি হেসে রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, কামরা থেকে তোমরা বেরিয়ে যাবার পর আমি জানালায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। ওদিকের জানালা দিয়ে জন-তিনেক লোক কখন যে নিঃশব্দে কামরার ভেতর ঢুকেছিল, আমি একটুও টের পাই নি। আমার অজান্তেই তারা আমাকে আক্রমণ করলে, আমি কোনরকম বাধা দেবার ফাঁক পর্যন্ত পেলুম না।'

—'কে তারা? চীনেম্যান?'

—'না, পশ্চিমের লোক, হিন্দুস্থানী।'

—'তারপর?'

—'একটা লোক ছোরা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'চ্যাঁচালেই মরবি!' আর দুটো লোক আমাদের মোটঘাট, 'সুট্‌কেশ'গুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল।'

ফিরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম, আমদের অধিকাংশ মোটই মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। প্রত্যেক 'সুটকেশে'র তালা খোলা।

রামহরি বললে, 'ভয় নেই তোমাদের, তারা কিছু নিয়ে যায় নি! তাদের ভাব দেখে মনে হল, তারা যেন কোন বিশেষ জিনিসেরই সন্ধান করছে!'

কুমার বললে, 'তবে কি তারা সাধারণ চোর নয়? তারা কি সেই ধুক্‌ধুকিখানার লোভেই কামরার ভিতরে ঢুকেছিল?'

বিনয়বাবু বললেন, 'ধুক্‌ধুকিখানা তো চীনেম্যানদের সম্পত্তি! আর রামহরি বলছে যারা এসেছিল তারা হচ্ছে হিন্দুস্থানী।'

আমি রামহরির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বললুম, 'বিনয়বাবু, এই চীনে ডাকাতেরা বড় সহজ লোক নয়। তারা বেশ জানে, ভারতে এসে কাজ হাসিল করতে গেলে এদেশী লোকের সাহায্য না নিলে চলবে না। কারণ কোন ছদ্মবেশেই চীনেদের মঙ্গোলীয় ছাঁচ ঢাকতে পারবে না, ভারতীয় জনতার মধ্যে তাদের দেখলেই সকলে চিনে ফেলবে। কাজেই তারা এদেশী গুণ্ডাদেরও সাহায্য

নিয়েছে। তাদের দলের লোক নিশ্চয়ই ট্রেনের মধ্যে ছিল, আমরা কামরা ছাড়বার পরেই সুযোগ পেয়ে এসেছিল রামহরির সঙ্গে আলাপ করতে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এবার থেকে আমাদের দেশী-বিদেশী দু-রকম শত্রুর সঙ্গেই যুঝতে হবে? ব্যাপারটা ক্রমেই সঙীন্ হয়ে উঠছে যে!'

কুমার বললে, 'উঠুক—আমরা থোড়াই কেয়ার করি! কিন্তু রামহরি, তোমার গল্পের শেষটা এখনো তো শোনা হয় নি।'

রামহরি উঠে বসে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'গল্পটা আরো কিছু বড় হতে পারত, কিন্তু শেষ হবার আগেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল তোমাদের জন্যেই।'

আমি বললুম, 'আমাদের জন্যেই?'

—'হ্যাঁ গো খোকাবাবু, হ্যাঁ। কামরার আলো নিবিয়ে 'টর্চে'র আলোয় তারা একমনে খোঁজাখুঁজি করছে, এমন সময়ে বাইরে থেকে এল তোমাদের সাড়া। গার্ডের বাঁশীও শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে কামরার ভিতর থেকেও তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। আর আমার কথাও ফুরুলো।'

বিনয়বাবু বললেন, 'ধুক্‌ধুকিখানা তারা খুঁজে পায় নি তো?'

আমি হাসতে হাসতে নীচু-গলায় বললুম, 'ধুক্‌ধুকিখানা আছে কলকাতায়।'

বিনয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কি?'

—'ধুক্‌ধুকিখানা একেবারেই বাজে। আসল দরকার তার ভিতরের লেখাটুকু। আমি আর কুমার সেটুকু মুখস্থ করে রেখেছি।

কমল খুশি হয়ে বলে উঠল, 'বাহবা কি বাহবা। ধুক্‌ধুকির লেখা পড়তে হলে ছুন্-ছিউকে এখন বিমলদা আর কুমারদার মনের ভিতরে ঢুকতে হবে!'

আরো খানিকক্ষণ পরে ট্রেন এসে স্টেশনে ঢুকে বিষম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। চারিদিকে মহা হৈ-চৈ, লোকজনের ছুটোছুটি!

রামহরিকে নিয়ে আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। গার্ড আর পুলিশের সঙ্গে ট্রেনের প্রত্যেক কামরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলুম, কিন্তু রামহরি সেই তিনজন লোককে কোথাও আবিষ্কার করতে পারলে না। নিশ্চয়ই তারা মাঠের মধ্যে নেমে গিয়েছে।

সকাল-বেলায় একদল পুলিশের লোক ঘটনাস্থলে গেল খানাতল্লাশ করবার জন্যে। কিন্তু মাঠ, জঙ্গল ও আশেপাশের গ্রাম খুঁজে অপরাধীদের কারুকেই পেলে না। আমার বিশ্বাস তারা কোন পাহাড়ে উঠে আত্মগোপন করে আছে।

যথাসময়ে লাইন মেরামত হল। ট্রেন আবার ছাড়ল। দিন-রাত যক্ষপতির

রত্নপুরীর সমুজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা ক্রমেই এগিয়ে চললুম, ভারতের উত্তর-সীমান্তের দিকে।

ভারতের উত্তর-সীমান্ত আমার মনে চিরদিনই জাগিয়ে তোলে বিচিত্র উত্তেজনা! আফগানিস্থান যখন হিন্দুস্থানেরই এক অংশ, তখন সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সেখানে হয়েছে কত না অদ্ভুত নাটকের অভিনয়! শক, তাতার, হুন্, মোগল, চীন, পারসী ও গ্রীক প্রভৃতি জাতির পর জাতি এই পথ দিয়েই মূর্তিমান ধ্বংসের মতন ছুটে এসেছে সোনার ভারত লুণ্ঠন করবার জন্যে। দেশরক্ষার জন্যে যুগে যুগে ভারতের কত লক্ষ লক্ষ বীর ঢেলেছে সেখানে বুকের রক্তধারা! ওখানকার আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের শিখরে শিখরে আজ বাতাসে বাতাসে যে অশ্রান্ত গান জেগে উঠে, সে হচ্ছে এই প্রাচীন ভারতেরই অতীত গৌরব-গাথা। ঐতিহাসিক ভারতের সর্বপ্রথম সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত ঐ পথ দিয়েই ভারতের শত্রু গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর্যাবর্তের বাহিরে। যে পার্বত্য জাতির প্রচণ্ড রণোন্মাদ পৃথিবীজয়ী আলেকজাণ্ডারকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তাদের সুযোগ্য বংশধররা আজও বর্তমান আছে। এই বিংশ শতাব্দীর উড়োজাহাজ আর কলের কামানও তাদের যুদ্ধোন্মাদ শান্ত বা তাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারে নি। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ-সিংহ আজও সেখানে ঘুমোবার অবসর পায় না। আজকের ভারতে যারা সত্যিকার 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' খুঁজে বেড়ায়, ভারতের উত্তর-সীমান্ত পূর্ণ করতে পারে তাদের মনের প্রার্থনা।

বিনয়বাবুর মুখে শুনলুম, আফগানিস্থানের মধ্যে কাফ্রিস্থান হচ্ছে এক রহস্যময়, অদ্ভুত দেশ। ওখানকার লোকজন, আচার-ব্যবহার সমস্তই নতুন-রকম। আমাদের যক্ষপতির ঐশ্বর্য আছে ঐ কাফ্রিস্থানেই। ঐখানেই উঠবে পরের দৃশ্যের যবনিকা।

৮

কাফ্রিস্থানের কথা

মালাকান্দ্ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে আগে পড়লুম সোয়াট্, তারপর ডির মুল্লুকে; তারপর উঠলুম লোয়ারি গিরিসঙ্কটের (দশ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু) উপরে এবং তারপরে পৌঁছুলুম চিত্রল রাজ্যে।

এ-সব জায়গার বেশি বর্ণনা দেবার দরকার নেই, কারণ আমাদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে কাফ্রিস্থান। তবে অল্প দু-চার কথা বললে মন্দ হবে না।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে অপূর্ব, সে কথা বলা বাহুল্য। আমাদের মতন সমতল দেশের বাসিন্দাদের চোখ আর মন এই অসমোচ্চ পর্বত-সাম্রাজ্যে এসে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। নানা আকারের শৈলমালার এমন বিচিত্র উৎসব আমি আর কখনো দেখি নি। এই চিত্রল যে কি-রকম বন্ধুর দেশ, একটা কথা বললেই সকলে সেটা বুঝতে পারবেন। এ অঞ্চলে মোটঘাট স্থানান্তরিত করবার জন্য কেউ মালগাড়ি ব্যবহার করে না, কারণ তা অসম্ভব। চিত্রলীদের অভিধানে নাকি গাড়ির চাকা বোঝায় এমন কোন শব্দই নেই। তবে চিত্রলের শাসনকর্তার (Mehtar) দৌলতে আজকাল ওখানে খানকয় মোটরের আবির্ভাব হয়েছে বটে।

এ হচ্ছে কেবল পনের-যোল-সতের হাজার ফুট উঁচু আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের দেশ—খালি চড়াই আর উৎরাই, খাদ আর উপত্যকা, শৈলশিখরের পর শৈলশিখরের নিস্পন্দ তরঙ্গ! দূরে দূরে দেখা যায় আরো উঁচু শৈলমালার উপরে চিরতুষারের শুভ্র সমারোহ। আমাদের একমাত্র সহায় এদেশী পনি-ঘোড়া—অতি ভয়াবহ, উঁচু-নীচু সংকীর্ণ পথেও এ-সব ঘোড়ার পা একবারও পিছলোয় না—কিন্তু একবার পিছলোলে আর রক্ষা নেই, কারণ পরমুহূর্তে তোমাকে নেমে যেতে হবে হাজার হাজার ফুট নীচে কোথায় কোন অতলে। ইহলোক থেকে একেবারে পরলোকে।

একদিন দুপুর-বেলায় নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে চলেছি, নির্মেঘ আকাশ পরিপূর্ণ রৌদ্রে ঝল্‌মল্‌ করছে, আচম্বিতে দূরে জাগলে ঘনঘোর মেঘগর্জন!

আমার বিস্মিত মুখের পানে তাকিয়ে গাইড হাসতে হাসতে বললে, 'বাবুজী, ও মেঘের ডাক নয়।'

—'তবে?'

—'পাহাড় ভেঙে পড়ছে।'

—'এদেশে প্রায়ই পাহাড় ভেড়ে পড়ে নাকি?'

—'প্রায়ই। লোকজন হামেশাই মারা পড়ে। সময়ে সময়ে গ্রাম-কে-গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়।'

এই হিংস্র পাহাড়ের দেশে মানুষদেরও প্রকৃতি রীতিমত বন্য। আমরা যে সোয়াট ও ডির দেশ পিছনে ফেলে এসেছি, সেখানকার মুসলমানদের ধর্মোন্মাদ ভয়ঙ্কর। বিধর্মীদের হত্যা করা বলতে তারা বোঝে, স্বর্গে যাবার রাস্তা সাফ করা।

সোয়াট আর ডির দেশের মধ্যে মারামারি হানাহানি লেগেই আছে। লড়তে, মারতে ও মরতে তারা ভালোবাসে—রক্ত ও মৃত্যু যেন তাদের প্রিয় বন্ধু!

একদিন যেতে যেতে দেখি এক জায়গায় দুই দল করছে মারামারি। বন্দুক

গর্জন করছে, বন্-বন্ লাঠি ঘুরছে আর ঝক্মক্ জ্বলছে তরবারি! দস্তুরমতন যুদ্ধ। মাটিতে পড়ে কয়েকটা আহত দেহ ছট্ফট্ করছে এবং কয়েকটা দেহ একেবারে নিস্পন্দন—অর্থাৎ এ-জীবনে তারা আর নড়বে না।

কিন্তু ওদের কেউ তখন বিধর্মী বধ করে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্যে আগ্রহ দেখালে না, বরং আমাদের দেখে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের গাইড ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ছুটে এসে বললে, 'বাবুজী, জলদি এখান থেকে চলে আসুন। পাছে আমরা জখম হই, তাই ওরা লড়াই করতে পারছে না।'

মনে মনে ওদের সুবুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম। তারপর রাস্তার মোড় ফিরে একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে হৈ-চৈ শুনেই বুঝলুম, ওদের যুদ্ধ আবার আরম্ভ হয়েছে!

কুমার বললে, 'এরা লড়াই করছে কেন?'

গাইড বললে, 'এক পয়সার পেঁয়াজের জন্যে!'

চিত্রলের পরেই হচ্ছে কাফ্রিস্থান। এদেশটি এখন আফগানিস্থানের আমীরের শাসনাধীন হয়ে মুসলমান-প্রধান হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু এখানকার মুসলমানরা খুব বেশি গোঁড়াও নয়, তাদের আচার-ব্যবহারও একেবারে অন্যরকম। কিন্তু এখনো এদেশে পুরানো কাফ্রিদের এমন এক সম্প্রদায় বাস করে, যারা পৈতৃক রীতিনীতি ও পৌত্তলিকতা বর্জন করে নি। নানান দেবতার কাঠের মূর্তি গড়ে তারা পূজা করে এবং তাদের প্রধান প্রধান দেবতার নাম হচ্ছে : ইম্র, মণি, গিষ, বাগিষ্ট, আরম, সান্রু, সাতারাম বা সুদারাম। ওঁরা হচ্ছেন পুরুষ-দেবতা। দেবীদের নাম দিয়েছে ওরা সঞ্জীরক্তী, দিজোন, নির্মলী ও সুমাই প্রভৃতি। অনুমানে বেশ বোঝা যায়, এদের দেব-দেবী হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীরই রূপান্তর।

'কাফ্রিস্থান' বলতে বুঝায় কাফির অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের দেশ। বলা বাহুল্য, এ নামটি মুসলমানদের দেওয়া। হিন্দুদের পরে এক সময়ে এখানে ছিল চীনদের প্রভুত্ব। তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। আমাদের চোখের সামনে নাচছে যে গুপ্তধনের স্বপ্ন, তারও মালিক ছিলেন এক চীনা রাজপুত্র। সেই গুপ্তধন আছে এক বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। সুতরাং এ অঞ্চলে আগে বৌদ্ধদেরও প্রাধান্য ছিল। তারপর মুসলমানরা বারে বারে আক্রমণ করেছিল কাফ্রিস্থানকে। চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লং প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীরাও নাকি এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কারুর প্রাধান্যই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিজের চারিদিকে মুসলমান প্রতিবেশী নিয়েও গত শতাব্দী পর্যন্ত কাফ্রিস্থান আপন স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পেরেছিল।

কাফিররা দেখতে সুন্দর। তাদের গায়ের রং প্রায় গৌর, দেহ লম্বা, মুখ

চওড়া, চোখ গ্রীকদের মতন। শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা বলে তারা স্নান করতে একেবারেই নারাজ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে তাদের চেহারা যে আরো চমৎকার হত, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই!

কি মুসলমান ও কি পৌত্তলিক কাফির প্রত্যেকেই পরিবারের কেউ মারা পড়লে, গাঁয়ের প্রান্তে নির্দিষ্ট এক ঢালু পাহাড়ের গায়ে উঠে চার পায়াওয়ালা বড় সিন্দুকের ভিতরে মৃতদেহ রেখে আসে। তারা শবদেহ গোর দেয় না। এক একটি পারিবারিক সিন্দুকের ভিতরে পরে পরে দুটো, তিনটে বা চারটে মৃতদেহও রাখা হয়।

কাফিররা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্যন্ত নাচের ভক্ত। সামাজিক বা ধর্মসংক্রান্ত যে কোন অনুষ্ঠানে তারা নাচের আসর বসায় এবং মেয়ে ও পুরুষরা একসঙ্গে দল বেঁধে সারা রাত ধরে নাচের আমোদে মেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে গান ও দামামা। অনেকে দুই আঙুল মুখে পুরে শিস দেয়। পরীদের উপরে এদের অগাধ বিশ্বাস। নাচতে নাচতে কেউ কেউ পরী দেখে দশা পায়। তখন তারা নাকি ভাববাণী বা ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারে! সবাই তাদের কাছে গিয়ে আগ্রহ-ভরে এইরকম সব প্রশ্ন করে—'এবার কি-রকম ফসল হবে?'—'এ বছরে গাঁয়ে মড়ক হবে কিনা?'—'আমার খোকা হবে না খুকী হবে?'

পৌত্তলিক কাফিররা মুসলমানদের বিষম শত্রু। এর কারণ বোঝাও কঠিন নয়। মুসলমানরা—অর্থাৎ আফগান প্রভৃতি জাতের লোকেরা চিরদিনই তাদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করে এসেছে, কাফিররাও তাই সুযোগ পেলেই ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের হত্যা করে! কেউ লুকিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত মুসলমানকে বধ করতে পারলে কাফির-সমাজে বীর বলে গণ্য হয়! তাদের মাথার পাগড়িতে গোঁজা পালকের সংখ্যা দেখেই বলে দেওয়া যায়, কে কয়জন মুসলমানকে হত্যা করেছে! আমরা যখন কাফ্রিস্থানে গিয়েছিলুম তখনই এ-শ্রেণীর মুসলমান-বিদ্বেষী কাফিররা দলে যথেষ্ট হালকা হয়ে পড়েছিল। আজ তাদের সংখ্যা বোধহয় নগণ্য, কারণ ওদেশে মুসলমান ধর্মের প্রভুত্ব বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

কাফিরদের প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় মৃত ব্যক্তিদের অশ্বারোহী কাঠের প্রতিমূর্তি দেখা যায়। পৌত্তলিক হোক্, মুসলমান হোক্, পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা প্রত্যেক কাফিরই কর্তব্য বলে মনে করে। যার যেমন সঙ্গতি, সে তত-বড় মূর্তি গড়ায়। কিন্তু এ-সব হচ্ছে নামেই প্রতিমূর্তি, কারণ দেখতে সব মূর্তিই অবিকল একরকম!

কাফিররা মাছ খায় না—মাছে তাদের ভীষণ ঘৃণা। ব্যাং বা টিক্‌টিকি খেতে

বললে আমাদের অবস্থা যে-রকম হয়, মাছ খেতে বললে তারাও সেইরকম ভাব প্রকাশ করে। কাফিররা মুর্গীর মাংসও অপবিত্র মনে করে—কারণ তা মুসলমানদের খাদ্য এবং কাফির নারীদের পক্ষে পুরুষ-জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ!

কাফিররা পরী মানে এবং কাফ্রিস্থানকে সত্যসত্যই পরীস্থান বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দৃষ্টিসীমা জুড়ে দূরে বিরাজ করছে ২৫,৪২৬ ফুট উঁচু টেরিচ্-মির পর্বত, বিরাট দেহ তার চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা এবং তার শিখর উঠেছে মেঘরাজ্য ভেদ করে। নীচেও সর্বত্রই অচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-প্রহরীর দল। এখন শীতকাল নয়, নইলে এ-সব পাহাড়ও পরত তুষার-পোষাক এবং তাদের উপত্যকা ও অলিগলি দিয়ে প্রবাহিত হত তুষারের নদনদী। শীতকালে এখানকার অনেক গ্রাম বাহিরের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখতে পারে না—তাদের মাথার উপর দিয়ে বইতে থাকে বরফের ঝড়, তাদের চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে বরফের স্তূপ।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে সমস্ত কাফ্রিস্থান ছেয়ে যায় ফুলে-ফুলে। কোথাও বেদানা ও আঙুরের ঝোপ, কোথাও মনোরম সবুজে-ছাওয়া বনভূমি—তাদের উপরে ঝরে পড়ছে নির্ঝরের কৌতুকহাসি এবং নীচে দিয়ে নেচে যাচ্ছে গীতিময়ী নদী। পাহাড়ের তলার দিকে ঢেকে থাকে জলপাই ও ওক্‌গাছের শ্যামলতা এবং পাথরের ধারে ধারে ফলে আছে আখ্‌রোট, তুঁত, খুবানী, দ্রাক্ষা ও আপেল গাছ। আরো উপরে উঠলে দেখা যায় দেবদারু গাছের বাহার। ফুলও ফোটে যে কতরকম তার ফর্দ দেওয়া অসম্ভব!

এই হল গিয়ে কাফ্রিস্থানের মোটামুটি বর্ণনা।

৯

পাহাড়ে মেয়ে

চিত্রল থেকে উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে এসে আড্ডা গেড়েছি। এখানে দিন দুই-তিন থাকব স্থির করেছি—কেবল বিশ্রামের জন্যে নয়, দরকারি খবরাখবর নেবার জন্যেও।

এ গ্রামের বাড়িগুলোর অবস্থান বড় অদ্ভুত। দূর থেকে বাড়িগুলোকে দেখায় গেলারির মতন। পাহাড়ের ঢালু গায়ে বাড়িগুলো থাকে থাকে উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে।

এখানে বাড়ি তৈরির নিয়মও আলাদা। তার প্রধান উপাদান হচ্ছে কাঠ, পাথর আর কাদা! কাঠের ফ্রেমের মধ্যে বসানো হয় বড় বড় পাথরের পর পাথর এবং কাদা দিয়ে সারা হয় সুরকির কাজ। ছাদ মাটির। রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ারেও আমি পাকা বাড়ির মাটির ছাদ দেখেছি। এর কারণ জানি না।

যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে সে হচ্ছে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক, নাম গুম্‌লী। বিধবা। এ গ্রামে তার পসার-প্রতিপত্তি বড় কম নয় দেখলুম।

রামহরি মুসলমানের বাড়িতে অতিথি হতে রাজি নয়—জাত খোয়াবার ভয়ে। সেই খুঁজে খুঁজে গুম্‌লীকে আবিষ্কার করেছে। গুম্‌লী পুরানো কাফির-ধর্ম—অর্থাৎ পৌত্তলিকতা—ত্যাগ করে নি।

গুম্‌লী লোক ভালো, অতিথি-সৎকার করতে খুব ভালোবাসে। আমাদের প্রধান খাদ্য হয়েছে ঘি-জবজবে চাপাটি আর খাশির মাংস। তার উপরে পিঠা ও অন্যান্য খাবারেরও অভাব নেই।

কমল জানতে চাইলে, এখানে মুর্গী পাওয়া যায় কিনা?

গুম্‌লী ঘৃণায় নাক তুলে থুতু ফেলে বললে, 'ছি ছি, মুর্গী খায় মুসলমানরা, আমার বাড়িতে মুর্গী ঢোকে না।'

সে পুস্তো ভাষায় যা বললে, বিনয়বাবু তা বাংলায় তর্জমা করে আমাদের শোনালে। এদেশে তিনিই আমাদের দোভাষীর কাজ করছেন!

রামহরি পরম শ্রদ্ধাভরে বললে, 'গুম্‌লী বড় পবিত্র মেয়ে, সে তোমাদের মত ম্লেচ্ছ নয়।'

গুম্‌লী বললে, 'বাবুজীরা যদি গরুর মাংস খেতে চান, আমি খাওয়াতে পারি।'

রামহরি দুই চোখ ছানাবড়ার মতন করে বললে, 'কি সর্বনাশ, এরা মুর্গী খায় না, কিন্তু গরু খায় নাকি? অ্যাঁঃ, তবে তো এদের হেঁসেলে খেয়ে আমার জাত গিয়েছে! হে বাবা ভগবান, এ তুমি আমার কি করলে? লুকিয়ে লুকিয়ে জাতটি কেড়ে নিলে?'

'বাবা ভগবানে'র কাছ থেকে প্রশ্নের কোন উত্তর বা সান্ত্বনা না পেয়ে রামহরি কাঁদো কাঁদো মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে সে ফিরে এল বটে, কিন্তু গুম্‌লীর বাড়িতে আর জলগ্রহণ করলে না।

কাফিররা দশজনকে খাওয়াতে ভারি ভালোবাসে। শুনলুম বড় বড় ভোজ দিয়ে অনেকে ফতুর হতেও ভয় পায় না। অতিথি সৎকারের আইনও এখানে বেজায় কড়া! যে ভোজ দেয় সে যদি ভালো খাবার না খাওয়ায়, তাহলে তার জরিমানা হয়!

সন্ধ্যার আগে সবাই মিলে বেড়াতে গেলুম। সেদিন কাফিরদের কি-একটা উৎসব ছিল, তাই মেয়ে-পুরুষ মিলে নাচের আমোদে মেতেছে। খানিকক্ষণ নাচ দেখে চললুম নদীর ধারে। আমি আগে আগে এগিয়ে নদীর জলে হাত দিলুম। উঃ কী কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল! বুঝলুম কোন বরফের পাহাড় থেকে নেমে আসছে এই নদী।

আচম্বিতে পিছনে দূর থেকে কুমারের চীৎকার জাগল—'বিমল, বিমল! পালিয়ে এস—শিগ্‌গির পালিয়ে এস।'

চমকে ফিরে দেখি, কোথা থেকে গুম্‌লী আবির্ভূত হয়ে হাত-মুখ নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা কইছে! সে কি বলছে শুনতে পেলুম না, কিন্তু তারপরেই দেখলুম, বিনয়বাবুর সঙ্গে কুমার, কমল ও রামহরি বেগে দৌড় মারলে! বোঝা গেল ভয়েই তারা পালাচ্ছে, কিন্তু কেন পালাচ্ছে বোঝা গেল না।

তারপরেই শুনলুম বহু নারী-কণ্ঠে বিষম চীৎকার! দেখি দলে দলে কাফির নারী চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ও ছুটতে ছুটতে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!

তবে কি এই নারীদের ভয়েই ওরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল! কি আশ্চর্য, এরা কি আমাদের আক্রমণ করতে চায়? আমাদের শত্রুরা কি নিজেরা আড়ালে থেকে এই নারীসৈন্য নিযুক্ত করেছে? এখন আমার কি করা উচিত? পালাব? নারীর ভয়ে পালাব? হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় নেই! আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের গায়ে তো আর হাত তুলতে পারি না!

কিন্তু এখন আর পালানোও অসম্ভব! সেই বিপুল নারীবাহিনী তখন পঙ্গপালের মতন চারিধার থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছে! আর নারী বলে তাদের কারুকে তুচ্ছ করবারও উপায় নেই! তাদের কেউই বাংলাদেশের ভেঙে-পড়া লতার মতন মেয়ে নয়, তাদের অধিকাংশই সাধারণ বাঙালী পুরুষেরও চেয়ে মাথায় উঁচু—শক্ত ও বলিষ্ঠ তাদের দেহ!

আমি রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম—এমন অদ্ভুত সমস্যায় কখনো আর পড়ি নি! বিকট স্বরে চেঁচিয়ে মেয়ের দল সবেগে আমাকে আক্রমণ করলে! আর সে এমন বিষম আক্রমণ যে, স্বয়ং ভীমসেন তাঁর বিরাট গদা ঘুরিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারতেন না!

ভীতু ভেড়ার মতন আমি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলুম! তারা ছিনেজোঁকের মতন আমাকে চেপে ধরে হিড়্‌-হিড়্‌ করে টানতে টানতে নিয়ে চলল এবং তারপর আমি কিছু বোঝবার আগেই আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে একেবারে নদীর ভিতরে ফেলে দিল!

ঝুপ করে জলে পড়লুম। নদী সেখানে গভীর নয় বটে, কিন্তু সেই বরফ-

গলা জলে আমার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল। নাকানি-চোবানি খেয়ে অসাড় দেহটাকে কোন রকমে টেনে ডাঙায় তুলে দেখি, মেয়ের পাল সকৌতুকে হাসতে হাসতে আর একদিকে চলে যাচ্ছে! তবে কি এটা হচ্ছে ওদের ঠাট্টা? মেয়েমানুষ তেড়ে এসে জোয়ান পুরুষকে ধরে বেড়ালছানার মতন জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—এ কি রকম সৃষ্টিছাড়া দেশ? প্রাচীন গ্রীক সৈনিকরা নাকি এক-জাতের বীর-নারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে প্রাচীন কাফির নারীদের কোন সম্পর্ক নেই তো?

কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে চললুম। পথের চারিদিকেই মেয়ের দল হুড়োহুড়ি করে বেড়াচ্ছে, পাছে আবার তাদের পাল্লায় পড়তে হয়, সেই ভয়ে মানে মানে আমি পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলুম—কিন্তু তারা কেউ আর আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে না।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। আজ যেন এ দেশটা দস্তুরমত মেয়ে-রাজ্যে পরিণত হয়েছে—পথে পুরুষ খুব কম, কেবল মেয়ে, মেয়ে আর মেয়ে! যে কয়জন পুরুষের সঙ্গে দেখা হল তাদের প্রত্যেকেরই জামা-কাপড় ভিজে সপ্-সপ্ করছে! একটু পরেই সব রহস্য বোঝা গেল।

বাসায় ঢুকতেই কুমার, কমল আর রামহরি অট্টহাস্য করে উঠল। বিনয়বাবুও বোধহয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা হেসে নিলেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, 'যত-সব কাপুরুষ! ভয়ে পালিয়ে এসে আবার দাঁত বার করে হাসতে লজ্জা করছে না?'

কুমার বললে, 'স্বীকার করছি ভাই, আমরা হচ্ছি পয়লা নম্বরের কাপুরুষ! এই সব পাহাড়ে-মেয়ের সঙ্গে হাতাহাতি করবার শক্তি আমাদের নেই! কিন্তু হে বীরবর, তোমার চেহারা ভগ্নদূতের মতন কেন?'

কোন জবাব না দিয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে আমি কাপড়-চোপড় বদ্‌লাতে লাগলুম।

বিনয়বাবু বললেন, 'ভায়া বিমল, কুমার তোমাকে সাবধান করে দিলে, তবু তুমি আমাদের সঙ্গে পালিয়ে এলে না কেন?'

—'কেমন করে বুঝব যে ঐ দজ্জাল মেয়েগুলো আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে?'

—'আমরাও আগে বুঝতে পারি নি! ভাগ্যে গুম্‌লী এসে সাবধান করে দিলে, তাই আমরা মানে মানে মাথা বাঁচাতে পেরেছি।'

—'কিন্তু এ প্রহসনের অর্থ কি?'

—'আজ এখানে যে উৎসবটা হয়ে গেল, এর শেষে এখানকার মেয়েরা

পুরুষদের ধরে নদীর জলে হাবুডুবু খাইয়ে দেয়। এটা হচ্ছে কাফিরদের লোকাচার —এর বিরুদ্ধে পুরুষদের কোন জারিজুরিই খাটে না।'

—'তাই নাকি? তাহলে গুম্‌লীর কাছ থেকে জেনে রাখবেন, ওদের এ-রকম আরো লোকাচার আছে কিনা?'

অজানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের ও নিত্যনতুন দৃশ্য-সমারোহের মধ্যে আমরা ছুন্‌-ছিউ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। তারা যে এখনো আমাদের পিছনে লেগে আছে, এমন সন্দেহ করবার কোন কারণও পাই নি। অন্তত তারা যে আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, এ বিশ্বাস আমার ছিল!

কিন্তু হঠাৎ বোঝা গেল, আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত।

আজ বৈকালে মুখ অন্ধকার করে গুম্‌লী এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল! তারপর যেন আপন মনেই বললে, 'বার্মুক লোকটা মোটেই সুবিধের নয়!'

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বার্মুক? সে আবার কে?'

—'সে হচ্ছে এই গাঁয়ের 'জাষ্ট'।*

১০

বেড়াজালে

গুম্‌লীর মুখের ভাব দেখে আমাদের সকলেরই মনে খটকা লাগল। কিন্তু এই অজানা গাঁয়ের অচেনা সর্দার যদি সুবিধার লোকও না হয়, তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে?

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা সুবিধের নয় বলছ কেন?'

—'আজ দুপুর-বেলায় আমি ভিন্‌-গাঁয়ে গিয়েছিলুম। ফেরার পথে দেখলুম, পাহাড়ে একটা ঝোপের ছায়ায় বসে আছে বার্মুক আর দুটো চীনেম্যান।'

---

*'জাষ্ট'—অর্থাৎ সর্দার।

বিনয়বাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'চীনেম্যান?'

—'হাঁ বাবুজী। তারা চুপি চুপি কি বলাবলি করছিল, আমাকে দেখেই একেবারে চুপ মেরে গেল। আমি কোন কথা না বলে এগিয়ে এলুম। খানিক দূর এসেই ফিরে দেখলুম, বার্মুক আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চীনেম্যান দুটোকে কি যেন বলছে।

—'তারপর?'

—'তারপর তখন আর কিছু হল না। কিন্তু এইমাত্র বার্মুক এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

—'কেন?'

—'হতভাগা আমাকে কি বলে জানেন বাবুজী? আজ রাত্রে আমি যদি আপনাদের খাবারের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে আর সদর-দরজা খুলে রাখতে পারি, তাহলে সে আমাকে পাঁচশো টাকা বখ্সিস্ দেবে। অর্ধেক টাকা সে এখনি দিতে চায়।'

—'বখ্সিসে লোভ তোমার আছে নাকি?'

—'আছে বাবুজী, আছে!'

—'মানে?'

—'মুখপোড়া বার্মুকের কাছ থেকে বখ্সিসের আগাম আড়াই-শো টাকা আমি আদায় করে নিয়েছি।'

—'গুম্লী!'

—'ঘাব্ড়াবেন না বাবুজী, ঘাব্ড়াবেন না। বার্মুক হচ্ছে পাজীর পা ঝাড়া, মানুষ মারতে তার হাত এতটুকুও কাঁপে না। সে কাফির হলেও আমাদের ধর্ম ছেড়েছে, তাই তাকে আমরা পরম শত্রু বলেই মনে করি। তাকে ঠকিয়ে যদি আড়াই-শো টাকা লাভ করতে পারি, তাহলে আমার কোন পাপ হবে না।'

—'গুম্লী, আমরা এখনি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাই।'

—'ভয় নেই বাবুজী। যখন সব কথা প্রকাশ করলুম, তখন আপনাদের খাবারের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি বিষ মাখিয়ে দেব না। বার্মুকের মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছি না বটে, তার অর্ধেক টাকা যখন নিয়েছি, অর্ধেক কাজও আমি করব।'

—'অর্থাৎ?'

—'আজ রাত্রে সদর-দরজাটা খুলে রাখব।'

—'তারপর?'

—'তারপর রাত্রে কেউ আমার বাড়িতে ঢুকলে ভালো করেই তাকে আদর-

যত্ন করব। গরক্, বাচিক্, কারুক্, আর মাল্কানকে খবর দিয়েছি, তারা এলো বলে।'

—'তারা আবার কে?'

—'আমার বিশ্বাসী লোক—আমার কথায় তারা ওঠে-বসে। আজ রাত্রে তারা আমার বাড়িতে পাহারা দেবে।'

বিনয়বাবু যখন সব কথা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, তখন আমিও বললুম, 'আমিও গুম্লীর মতে সায় দিই। শঠের সঙ্গে শঠতা করতে কোন দোষ নেই। আসুক ছুন্-ছিউ, আসুক বার্মুক! এখানে এলেই তারা দেখতে পাবে, মড়ারা জ্যান্তো হয়ে বন্দুক ধরে বসে আছে!'

কুমার কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'গুম্লী-ঠাক্রুণ! তোমার বাকি আড়াই-শো টাকাও মারা যাবে না। ও-টাকাটাও আমরা নিজেদের পকেট থেকে তোমায় দেব!'

গুম্লী একগাল হেসে সেলাম করে বললে, 'বাবুজী মেহেরবান্!'

পাহাড়ের টঙে কাফিরদের ছোট্ট গাঁ, নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল প্রথম রাত্রেই। রাত যত গভীর হয় স্তব্ধতা ততই থম্থমে হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন বোবা দুনিয়ায় জেগে আছে কেবল গোটাকয়েক বদ-রাগী কুকুর।

সদর-দরজার পাশেই একটা ঘর তার মধ্যে আলো নিবিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, কুমার, বিনয়বাবু, কমল ও রামহরি। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে আছে একটা করে রিভলভার। এই সংকীর্ণ স্থানে বন্দুকের সাহায্য দরকার হবে না।

গরক্, বাচিক্, কারুক্, আর মাল্কানও এসেছে। তারা সবাই ছয় ফুট করে লম্বা, সারা গায়ে কঠিন মাংসপেশীর খেলা। তারা কথা কয় কম, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বেশ বোঝা যায়, আমাদের সাহায্য করবার জন্যে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গরক্ ও বাচিক্ বাড়ির ছাদের উপরে বসে আছে পাহারা দেবার জন্যে। কারুক্ আর মাল্কান অপেক্ষা করছে গাঁয়ের পথে, শত্রুরা দেখা দিলেই তারা আমাদের সাবধান করে দেবে। প্রথমে তারা আমাদের সঙ্গে বাড়ির ভিতরেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হই নি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি বাড়ির ভিতরে পাঁচটা রিভলভারই যথেষ্ট, তারা যদি যথাসময়ে শত্রুদের আগমন সংবাদ দিতে পারে, তাহলেই আমাদের যথার্থ উপকার করা হবে।

রাতের অসাধারণ নীরবতার মাঝে আমাদের হাতঘড়িগুলোর টিক্-টিক্ শব্দ যেন রীতিমত কোলাহল বলে মনে হচ্ছে!

বাঘা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে, আমরা কোন অযাচিত ও অনাহুত অতিথিকে

অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে আমার কোল ঘেঁষে কান খাড়া করে বসে আছে।

আচম্বিতে দূর পথ থেকে ভেসে এল একটা বিড়ালের ম্যাও-ম্যাও চীৎকার! তারপরই ছাদের উপর থেকে সাড়া দিলে আর একটা বিড়াল!

এই হল আমাদের সঙ্কেত-ধ্বনি! এর মানে, এখনি হবে শত্রুদের আবির্ভাব।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম।

বিনয়বাবু চুপি চুপি বললেন, 'আমরা কি করব?'

—'বিশেষ কিছু না। এখানে সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে হুলুস্থূল বাধিয়ে দিলে পুলিশ হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে। বদমাইসগুলোকে কিছু ভয় দেখাতে বা সামান্য জখম করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রামহরি, বাঘাকে সামলে রাখো। কুমার, শত্রুরা যখন পালাবে তখন তোমরা সবাই মিলে রিভলভার ছুঁড়ে তাদের পেটের পিলে চমকে দিতে পারো।'

এক, দুই করে প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট কাটল। তারপরেই একটু একটু করে সদর-দরজাটা ফাঁক হয়ে ভিতরে ক্রমেই বেশি চাঁদের আলো এসে পড়তে লাগল।...সদর-দরজা একেবারে খুলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো পোশাক পরা তিনতিনটে মূর্তি।

প্রথম মূর্তিটার পা লক্ষ্য করে আমি রিভলভার ছুঁড়লুম। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে মাটির উপরে বসে পড়ল।

আমার রিভলভার আরো দুইবার গর্জন করলে—কিন্তু এবারে আমি আর কারুকে লক্ষ্য করি নি।

যে পায়ে চোট খেয়ে বসে পড়েছিল, সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করলে! অন্য দুজনও দাঁড়াল না।

ছাদের উপর থেকে বড় বড় পাথর-বৃষ্টি হতে লাগল—নিশ্চয় গরক্ ও বাচিকের কীর্তি! কুমার প্রভৃতিও ঘর থেকে বেরিয়ে ঘন ঘন রিভলভার ছুঁড়তে লাগল—আর বাঘার চ্যাঁচামেচির তো কথাই নেই! শান্তিপূর্ণ মৌন রাত্রি যেন কর্কশ শব্দের চোটে হঠাৎ বিষাক্ত হয়ে উঠল!

তারপরেই চাঁদের আলোয় দেখা গেল, দুজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকেই আসছে! প্রথমটা তাদের শত্রু ভেবে আমি আবার রিভলভার তুললুম, কিন্তু তারপরেই দেখি তারা হচ্ছে আমাদেরই লোক—কারুক্ আর মাঙ্কান।

মাঙ্কান কাছে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'পশ্চিম দিক থেকে অনেক লোক এই দিকেই আসছে!'

—'অনেক লোক! কত?'

—'তা বিশ বাইশ জনের কম হবে না!'

—'তারাও কি আমাদের শত্রু?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে বাবুজী! এত রাতে ভালো লোকেরা দল বেঁধে কখনো পাহাড়-পথে চলে না!'

এমন সময়ে ছাদের উপর থেকে গরক্ চীৎকার করে বললে, 'হুঁশিয়ার বাবুজী, হুঁশিয়ার! পুব-দিক থেকে অনেক আদ্‌মি আসছে!'

কারুক্ সভয়ে বললে, 'কি মুশ্‌কিল! দুষমনরা কি বাড়িখানা ঘিরে ফেলতে চায়?'

কারুক্ বোধহয় ঠিক আন্দাজই করেছে! হয়তো আমাদের বেড়া-জালেই ধরা পড়তে হবে।

১১

মৃত্যুর হুঙ্কার

দু-দিক থেকে শত্রুরা আসছে দলে দলে, হয়তো পালাবার সব পথই বন্ধ করে—আমাদের টিপে মেরে ফেলবার জন্যে।

জানি, আমাদের পাঁচজনের কাছে আছে পাঁচটা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক বা 'অটোমেটিক রাইফেল'—তাদের প্রত্যেকটা মিনিটে গুলিবৃষ্টি করতে পারে পঁয়ত্রিশবার! সুতরাং শত্রুরা যে সহজে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি অপরিচিত শত্রুদের স্বদেশে; গুম্‌লীর বাড়িখানা এখানে আমাদের পক্ষে মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতন বটে, কিন্তু সমস্ত গ্রামের বিরুদ্ধে পাঁচজনে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারব? আর আমাদের আশ্রয় দিয়ে গুম্‌লীই বা বিপদে পড়বে কেন? শত্রুরাও নিশ্চয় নিরস্ত্র নয় এবং ওদের দলে যদি শয়তান ছুন্-ছিউ থাকে তাহলে ওদের সঙ্গেও যে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, এটাও অনুমান করতে পারি। অতএব আমাদের আশ্রয়দাত্রী এই বিদেশিনী নারীর অঙ্গনকে যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা বোধহয় সঙ্গত নয়।

বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই—প্রতি মুহূর্তেই শত্রুরা আরো কাছে এসে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মাল্কান, আমাদের পালাবার কোন পথই কি খোলা নেই?'

মাস্কান যা বললে বিনয়বাবু তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন।—'একটা পথ আছে বাবুসাহেব!'

—'কোথায়?'

—'বাড়ির খিড়কী দিয়ে বেরুলে উত্তর দিকে একটা সরু পাহাড়ী-পথ পাওয়া যাবে।'

—'উত্তর দিকে?...মাস্কান, আমরা কি দেখবার জন্যে এদেশে এসেছি সে-কথা তুমি বোধহয় জানো না?'

—'জানি বাবুসাহেব! গুম্‌লী-বিবির মুখে আমি সব শুনেছি—কারণ আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমারই ওপরে। আপনারা তো সেকালের সেই ভাঙা মঠ দেখতে যেতে চান?'

—'হ্যাঁ! সে মঠও তো উত্তর দিকে?'

—'হ্যাঁ! বাবুসাহেব।

—'এখান থেকে সে মঠ কত দূরে?'

—'তা প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল হবে।'

—'তুমি এখনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে?'

—'এখনি?'

—'হ্যাঁ মাস্কান, যদি রাজি হও একশো টাকা বখ্‌সিস পাবে।'

মাস্কান ইতস্তত করছিল, কিন্তু এই দরিদ্র কাফ্রিস্থানে একশো টাকা হচ্ছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য! সে মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'বাবুসাহেব, আমি যেতে রাজি!'

আসছে কাল সকালেই আমাদের এখান থেকে বেরুবার কথা বলে আমরা আগে থাকতেই মোটঘাট বেঁধে রেখেছিলুম।

হুট্ বলতে ছুট দেওয়ার অভ্যাস আমাদের বরাবরই। এ হপ্তায় আমরা কলকাতার সৌখীন নাগরিক, আসছে হপ্তায় আফ্রিকার বিপুল অরণ্যে বনবাসী! এমনি ভবঘুরের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে একটা ভালো শিক্ষা আমরা পেয়েছি। প্রবাসে যেতে হলে বাঙালীরা মস্ত-বড় গৃহস্থালী ঘাড়ে করে বেরোয়—বড় বড় ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, বিছানা, পোটলা-পুটলী! কিন্তু কত কম জিনিস সঙ্গে নিয়ে পথে-বিপথে অনায়াসেই দৈনিক জীবন যাপন করা যায়, সে-সমস্যা আমরা সমাধান করতে পেরেছি! যা দরকার সে সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে, অথচ আমাদের মালের সংখ্যা এত কম যে, কুলী ডাকবার দরকার হয় না—নিজেদের মাল নিজেরাই বয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা মোটমাট গুছিয়ে নিয়ে অজানার অন্ধকারে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম!

গুম্‌লী এসে ম্লান মুখে বললে, 'বাবুজী, আমি এখন বুঝতে পারছি, বার্মুকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভালো কাজ করি নি। আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনলুম আমিই! এ দুঃখ আমার কখনই যাবে না!'

কুমার বললে, 'না গুম্‌লী-বিবি, মিথ্যে অনুতাপ কোরো না। শত্রুরা নিশ্চয়ই আজ আমাদের আক্রমণ করত। তবে ওরা কেবল একবার চেষ্টা করে দেখেছিল যে, তোমার সাহায্যে চুপি চুপি নিরাপদে কাজ সারা যায় কিনা! আর সময় নেই—সেলাম!'

—'সেলাম বাবুজী, সেলাম! একটা সেকেলে ভাঙা মঠে বেড়াতে যাবার জন্যে এত বিপদ মাথায় নিয়েছেন কেন, সে কথা আমি জানি না বটে, কিন্তু সর্বদাই মনে রাখবেন বাবুজী, গুম্‌লীর দৃষ্টি রইল আপনাদেরই ওপরে!'

বাড়ির খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হলুম, গুম্‌লীর শেষ কথাগুলোর অর্থ কি?

চাঁদ তখনো অস্ত যায় নি বটে, কিন্তু একটা উঁচু পাহাড়ের পিছনে নেমে গিয়েছে—চারিদিকে রাত্রির বুকের উপরে দুলছে ঘন ছায়ার রহস্যময় যবনিকা।

শত্রুরা এখন আর চোরের মতন আসছিল না, পাহাড়ে-পথের উপরে বহু পাদুকার কঠিন ধ্বনি শুনে নিশীথিনী তার মৌনব্রত ভঙ্গ করে যেন সচমকে জেগে উঠল। বুঝলুম কৌশলে কার্যোদ্ধার হল না দেখে শত্রুরা এমন মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে দস্যুর মতন।

ছুন্-ছিউর বাহাদুরি দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারলুম না। যে লোক এরই মধ্যে অপরিচিত দূর-বিদেশে এসে এমন বৃহৎ এক দল গড়তে পারে, নিশ্চয়ই সে অসাধারণ ব্যক্তি।

কিন্তু বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না বিমল, আমি ছুন্-ছিউর অসাধারণত্ব স্বীকার করি না। পৃথিবীতে সঙ্গীর অভাব হয় ভালো কাজেই, কারণ জগতে সাধুর সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু কুকার্যে নিযুক্ত হয়ে তুমি যদি একবার ডাক দাও, চারিদিক থেকে সঙ্গী এসে জুটবে পঙ্গপালের মতন। পৃথিবীর হিতসাধন করবার জন্যে বুদ্ধদেবকে পথে বেরুতে হয়েছিল একাকীই, কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং আর নাদির শা যখন পৃথিবীর উপরে অমঙ্গলের অভিশাপ বর্ষণ করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তাদের লক্ষ লক্ষ পাপ-সঙ্গীর অভাব হয় নি।'

আলোর ছায়া পড়ে না জানি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল চারিদিককে মায়াময় করে তুলেছে যেন অচঞ্চল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ছায়া! কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে

না, অথচ সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই পাহাড় বা জঙ্গল বা ঝোপ-ঝাপের আবছা অস্তিত্ব জাগে চোখে।

সব-আগে চলেছে মাঙ্কান, তারপর আমরা। এমন এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যে, দুজনের পাশাপাশি চলবার উপায় নেই।

কুমার বাঘার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'বাঘা, তুমি এখন কারুকে ধমক-টমক দেবার চেষ্টা কোরো না। একেবারে চুপ করে থাকো---বুঝেছ?'

বাঘা নিশ্চয়ই বুঝলে। আমরা নিজেদের মনুষ্যত্বের গর্বে কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবকে পশু বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। কিন্তু পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, মানুষের সংসারে যে-সব জীব বা পশু পালিত হয়, তাদের অনেকেই আমাদের মুখের ভাষা বা মনের ভাব বুঝতে পারে। বাঘাও কুমারের বক্তব্য বুঝে একটিমাত্র শব্দও উচ্চারণ করলে না।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে শত্রুদের পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। কিন্তু আরো মিনিট-কয়েক পরে বহু কণ্ঠের একটা উচ্চ কোলাহল জেগে উঠে রাতের নীরবতা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

মাঙ্কান বললে, 'বাবুসাহেব, ওরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে শিকার হাতছাড়া হয়েছে। যদিও ওরা জানে না আমরা কোনদিকে গিয়েছি, তবু সাবধানের মার নেই—তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলুন।'

আমরা দৌড়াতে আরম্ভ করলুম। সেই পাহাড়ে-পথ কোথাও বনের অন্ধকার, কোথাও চাঁদের আলো মেখে এবং কোথাও উঁচু দিকে উঠে ও কোথাও নীচু দিকে নেমে এঁকেবেঁকে সমান চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখি দু-পাশেই গভীর খাদ, সেখানে এব্ড়ো-খেব্ড়ো পথে ছুটতে গিয়ে একবার যদি হোঁচট্ খাই তাহলে এ-জীবনে আর শা-লো-কা মঠ, কুবের মূর্তি ও গুপ্ত গুহার গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনই দরকার হবে না।...

এতক্ষণে পথটা চওড়া হয়ে এল! এখন চার-পাঁচ জন লোক অনায়াসেই পাশাপাশি চলতে পারে। চাঁদের আলোও আর পাহাড়ের আড়ালে নেই। সুতরাং পথ চলবার কষ্ট আর হঠাৎ বিপদে পড়বার ভয় থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

মাঙ্কান একবার পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর অভিভূত স্বরে বললে, 'দেখুন বাবুসাহেব, দেখুন!'

পিছন ফিরে দেখলুম, অনেক দূরে—প্রায় হাজার ফুট নীচে এক জায়গায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং আরক্ত অগ্নির ক্রুদ্ধ শিখায় শূন্যের অনেকখানি লাল হয়ে উঠেছে।

কুমার বললে, 'ওখানে অমন আগুন জ্বলবার কারণ কি?'

মাঙ্কান বললে, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি, আগুনে পুড়ছে গুম্‌লী-বিবির বাড়ি! শয়তানরা আমাদের ধরতে না পেরে রেগে পাগল হয়ে গুম্‌লী-বিবির বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

রামহরি দরদ ভরা গলায় বললে, 'আহা, আমাদের আশ্রয় দিয়েই গুম্‌লী আজ পথে বসল!'

মাঙ্কান মাথা নেড়ে বললে, 'একখানা বাড়ি পুড়ে গেলেই গুম্‌লী-বিবি পথে বসবে না। তার কেবল টাকাই নেই, যে-সব কাফির এখনো বাপ-পিতামহের ধর্ম ছাড়ে নি, তাদের কাছে গুম্‌লীবিবির মানমর্যাদাও যথেষ্ট, তার জন্যে তারা প্রাণ দিতেও নারাজ নয়। তারা যখন খবর পাবে তখন বিধর্মী বার্মুককে প্রাণ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। কিন্তু বাবুসাহেব, আমার কি ভাবনা হচ্ছে জানেন? আজ গুম্‌লী-বিবিকে হাতে পেয়ে দুষমণরা যদি তার ওপরে অত্যাচার করে, তাহলে কে তাদের বাধা দেবে?'

মাঙ্কানের কথা শুনতে শুনতে নীচে আর এক দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেখানটায় চাঁদের আলো নেই, অন্ধকারের মধ্যে নাচছে কতকগুলো ছোট ছোট চলন্ত আলোক-শিখা।

মাঙ্কানও দেখতে পেলে। ত্রস্ত স্বরে বললে, 'বাবুসাহেব, বাবুসাহেব! শত্রুরা আবার আমাদের ধরতে আসছে!'

বাঘা পর্যন্ত বুঝতে পারলে। চাপা গলায় গর্‌র্ গর্‌র্ করে গজরাতে লাগল।

আমি বললুম, 'এগিয়ে চল—এগিয়ে চল! যতক্ষণ পারি এগিয়ে তো চলি, তারপর দরকার হলে যুদ্ধ করতেও আপত্তি নেই?'

কুমার বললে, 'হুঁ, ছুন্-ছিউ এখনো আমাদের ভালো করে চিনতে পারে নি! ভেবেছে দলে ভারি হয়ে আমাদের ওপরে সে টেক্কা মারবে!'

কমল বললে, 'দেখা যাক্ ছুন্-ছিউ কত বড় গুলিখোর—আমাদের অটোমেটিক রাইফেলের ক-টা গুলি সে হজম করতে পারে!'

বিনয়বাবু রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'থামো ছোক্‌রা, থামো—অত আর বাক্য-বন্দুক ছুঁড়তে হবে না! কথায় কথায় যুদ্ধ অমনি করলেই হল না? বিনা যুদ্ধে যাতে কার্যসিদ্ধি হয়, আগে সেই চেষ্টাই দেখ।'

রামহরিও বিনয়বাবুর কথায় সায় দিয়ে কমলের দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বললে, 'যা বলেছেন বাবু! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!'

আমি হাসছি দেখে বিনয়বাবু বললেন, 'না বিমল, এ-সব হাসির কথা নয়! আমার বিশ্বাস, শত্রুদের দলে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম লোক নেই, আর ওরাও

হয়তো বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে। যুদ্ধে ওদের দশ-পনেরো জন মারা পড়লেও দলে ওরা ভারি থাকবে। কিন্তু গুন্‌তিতে আমরা তো মোটে ছয় জন লোক, এর মধ্যে তিন-চার জন যদি মারা পড়ে বা জখম হয় তখন কি উপায় হবে?'

আমি বললুম, 'ঠিক কথা বিনয়বাবু! নিতান্ত নিরুপায় না হলে আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব না। চল, চল, তাড়াতাড়ি পা চালাও!'

আরো মিনিট পনেরো ধরে নীরবে দ্রুতবেগে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু শত্রুরা এগিয়ে আসছিল আমাদেরও চেয়ে বেশি বেগে। কারণ খানিকক্ষণ পরেই তাদের চীৎকার শুনতে পেলুম।

চলতে চলতে কেটে গেল আরো মিনিট দশ-বারো! পথ সেখানে সিধে নেমে গিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, মশালের আলোগুলো আমাদের কাছ থেকে বড়-জোর সিকি মাইল তফাতে আছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললুম, 'বিনয়বাবু, আর এগুবার চেষ্টা করা নিরাপদ নয়। তাহলে প্রস্তুত হবার সময় পাব না।'

বিনয়বাবু হতাশভাবে বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।'

—'হ্যাঁ, করতেই হবে। কুমার, তোমারা প্রত্যেকেই ব্যাগগুলো সামনের দিকে রেখে মাটির উপরে শুয়ে পড়। ওরা যদি বন্দুক ছোঁড়ে, তাহলে ব্যাগগুলো সামনে থাকলে আত্মরক্ষার খানিকটা সুবিধে হবে।'

মাঙ্কান বললে, 'বাবুসাহেব, বাঁ পাশেই পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা রয়েছে। আমরা এর মধ্যে আশ্রয় নিলে কি ভালো হয় না?'

—'এ গুহার ভিতর দিয়ে কি অন্য দিকে বেরুবার পথ আছে?'

—'না বাবুসাহেব।'

—'তাহলে ও গুহা হবে আমাদের পক্ষে ইঁদুর-কলের মতন। ওর মধ্যে বন্দী হতে চাই না।'

ঠিক সেই সময়ে নীচের দিকে চার-পাঁচটা বন্দুকের আওয়াজ হল—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মাটির উপরে সটান শুয়ে পড়ে নিজের নিজের বন্দুক বাগিয়ে ধরলুম।

আচম্বিতে আর একটা ভয়াবহ গম্ভীর ধ্বনি জেগে উঠে সেই পর্বতরাজ্যকে শব্দময় করে তুললে। সে ধ্বনি অপূর্ব, বিস্ময়কর, বজ্রাধিক ভীষণ—শুনলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এদেশে এসে এ-রকম ধ্বনি আগেও শুনেছি—এ হচ্ছে পাহাড় ধ্বসে পড়ার শব্দ—কাফ্রিস্থানের এক সাধারণ বিশেষত্ব!

কিন্তু আমাদের এত কাছে এমন শব্দ-বিভীষিকা আর কোনদিন জাগ্রত হয় নি! দলবদ্ধ বজ্র যেন গড়্ গড়্ করে ভৈরব নাদে ধেয়ে আসছে আমাদের মাথার উপর-দিক থেকেই।

মাঙ্কান এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মতন চীৎকার করে বললে, 'বাবুসাহেব, পাহাড় ধ্বসে পড়ে নেমে আসছে এই পথ দিয়েই।'

বারো

সলিল-সমাধি

সেই কল্পনাতীত, গতিশীল শব্দ-বিভীষিকার তলায় থেকে মনে হল, সৃষ্টির শেষ-মুহূর্ত উপস্থিত এবং দুর্দান্ত প্রলয় উৎকট আনন্দে নেমে আসছে আমাদের মাথার উপরে!

প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি—হঠাৎ মাঙ্কান প্রাণপণে চীৎকার করে প্রচণ্ড এক লাফ মেরে আমাদের বাঁ পাশের গুহাটার ভিতর গিয়ে পড়ল।

চোখের পলক পড়তে না-পড়তেই আমরাও প্রায় এক সঙ্গেই গুহার ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হলুম—এমন কি বাঘা পর্যন্ত! আত্মরক্ষার চেষ্টা এমনি স্বাভাবিক যে, মানুষ আর পশু চরম বিপদের সময়ে ব্যবহার করে ঠিক একই রকম!

ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গুহার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল এবং পথের উপর দিয়ে চলে যেতে লাগল যেন কান-ফাটানো প্রাণ-দমানো মহাশব্দের অদ্ভুত এক ঝটিকা ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ—চারিদিকে নুড়ির পর নুড়ি ছড়াতে ছড়াতে। একটা নুড়ি এসে লাগল কমলের কাঁধের উপরে, সে আর্তনাদ করে বসে পড়ল।

মিনিট দুই ধরে গুরুভার পাথরের স্তূপগুলো ঠিক জীবন্ত ও হিংস্র প্রাণীর মতন গড়াতে গড়াতে ও লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে নামতে লাগল—সেই দুই মিনিট যেন দুই ঘণ্টার চেয়েও বেশি। গুহার ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন ভূমিকম্পে! গুহার ছাদটাও যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে চায়!

ভয়ানক মৃত্যুর বন্যা যখন গুহামুখ ছেড়ে নীচের দিকে নেমে গেল, তখনো আমরা স্তম্ভিতের মতন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম!

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন বিনয়বাবু। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বিমল, নীচের দিক থেকে বিষম এক হাহাকার শুনতে পেয়েছ?'

আমি বললুম, 'পেয়েছি। যে মৃত্যুকে আমরা ফাঁকি দিলুম, শত্রুরা বোধহয় তাকে এড়াতে পারে নি! অনেক লোকের কান্না শুনেছি, বোধহয় তারা সদলবলে মারা পড়েছে।'

কমল আর্তস্বরে বললে, 'বিমলদা, নুড়ি লেগে বোধহয় আমার কাঁধের হাড় ভেঙে বা সরে গেছে। আমি ডানহাত নাড়তে পারছি না।'

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি কমলের কাছে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন।

কুমার ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, 'সর্বনাশ। আমার বন্দুকটা যে বাইরে ফেলে এসেছি!'

আমারও বন্দুক বাইরে পড়ে আছে—প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বন্দুকের কথা ভাববার সময় পাই নি।

বিনয়বাবু আর কমল বন্দুকহীন—বন্দুক নিয়ে ভিতরে ঢুকতে পেরেছে কেবল রামহরি।

ছুটে গুহার বাইরে গেলুম। সেখানেও বন্দুকগুলোর কোন চিহ্ন নেই—ছুটন্ত পাথরের বিষম ধাক্কায় ঝাঁটার মুখে তুচ্ছ ধূলোর মতন বন্দুকগুলো যে কোথায় গিয়ে পড়েছে তা কে জানে! পাথরের চাপে হয়তো সেগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে!

কুমার বললে, 'শত্রুদের অবস্থাও যদি বন্দুকগুলোর মতন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভাবনার কারণ নেই। রামহরির একটা বন্দুক আর আমাদের চারটে রিভলভারই যথেষ্ট।'

পাহাড়ের গা দিয়ে যে ঢালু পথ বেয়ে বেয়ে আমরা উপরে উঠেছি তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। যতদূর নজর চলে কেবল দেখা যায়, পথের উপরে ছড়ানো রয়েছে নুড়ি আর নুড়ির রাশি,—বড় বড় পাথরগুলো গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নেমে হারিয়ে গিয়েছে দৃষ্টির অন্তরালে। শত্রুরাও অদৃশ্য। হয়তো তাদের দেহগুলো এখন পাহাড়ের পদতলে পড়ে আছে নির্জীব ও রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের মতন।

আশ্বস্ত হলুম বটে, কিন্তু দুঃখিতও হলুম যথেষ্ট। এতগুলো মানুষের এমন শোচনীয় পরিণাম!

তখন রঙিন উষার রহস্যময় আলো সেই শৈলরাজ্যকে করে তুলেছে নতুন এক স্বপ্নলোকের মতন। ভোরের পাখিদের সভায় জাগল ঘুম-ভাঙানি গান এবং পলাতক অন্ধকারের পরিত্যক্ত আসন জুড়ে বিরাজ করছে স্নিগ্ধসবুজ লতা পাতা বনস্পতি।

রামহরি বললে, 'খোকাবাবু, আমাদের মোটঘাটগুলোও রসাতলে গিয়েছে!'

আমি বললুম, 'তাহলে উপায়? শত্রু নিপাতের পর বন্দুকের দরকার নেই বটে কিন্তু রসদ না থাকলে পেট চলবে কেমন করে?'

মাল্কান বললে, 'ভয় নেই বাবুসাহেব, আমাদের আর বেশিদূর যেতে হবে না। এই পাহাড়ের নীচেই আছে একটা নদী। তারপর নদী পার হয়ে ঘণ্টাখানেক পথ চললেই আমরা সেই মঠে গিয়ে হাজির হব।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'নদীটা কত বড়?'

—'চওড়া খুব বেশি নয় বটে, কিন্তু জল খুব গভীর। তবে আপনাদের ভাবনা নেই, নদীর ওপরে একটা কাঠের সাঁকো আছে।'

—'বেশ, তাহলে আবার যাত্রা করা যাক', এই বলে আমি অগ্রসর হলুম। সঙ্গীরাও আমার পিছনে পিছনে চলল। পিছন থেকে মাঝে মাঝে কমলের 'আঃ! উঃ!' বলে আর্তনাদ কানে আসতে লাগল—বোধহয় তার আঘাতটা হয়েছে গুরুতর।

মিনিট পঁচিশ পরেই আমরা পাহাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনেই প্রভাত সূর্য-করে জ্বলন্ত সুদীর্ঘ এক বাঁকা তরোয়ালের মতন একটি বেগবতী নদী বয়ে যাচ্ছে কলনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে। চওড়ায় সে ষাট-সত্তর ফুটের বেশি হবে না, কিন্তু তার স্রোতের টান এমন বিষম যে দেখলেই মনে হয়, জল যেন টগবগ করে ফুটছে!

কুমার শুধোলে, 'মাল্কান, তুমি যে সাঁকোর কথা বললে সেটা কোথায়?'

মাল্কান মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললে, 'সাঁকোটাতো এইখানেই ছিল।'

—'এইখানেই ছিল তো গেল কোথায়? সাঁকোর তো আর পা নেই যে 'মর্নিং ওয়াক্' করতে বেরুবে?'

মাল্কান বললে, 'আমি আজ এক বছর এদিকে আসি নি। গেল বর্ষায় জলের তোড়ে সাঁকোটা নিশ্চয় ভেসে গিয়েছে। এদেশে এমন ব্যাপার হামেশাই হয়।'

আমি হতাশ ভাবে বললুম 'তাহলে আমরা কি করব? এ নদীটা তো দেখছি দুই পাহাড়ের মাঝখানকার ঢালু জমি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে, সাঁতার কেটে এর প্রখর স্রোত এড়িয়ে ওপারে যাওয়া সোজা নয়।'

কমল বললে, 'সোজাই হোক আর কঠিনই হোক, আমার পক্ষে সাঁতার কাটা অসম্ভব। আমি ডান হাত নাড়তেই পারব না।'

কুমার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে ইংরেজী ভাষায় কর্কশ স্বরে কে বললে, 'এখনি সবাই মাথার ওপরে হাত তোলো।'

চম্‌কে ফিরে দেখি ঠিক আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছুন্-ছিউ, আরো দুজন চীনেম্যান এবং চারজন কাফির! ছুন্-ছিউ ও তার চীনে সঙ্গীদের হাতে বন্দুক!

ছুন্-ছিউ আবার শাসিয়ে বললে, 'এখনো হাত তুললে না?'

বাধ্য হয়ে আমাদের সকলকেই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হল, কাঠের মূর্তির মতন।

ছুন্-ছিউ ইঙ্গিত করতেই কাফিররা ছুটে এসে ধাক্কা মেরে আমাদের মাটির উপরে শুইয়ে দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেললে।

আমার সামনে এগিয়ে এসে ছুন্-ছিউ প্রথমে করলে বিকট অট্টহাস্য! তারপর বললে, 'বাবু, এইবারে তোমাদের আমি হাতের মুঠোয় পেয়েছি! কিন্তু আমি বেশি কথা বলতে চাই না। প্রাণ বাঁচাতে চাও তো লকেটখানা ফিরিয়ে দাও।'

আমি বললুম, 'তুমি যা চাইছ আমার কাছে তা নেই।'

আবার হা হা করে হেসে উঠে ছুন্-ছিউ বললে, 'নেই? তাহলে কি তোমরা এতদূরে এসেছ ছেলেখেলা করতে? ওহে, দেখ্তো এদের জামা কাপড়গুলো খুঁজে!'

তারা আমাদের প্রত্যেকের জামা কাপড় তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে—এমন কি আমাদের মুখ বিবর পর্যন্ত দেখতে ছাড়লে না।

লকেট আছে কলকাতায়, কিন্তু তার লিখন আছে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে। ছুন্-ছিউকে সে কথা বলা উচিত মনে করলুম না।

ছুন্-ছিউ রাগে যেন পাগলের মতন হয়ে উঠল। চীৎকার করে বললে, 'ওরে বাঙালী কুত্তার দল! তোদের জন্যে আমার দুর্গতির সীমা নেই! চীন থেকে এলুম বাংলাদেশে, সেখানে বিপদের পর বিপদ এড়িয়ে এসেছি এই কাফ্রিস্থানে। এখানে এসে আমাদের আটাশজন লোকের প্রাণ গিয়েছে, তবু আমি তোদের সঙ্গ ছাড়ি নি। এত করেও শেষটা কি আমাকে ফাঁকে পড়তে হবে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ বন্ধু, ঠিক আন্দাজ করেছ! এখন দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও।'

ছুন্-ছিউ চোখ পাকিয়ে বললে, 'তাই নাকি? আমাকে যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে তোমাদেরও এই পৃথিবীতে রেখে যাব না!'

—'বেশ, তাহলে আমাদের খুন করো। মরতে হবে সকলকেই—মরতে আমরা ভয় পাই না।'

—'আচ্ছা, দেখা যাক? ওরে, তোরা এই লোকগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে ফ্যাল। তারপর ওদের ঐ নদীতে ভাসিয়ে দে!'

প্রতিবাদ করলুম না—কারণ এই উন্মত্ত শয়তানদের কাছে প্রতিবাদ বা দয়া প্রার্থনা করে কোনই লাভ নেই।

তারা আমার ও কুমারের উপরে রাখলে বিনয়বাবু ও কমলের দেহ এবং

তার উপরে শোয়ালে মাল্কান ও রামহরিকে। তারপর লোকে যেমন করে চ্যালাকাঠের বোঝা বাঁধে, সেইভাবে দড়ি দিয়ে আমাদের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে ফেললে। আমাদের হাত-পা আগেই বাঁধা ছিল—এটা হল বাঁধনের উপর বাঁধন!

ভেবেছিলুম মাল্কান তো আমাদের মতন বিপদের পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করে নি, প্রাণের ভয়ে কাবু হয়ে সে হয়তো কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। কিন্তু এখন দেখছি তার সাড়ে ছয় ফুট উঁচু দেহটির সবটাই হচ্ছে দুর্জয় সাহসে পরিপূর্ণ। তার মুখ ভাবহীন, কণ্ঠে টুঁ শব্দ নেই।

ওরা সকলে মিলে ধরাধরি করে আমাদের নদীর ধারে নিয়ে গেল।

ছুন্-ছিউ বললে, 'এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি—বল, লকেট কোথায় রেখেছ?'

আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, 'আমাকে বার বার জ্বালাতন কোরো না ছুন্-ছিউ! লকেট আমাদের কাছে নেই।'

ছুন্-ছিউ বিস্ময়মাখা ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'এই বাঙালীটা আমাকে আশ্চর্য করলে যে! এ মরবে, তবু মিছে কথা বলতে ছাড়বে না!'

আমি বললুম, 'আমি সত্য কথাই বলছি।'

—'সত্য কথা? তুমি কি বলতে চাও, লকেট তোমার কাছে ছিল না?'

—'নিশ্চয়ই ছিল!'

—'তবে?'

—'লকেট এখন আমার কাছে নেই।'

—'মানে?'

—'মানে আমি জানি না।'

—'এই তোমার শেষ কথা?'

—'হুঁ।'

—'বেশ। তাহলে আমরাও আমাদের শেষ কাজ করি। ওদের জলে ফেলে দাও।'

তারা সকলে মিলে আমাদের শূন্যে তুলে ধরলে।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, 'হে বাবা বিশ্বনাথ, চরণে ঠাঁই দিও!'

পর-মুহূর্তে আমরা ঝপাং করে পড়লুম নদীর গর্ভে এবং সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলুম পাতালের শীতল অন্ধকারে।

১৩

আমাদের বাঘা

পাতলের দিকে তলিয়ে গেলুম এবং তারপর আবার ভেসে উঠলুম।—কেবল আমি নই, আমার সঙ্গে যারা বাঁধা ছিল তারাও ভেসে উঠল আমার সঙ্গেই। আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল হবার উপায় নেই।

আচ্ছন্নের মতন শুনতে পেলুম—কল্-কল্ কল্-কল্ করে গভীর জল গর্জন! কী তীব্র স্রোত—গতি তার প্রায় বন্যার মতন! জল টল্‌মল্ করে হেল্‌ছে দুল্‌ছে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ফুল ফুটিয়ে উপরে উঠছে, নীচে নামছে, ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে ফিরছে এবং শত সহস্র বল্লমের ফলকের মতন চক্‌চকিয়ে ছুটে যাচ্ছে হু-হু করে! সেই নিম্নমুখী গিরিনদীর গতি অত্যন্ত দ্রুত বলে আমরা তৎক্ষণাৎ আবার ডুবে গেলুম না—টানের মুখে ভেসে চললুম খানিক দূর। এজন্যে বিস্মিত হলাম না। অতি-বেগবতী নদী যে পাথরকে খানিক দূর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ-কথা সকলেই জানে।

তারপর আবার আমরা ডুবে গেলুম এবং জলের তলায় নিঃশ্বাস যখন বন্ধ হয়ে এসেছে, নদী আবার আমাদের উপরে ভাসিয়ে তুলল।

এবার ভেসে উঠেই দেখি, ঠিক আমাদের পাশেই সাঁতার কাটছে বাঘা! এতক্ষণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তুচ্ছ কুকুর ভেবে শত্রুরা হয় তাকে কিছু বলে নি, নয় সে নিরাপদ ব্যবধানে সরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছে। এখন প্রভুভক্ত বাঘা এসেছে আমাদের মৃত্যু-যাত্রার সাক্ষী হয়ে এবং আমাদের সঙ্গেই মরতে।

যে-কয় মুহূর্ত ভেসে থাকি, এর মধ্যেই সুন্দরী পৃথিবীকে ভালো করে শেষবার দেখে নিই! সূর্যের উপরে ঐ সেই নীলাকাশের চন্দ্রাতপ, তীরে তীরে ঐ সেই পাখি-ডাকা সবুজ বনভূমি, দূরে কাছে ঐ সেই গিরিরাজ হিমালয়ের স্তম্ভিত শৈল-তরঙ্গ! ভালো করে আরো কিছু দেখতে-না-দেখতেই আবার ডুবে গেলুম—কিন্তু আবার ভেসে উঠলুম পর মুহূর্তেই। এবার মনে হল, কে যেন আমাদের টেনে তুললে।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, বাঘা প্রাণপণে আমাদের বাঁধন-দড়ি কামড়ে ধরেছে!

বাঘা আর দড়ি ছাড়লে না—আমরাও আর ডুবলুম না।

আমাদের পাঁচজনকে টেনে তোলবার শক্তি নিশ্চয়ই বাঘার নেই। কিন্তু প্রথমত জলে গুরুভারও হয় লঘুভার এবং দ্বিতীয়ত এই খরস্রোতা নদীর তীব্র টান আমাদের ভাসিয়ে রাখবার পক্ষে সাহায্য করলে যথেষ্টই।

বাঁধন-দড়ি কামড়ে ধরে বাঘা নদীর তীরের দিকে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্রোতের টানে তার চেষ্টা সফল হল না। তবে সে কোনক্রমে জলের উপরে আমাদের ভাসিয়ে রাখলে। ধন্যবাদ, বাঘাকে ধন্যবাদ!

এতক্ষণ পরে কুমার কথা কইলে। বললে, 'বিমল বাঘা আজ যা করলে, অন্য কোন কুকুর তা করতে পারত না। কিন্তু এ-ভাবে বাঘা আর কতক্ষণ আমাদের ভাসিয়ে রাখবে? বাঘা জলচর জীব নয় আর একটু পরেই সে দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন যে মরণ ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই?''

—'আমিও সেই কথাই ভাবছি কুমার!'

বিনয়বাবু বললেন, 'শত্রুরা কি এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?'

আমিও বললুম, 'তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি।'

কমল উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'দেখ বিমলদা! বাঘার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। সে একটু একটু করে আমাদের তীরের খানিকটা কাছে এনে ফেলেছে!'

কমলের উৎসাহ দেখে এত দুঃখেও আমার হাসি এল।

আমাদের এই অবস্থায় তীরের খানিকটা কাছে আসা আর তীরে গিয়ে ওঠার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ!

এমন সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। নদীর গতি হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে উঠল—বোধহয় এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি নদীর তলাকার জমি সেখানে খুব বেশি ঢালু। যেদিকে চলেছি সেই দিকেই ছিল আমার মাথা, তাই ওদিককার কিছুই এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলুম না। আচম্বিতে ঘূর্ণায়মান স্রোতের টানে আমাদের একসঙ্গে বাঁধা দেহগুলো উল্টে ঘুরে গেল—প্রচণ্ড বেগে খানিকদূর ভেসে গিয়েই দেখি, তীর একেবারে আমাদের খুব কাছে সরে এসেছে!

বিনয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি—আমরা নদীর বাঁকে এসে পড়েছি!'

—সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেলুম এক বিষম আঘাত! অন্য সময় হলে সে আঘাতে রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়তুম, কিন্তু এখন আমরা অভিভূত হবারও অবকাশ পেলুম না—কারণ আমাদের দেহের উপরে লাগল কঠিন পাথুরেমাটির স্পর্শ! এ স্পর্শ যত কঠিনই হোক—এটা যে স্নেহময়ী পৃথিবীর মাটির ছোঁয়া, এই আশ্চর্য অনুভূতিই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে উন্মত্ত আনন্দে!

আমরা ঠেকে গিয়েছি নদীর বাঁকে! কেবলই তাই নয়, বাঁকের মুখে ছিল কি একটা জলজ লতা-পাতার ঘন জাল, দেহগুলোকে সে যেন জীবন্তেরই মতন জড়িয়ে ধরলে! স্রোত আর আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

রামহরি বলে উঠল, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ! একেই বলে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

কমল বললে, 'হায় রামহরি, তোমার কৃষ্ণ আমাদের রাখলেন বটে, কিন্তু বাঁধনগুলো খুলে দেবার ব্যবস্থা করলে না কেন?'

বাঘা তখন গলা পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ রবে গর্জন শুরু করলে!

আমাদের দিকে তাকিযে বাঘা এতটা চটে উঠল কেন?

পর-মুহূর্তেই এ প্রশ্নের উত্তর পেলুম।

হঠাৎ বাঘা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁধন-দড়িকে! এই দড়ির উপরেই তার রাগ হয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে এই দড়ির বাঁধনই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল!

কুমার তাকে উৎসাহ দিয়ে বারংবার বলতে লাগল, 'আমার সোনার বাঘা! আমার বন্ধু বাঘা! বাহাদুর বাঘা! কেটে দাও তো দড়িগুলো—চট্‌পট্‌ কেটে দাও তো ভাই!'

উৎসাহ পেয়ে বাঘার আনন্দ আর ধরে না, জয়পতাকার মতন তার লাঙ্গুল জলের উপর তুলে সে নাড়তে লাগল ঘন ঘন!

* * * *

স্বাধীন, আমরা স্বাধীন! বাঘার দৌলতে আমরা জলে ডুবে মরি নি, বাঘার অনুগ্রহে ঘুচল আমাদের বন্ধন দশা!

এতক্ষণ মাস্কান একটিমাত্র কথা কয় নি, সে হঠাৎ এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে বাঘাকে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরে অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে বললে, 'বন্ধু, আমার জীবন-রক্ষক বন্ধু!'

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, 'দেখছ কমলবাবু, কৃষ্ণ বাঁধন খুলে দিলেন কিনা? বাঘা সেই কৃষ্ণেরই জীব!'

কুমার বললে, 'ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে! দেখ বিমল, ছুন্‌-ছিউ চেয়েছিল আমাদের পাতালে পাঠাতে, কিন্তু আমরা এসে উঠেছি নদীর এপারে! আর সাঁকোর দরকার হল না!'

আমি বললুম, 'মাস্কান, আমরা "শা-লো-কা" মঠের কাছে এসে পড়েছি নয়?'

—'হ্যাঁ বাবুসাহেব, খুব কাছে।'

—'তাহলে আর দেরি নয়! ছুন্‌-ছিউ নদীর ওপারে সদল-বলে স্বদর্পে বিচরণ করুক, ইতিমধ্যে আমরা করব কার্যোদ্ধার!'

১৪

গুপ্ত গুহা

ইতিহাস-বিখ্যাত কপিশ-পাহাড়ের উপত্যকা। এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের পথের শেষে।

ধ্বংস স্তূপের পর ধ্বংস স্তূপ! প্রাচীন মঠের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে—এমন একখানা ভাঙাচোরা ঘরও নাই, যার ভিতরে মাথা গোঁজা যায়। সম্রাট কণিষ্ক এখানে যে সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, আজ তার সৌন্দর্যই উপভোগ করবার উপায় নেই। অতীতের ঐশ্বর্য অতীতের আড়ালেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

মঠের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু অষ্টদন্ত তিনপদ কুবের-মূর্তির কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বিনয়বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমি তো আগেই এ-কথা বলেছিলুম! দ্বিতীয় শতাব্দীর কণিষ্ক আর বিংশ শতাব্দীর আমরা! এর মধ্যে কত যুগ যুগান্তর চলে গিয়েছে—কত দস্যু, কত লোভী এখানে এসেছে, গুপ্তধনের এক কণাও আর পাওয়া যাবে না!'

আমার মন মুষড়ে পড়ল। তাহলে এতদিন ধরে আমরা দেখছিলুম আলেয়ার স্বপ্ন? আমাদের এত আগ্রহ, এত চেষ্টাশ্রম, এত বিপদভোগ, সবই হল ব্যর্থ?

মাল্কান বললে, 'বাবুসাহেব, এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে আর একটা ছোট ধ্বংস স্তূপ আছে। তার ভিতরে একটা ভাঙা মূর্তিও দেখেছিলুম বলে মনে হচ্ছে।'

কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়েই বললুম, 'যখন এতদূর এসেছি তখন সেখানেও না-হয় যাচ্ছি, কিন্তু আর কোন আশা আছে বলে মনে হয় না।'

কুমার ও কমল প্রভৃতি একেবারে গুম মেরে গেল। মাল্কানের পিছনে পিছনে আবার আমরা এগিয়ে চললুম বটে, কিন্তু সে যেন নিতান্ত জীবন্মৃতের মতনই।.....

মিনিট পনেরো পরে আমরা উপত্যকার শেষ প্রান্তে একটা জঙ্গল-ভরা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম! সেখানেও প্রায় আশী ফুট জায়গা জুড়ে একটা ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেল।

পরীক্ষা করে বুঝলুম, একসময়ে সেখানে একটা মাঝারি আকারের মন্দির ছিল—এখন কোথাও পড়ে আছে রাশীকৃত পাথর, কোথাও বা খোদাই করা থামের টুকরো এবং কোথাও বা ভাঙাচোরা মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। ধুক্‌ধুকির উপরকার লেখাটা বার বার স্মরণ করতে লাগলুম :—"শা-লো-কা : পশ্চিম দিক : ভাঙা মঠ : কুবের মূর্তি : গুপ্তগুহা।"

আমরা আগে যে ধ্বংসস্তূপে গিয়েছিলুম হয়তো সেইখানেই ছিল প্রাচীন শা-লো-কা মঠ। তারপর আমরা পশ্চিমদিকেই এসেছি বটে এবং এখানেও পেয়েছি একটা মঠ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু কোথায় কুবের-মূর্তি?

কুমার বললে, 'হয়তো আগে এখানে কুবেরের মূর্তি ছিল। এখন সেটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু গুপ্ত গুহাটাই বা কোথায়?'

এমন সময় বিনয়বাবু সাগ্রহে আমাদের নাম ধরে ডাক দিলেন—তিনি তখন এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে কি পরীক্ষা করছিলেন।

বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে কোমর পর্যন্ত ভাঙা একটা মূর্তি রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় অটুট অবস্থায় তার উচ্চতা ছিল অন্তত বারো ফুট। মূর্তির একখানা পা ভাঙা, তার তলায় রয়েছে একটা হাতখানেক উঁচু লম্বাটে বেদী।

বিনয়বাবু বেদীর উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না তার পরই লক্ষ্য করলুম, বেদীর উপরে মূর্তির অটুট পায়ের পাশেই রয়েছে পরে পরে আরো দুখানা পায়ের চিহ্ন! পা দুখানা অদৃশ্য হয়েছে বটে কিন্তু পায়ের ছাপ এখনো বর্তমান।

বিনয়বাবু বললেন, 'বিমল, এই তোমাদের কুবের মূর্তি! কুশ্রী কুবেরের অষ্টদন্ত মুখ আর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি মহাকালের প্রহারে নষ্ট হয়ে গেছে, প্রথম দৃষ্টিতে একখানার বেশি পদও নজরে পড়ে না বটে, কিন্তু পাথরের উপরে অন্য দুখানা পদের কিছু কিছু চিহ্ন আজও লুপ্ত হয়ে যায় নি। হ্যাঁ, এই তোমাদের কুবের-মূর্তি। বোঝা যাচ্ছে, ধুক্‌ধুকিতে মিছে কথা লেখা নেই। কিন্তু গুপ্তগুহা কোথায়?'

কমল বললে, 'সেটা যদি সহজে আবিষ্কার করা যেত, তাহলে তার নাম গুপ্তগুহা হত না।'

কমল ঠিক বলেছে কিন্তু কুবের-মূর্তি যখন পেয়েছি, তখন ধুক্‌ধুকির লিখনকে আর অবিশ্বাস করা চলে না। নবজাগ্রত উৎসাহে আমরা সকলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে গুহার সন্ধান করতে লাগলুম। জঙ্গল ভেঙে আনাচে কানাচে অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কিন্তু গুহার কোন অস্তিত্বই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

সকলে আবার নিরাশ মনে ভাঙা কুবের-মূর্তির পাশে এসে দাঁড়ালুম। ঘাটে এসে নৌকা ডুবল বোধহয়।

কুমার বললে, 'উপত্যকার শেষে ঐ যে পাহাড় রয়েছে, ওখানে গিয়ে একবার গুহার খোঁজ করে দেখব নাকি?'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমার বিশ্বাস, গুহা যদি থাকে, এই কুবের-মূর্তির কাছেই আছে। মন্দিরের সম্পত্তি মন্দিরের বাইরে থাকবে কেন?'

যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু বেদীর উপরে এই তো রয়েছে কুবের মূর্তি, তার আশপাশের অনেকখানি পর্যন্ত সমস্তটাই পাথর দিয়ে বাঁধানো—কারণ এটা হচ্ছে বিলুপ্ত মন্দিরের মেঝে। এখানে গুহা থাকবে কোথায়? খানিকক্ষণ ভেবেও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

কুমার হঠাৎ কৌতুকচ্ছলে কুবেরের পা টেনে ধরে বললে, 'হে কুবের, হে দেবতা। আমরা হচ্ছি টাকার—অর্থাৎ তোমার পরম ভক্ত! কোথায় তোমার ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছ প্রভু, দেখিয়ে দাও—দেখিয়ে দাও!'

হঠাৎ আমার মনে হল, কুবের-মূর্তি যেন নড়ে উঠে ডান দিকে একটু সরে গেল।

তাড়াতাড়ি মূর্তির পায়ের তলায় হেঁট হয়ে পড়ে দেখি, ধূলিধূসরিত বেদীর উপরে আধ ইঞ্চি চওড়া একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখা! মূর্তিটা যে একটু সরে গেছে, আর তার নীচেকার পরিষ্কার অংশটুকু বেরিয়ে পড়েছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, 'কুমার, কমল, রামহরি! এস, আমরা সবাই মিলে মূর্তিটাকে বাঁ দিক থেকে ঠেলা দিই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মূর্তির ভেতরে কোন রহস্য আছে?'

সকলে মিলে যেমন ঠেলা দেওয়া, ভাঙা মূর্তিটা হড়্-হড়্ করে প্রায় হাত-দুয়েক সরে গিয়ে আবার অটল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অবাক বিস্ময়ে দেখলুম, মূর্তির তলদেশেই আত্মপ্রকাশ করেছে একটি চতুষ্কোণ গর্ত এবং তার ভিতরে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে এক সার সংকীর্ণ সিঁড়ি। এই তাহলে গুপ্তগুহা?

কুমার আনন্দে মেতে বলে উঠল, 'আজ দেখছি আমাদের উপরে সব দেবতারই অসীম দয়া! রামহরির কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ বাঁচালেন, আর পাথরের কুবের আমাদের সামনে খুলে দিলেন তাঁর রত্ন-ভাণ্ডারের গুপ্তদ্বার! এখন দেখা যাক্, ভাণ্ডার পূর্ণ কিনা!'—বলেই সে গর্তের ভিতর পা বাড়িয়ে দিলে।

রামহরি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, 'ওগো কুমারবাবু, কোথা যাও? এখানে যকের ভয় আছে, সে-কথা কি ভুলে গেছ?'

আমি বললুম, 'থামো রামহরি, বাজে বোকো না। প্রায় দু-হাজার বছর ধ'রে

বেঁচে আছে, এমন ভূতের গল্প কোনদিন শুনি নি। বেঁচে থাকলেও সে এত বুড়ো হয়ে গেছে যে, আমাদের দুটো ঘুসিও সইতে পারবে না। চল সবাই গুহার মধ্যে।'

১৫

গুপ্তধন

সিঁড়ির পরেই মাটির তলায় মস্ত একটি ঘর—তার চারিদিকে পাথরের দেওয়াল! সে ঘরে অন্তত দুশো লোকের স্থান সংকুলান হতে পারে।

আমাদের সমস্ত মোটঘাট চুলোর দোরে পাঠিয়েছে ধ্বসে যাওয়া পাহাড় এবং আমাদের সঙ্গে যা-কিছু ছিল সমস্ত কেড়ে-কুড়ে নিয়েছে ছুন্-ছিউর দলবল। কেবল কমলের কাছে ছিল ছোট্ট একটি পকেট টর্চ, নদীর জলও তার শক্তি ক্ষয় করতে পারে নি।

সেইটেই চারিদিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিরেট অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দেখলুম, সেই প্রশস্ত গুহাগৃহের একদিকে রয়েছে তিনটে বড় বড় পাথরের সিন্ধুক—পুরাকালের এইরকম সিন্ধুক আমি কোন কোনও যাদুঘরে দেখেছি। প্রত্যেক সিন্ধুক প্রায় দুই হাত করে উঁচু ও চওড়া এবং পাঁচ হাত করে লম্বা। তার এক-একটার মধ্যে অনায়াসেই একজন লম্বা-চওড়া মানুষ শুয়ে থাকতে পারে।

রামহরি প্রথমটা ভুতের ভয়ে জড়োসড়ো হয়েছিল। এখন সিন্ধুক দেখে সমস্ত ভয় ভুলে তাড়াতাড়ি একটার ডালা তুলে ফেললে! অন্য দুটোর ডালা তুললে কুমার ও কমল।

তিনটে সিন্ধুকের ভিতরেই পাওয়া গেল কেবল ছোট-বড়-মাঝারি থালা ও অন্যান্য পাত্র।

বিনয়বাবু দু-চারখানা থালা পরীক্ষা করে বললে, 'অনেক কালের জিনিস, বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে এগুলো সোনার বাসন। নইলে এত সাবধানে গুপ্ত-গুহায় লুকিয়ে রাখা হত না।'

কমল চমৎকৃত স্বরে বললে, 'এত সোনার বাসন কোশন! না-জানি এর দাম কত হবে?'

বিমলবাবু বললেন, 'অনেক। কেবল এইগুলো বেচলেই আমরা লক্ষপতি হতে পারি। কিন্তু কেবল সোনার বাসন কেন কমল, পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এখানে আরো অনেক ধনরত্ন আছে।'

বিনয়বাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি 'টর্চে'র আলোটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে ফেলতেই দেখি, ঘরের আর এক কোণে সাজানো রয়েছে সারে সারে বড় বড় ঘড়া।

সবাই ছুটে সেই দিকে গেলুম। গুণে দেখলুম, প্রত্যেক সারে রয়েছে চারটে করে ঘড়া—এমনি পাঁচ সারে মোট কুড়িটা ঘড়া।

ব্যগ্রহস্তে সবাই ঘড়াগুলো তুলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। প্রথম তিন সারে প্রত্যেক ঘড়াই খালি। চতুর্থ সারের দুটো ঘড়া খালি ও দুটো ঘড়া তুলেই বোঝা গেল, তাদের মধ্যে কিছু আছে—সে দুটো রীতিমত ভারি।

আমি ও কুমার দুটো ঘড়াই তুলে মেঝের উপরে উপুড় করে দিলুম—ঝন্-ঝন্ ঝন্-ঝন্ রবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি গোল গোল চাক্‌তি।

একটা চাক্‌তি তুলে নিয়েই দেখি, মোহর! অনেক কালের পুরানো মোহর—খুব সম্ভব দু-হাজার বছর আগেকার।

পঞ্চম সারের প্রথম ও দ্বিতীয় ঘড়াও মোহরে মোহরে পরিপূর্ণ!

তৃতীয় ঘড়া থেকে বেরুলো যেন হুড়্-হুড়্ করে মুক্তা আর মুক্তার স্রোত! কোন মুক্তাই ছোট নয়, অনেক মুক্তাই পায়রার ডিমের মতন বড়। মেঝের উপরে মুক্তার স্তূপ। এত মুক্তা জীবনে এক জায়গায় দেখি নি।

চতুর্থ বা শেষ কলস মেঝের উপরে সৃষ্টি করলে রত্নের স্তূপ! তার মধ্যে না আছে কি—হীরা, চুণী, পান্না, পোখ্‌রাজ, পদ্মরাগ মণি—কত আর নাম করব? 'টর্চে'র আলোতে সেই সব অপূর্ব রত্ন জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলতে লাগল!

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আত্মহারার মতন দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ বাঘা চাপা গলায় গর্জন করে উঠল!

পরমুহূর্তে শুনলুম কাদের কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ! কারা যেন খট্‌খট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে!

কে ওরা? আবার ছুন্-ছিউর দল নাকি?

কিন্তু ভাববারও সময় নেই—আমরা নিরস্ত্র!

বললুম, 'শীগ্‌গির ঘরের দিকে চল! ঐ বড় বড় সিন্ধুকের পিছনে।'

সিন্ধুকের আড়ালে হুমড়ী খেয়ে আমরা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রইলুম! সমস্ত ঘর আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল! তা মশাল কিংবা লণ্ঠনের আলো, উঁকি মেরে দেখবার ভরসা হল না।

পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, ঘরের ভিতরে ঢুকল সাত-আট জন লোক!

একজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দী-ভাষায় বললে, 'বার্মুক্, তুমি ঠিক বলেছ! গুহার দরজা যখন খোলা, তখন সেই হতভাগা বাঙালীরা বেঁচে আছে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে! আশ্চর্য!'

—'ছুন্-ছিউ সাহেব, আমার চোখ ভুল দেখে না! আমি দূর থেকে চকিতের মতন দেখেছি, একটা পাহাড়ের আড়ালে তারা মিলিয়ে গেল!'

—'কিন্তু বদমাইসগুলো গেল কোথায়? আমাদের সাড়া পেয়ে কোথায় তারা গা-ঢাকা দিলে? গুহার ভেতরটা ভালো করে খুঁজে দেখ!'

দুই-তিনজনের পায়ের শব্দ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল! বুঝলুম, আর রক্ষে নেই! স্থির করলুম, শুধু হাতেই লড়তে লড়তে মরব—আত্মসমর্পণ করব না কিছুতেই!

হঠাৎ বার্মুকই বোধহয় বললে, 'ছুন্-ছিউ সাহেব! দেখ, দেখ, ওদিকে জ্বলে জ্বলে উঠছে কী ওগুলো?'

যে দিকে কলসগুলো ছিল সকলে সেই দিকেই দ্রুতপদে ছুটে গেল—তারপরই বিস্ময়পূর্ণ চীৎকার!

বার্মুক্ চেঁচিয়ে উঠল, 'আল্লা, আল্লা! এ-যে হীরা, মুক্তা, পান্না!'

তারপরেই গুহায় নামবার সিঁড়ির উপরে শোনা গেল আবার অনেক লোকের পায়ের শব্দ! নিশ্চয় গুহার ভিতরে আনন্দ-কলরব শুনে শত্রুদের দলের আরো অনেক লোক নীচে নেমে আসছে! আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই!

নতুন পায়ের শব্দগুলো এল ঘরের ভিতরে! পর-মুহূর্তে ছুন্-ছিউয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে জাগল ভীষণ গর্জন এবং তারপরেই বন্দুকের পর বন্দুকের কানফাটা আওয়াজ সেই বদ্ধ গুহাগৃহের ভিতরটা হয়ে উঠল ভয়াবহ! সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠের অভিশাপ ও আর্তনাদ, ধুপ্-ধাপ্ করে দেহপতনের শব্দ! মনে হল কারা যেন কাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধও করছে!

এ আবার কী কাণ্ড? কারা লড়ছে কাদের সঙ্গে? গুপ্তধনের লোভে শত্রুরা কি নিজেদের মধ্যেই মারামারি হানাহানি লাগিয়ে দিয়েছে? দেখবার জন্যে মনের ভিতরে জাগল বিষম কৌতূহল, কিন্তু মুখ বাড়াতে গিয়ে যদি শেষটা ধরা পড়ে যাই, সেই ভয়ে দমন করলুম সমস্ত কৌতূহল!

মিনিট-পাঁচেক ধরে চলল এমনি হুলুস্থুল কাণ্ড! তারপর বন্দুকের চীৎকার থামল—কেবল একাধিক কণ্ঠের আর্তনাদে সারা ঘরটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কাফির-ভাষায় কে একজন বললে, 'কৈ, বাবুরা তো এখানে নেই! মাল্কানও নেই!'

সিন্ধুকের পিছন থেকে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে মাল্কান আনন্দবিহ্বল স্বরে বললে, 'বাচিক্! কারুক্! গরক্! তোমরা?'

—'আরে, আরে, এই যে মাল্কান! বাবুরা কোথায়?'

মাল্কান আমাদের ডেকে বললে, 'বাবুসাহেব, বাবুসাহেব! আর ভয় নেই! আমাদের বন্ধুরা এসেছে!'

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাচিকদের মশালের আলোকে এমন এক বিষম রক্তরাঙা দৃশ্য দেখলুম যে, আমাদের কারুর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না!

সিঁড়ির দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাচিক্, কারুক্ ও গরক্ এবং তাদের আরো বিশ-বাইশজন সঙ্গী—অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। ঘরের মেঝের উপরে এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের দেহ—তাদের কেউ একেবারে নিস্পন্দ এবং কেউ বা করছে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্! ভূপতিত দেহের সংখ্যা এগারো—তার মধ্যে ছুন্-ছিউর দলের লোক ছিল সাতজন! সমস্ত দেহের চারিপাশ দিয়ে বইছে যেন রক্তের নদী—সে রক্ত-বিভীষিকা দেখে শিউরে উঠে কমল দুই হাতে চোখ ঢেকে অবশ হয়ে আবার বসে পড়ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাচিক্, তোমরা কি করে এখানে এলে?'

বাচিক্ সেলাম করে বললে, 'গুম্‌লী-বিবির হুকুমে বাবুসাহেব?'

—'তার মানে?'

—'গুম্‌লী-বিবি হুকুম দিয়েছে, যেমন করে-হোক শয়তানদের হাত থেকে বাবু সাহেবদের উদ্ধার করবার জন্যে। আপনারা কোন্ পথে কোথায় আসবেন আমরা জানতুম, তাই প্রস্তুত হয়েই দলবল নিয়ে এইদিকে ছুটে এসেছি!'

তখন আমার মনে পড়ল, আমরা যখন বিদায় নিই, গুম্‌লী বলেছিল : 'আপনারা আমার অতিথি, কিন্তু আপনাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনলুম আমিই।......কিন্তু সর্বদাই মনে রাখবেন বাবুজী, গুম্‌লীর দৃষ্টি রইল আপনাদের ওপরে!'

গুম্‌লী নিজের কথা রেখেছে। নইলে আমাদের মৃত দেহগুলো সকলের অজান্তে এই অন্ধকার গুপ্ত গুহার মধ্যেই মাংসহীন কঙ্কালে পরিণত হত। গুম্‌লীর উদ্দেশে করলুম মনে মনে নমস্কার। মহিয়সী নারী!

পায়ে পায়ে এগিয়ে দিয়ে দেখি, রত্নস্তূপের উপরে এগিয়ে পড়ে রয়েছে দুরাত্মা ছুন্-ছিউর রক্তাক্ত মৃতদেহ! তার দুদিকে ছড়িয়ে পড়া দুই হাতের এক মুঠার ভিতরে মুক্তারাশি এবং আর এক মুঠার মধ্যে হীরা-চুনী-পান্না! তার দুই চক্ষু ও মুখবিবর খোলা—স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মৌন ভাষায় সে যেন বলতে চায়—'বাঙালীবাবু, আমারই জয় জয়কার, গুপ্তধন লুণ্ঠন করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—গুপ্তধন নিয়েই চললুম আমি পৃথিবী ছেড়ে!'

—ঃ শেষ ঃ—

দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন

১

শৈশব ও কৈশোর

মহাভারতের কবি বলেন, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন মাতৃজঠরে।

একালের কবি আর-একটি ছেলের সম্বন্ধেও ও-কথা বলেন নি বটে, কিন্তু তারও পিতা ছিলেন বীরপুরুষ ও মাতা ছিলেন বীরনারী এবং তিনিও যখন মাতৃগর্ভে বাস করতেন তখন তাঁর মাতা বিচরণ করতেন রণক্ষেত্রে—পাশে নিয়ে অস্ত্রধারী স্বামীকে।

শত্রু আক্রমণ করেছে তাঁদের স্বদেশকে এবং শত্রু হয়েছে বিজয়ী। গভীর অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে, নদী, প্রান্তর, পর্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা, অতিক্রম করে হাজার হাজার পলাতকের সঙ্গে তাঁরাও চলেছেন শ্রান্তপদে কিন্তু দৃপ্তমনে দূরে—দূরে—আরো দূরে—বহু দূরে! পিছন থেকে ভেসে আসছে গুরু গুরু মেঘগর্জনের মতন ঘন ঘন কামান-তর্জন—মাঝে মাঝে কানের পাশ দিয়ে সশব্দে বাতাস কেটে ছুটে ছুটে যাচ্ছে বন্দুকের প্রতপ্ত গুলি।

১৭৬৯ খৃস্টাব্দ। ফরাসীরা কর্সিকা-দ্বীপ দখল করলে জুলাই মাসে। পরাজিত কর্সিকা-বাসীদের দুঃখের সীমা নেই।

কিন্তু ঠিক পরের মাসেই—১৫ আগস্ট তারিখে কর্সিকার বীরনারী লেটিজিয়ার গর্ভ থেকে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর আলোকে প্রথম চোখ মেললে, পিতা-মাতার পরাজয়-বেদনার প্রতিশোধ নেবার ভার পড়ল তারই উপরে। আজ যারা জয় করে প্রভু হতে এসেছে, তাদেরই জয় করে সর্বশক্তিমান প্রভু হবে এই পুত্র।

ছেলের নাম হল নেপোলিয়ন। আজ ত্রিশলক্ষ ফরাসী সৈনিকের ঘৃণ্য তরবারির রক্তধারার তলায় অজানা গৃহকোণে যার জন্ম, কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল—সমগ্র ফরাসী-দেশ তারই পদতলে নিশ্চেষ্টভাবে নতশির।

নেপোলিয়ন হচ্ছে ইতালীয় নাম। ইতালীর ইতিহাসে এই নামের প্রথম অধিকারী বহু শতাব্দী পূর্বেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ষোলো শতাব্দীতে তাঁর বংশধররা উঠে আসেন কর্সিকায়। এবং তাঁদের বংশ পরিচিত হয় 'বোনাপার্ট' নামে।

নেপোলিয়নের বাবার নাম কার্লো বোনাপার্ট ও মায়ের নাম লেটিজিয়া র‍্যামোলিনো। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম বলে কার্লো যখন ইতালীতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন, লোকে তখন তাঁকে কাউন্ট বোনাপার্ট বলে ডাকত। কিন্তু তিনি ছিলেন ভারি বেপরোয়া খরুচে—একবার একটিমাত্র ভোজ দিয়েই তিনি তাঁর

দুই বছরের আয় খরচ করে ফেলতে কুণ্ঠিত হন নি! সুতরাং এমন লোকের দ্বারা ভালোভাবে সংসার-চালনা করা সম্ভব নয়।

কার্লোর পেশা ছিল ওকালতি, কিন্তু তাঁর বাড়িতে মক্কেলদের দেখা খুব বেশি পাওয়া যেত না। তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন—যদিও বিখ্যাত হতে পারেন নি। নেপোলিয়নও প্রথম বয়সে বাপের শেষ-গুণের অধিকারী হয়ে কিছু কিছু লেখনীচালনা করেছিলেন। তাঁর লেখা ছোটগল্প ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একখানি নভেলেও তিনি হাত দিয়েছিলেন।

কার্লো বোনাপার্টের পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে। জোসেফ (জন্ম ১৭৬৮), নেপোলিয়ন (১৭৬৯), লুসিয়েন্ (১৭৭৫), লুইস্ (১৭৭৮) ও জেরোম্ (১৭৮৪) এবং ক্যারোলিন, এলাইজ ও পলিন্।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে, সংসারটি বড় সামান্য নয়। বে-হিসেবী কর্তার উপরে নির্ভর করলে এ সংসার হত একেবারেই অচল। কিন্তু নেপোলিয়নের এক খুড়ো ছিলেন, তিনি ধর্মযাজক। সংসারের কতক কতক ব্যয়ভার বহন করতেন তিনিও।

নেপোলিয়নের মা লেটিজিয়া কেবল যে বুদ্ধিমতী ছিলেন, তা নয়; যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে চারিদিক গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার চালাবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর যথেষ্ট। এবং মেজো নেপোলিয়ন ও সব-ছোট মেয়ে পলিন্‌কে তিনি অন্য সব ছেলে-মেয়ের চেয়ে ভালোবাসতেন বেশি।

শিশু-বয়স থেকেই নেপোলিয়ন ছিলেন অত্যন্ত একগুঁয়ে বা একরোখা ছেলে। কিছুতেই ভয় পেতেন না, কারুকেই ভয় করতেন না। বড় কম ঝগ্‌ড়াটেও ছিলেন না। কারুকে ঘুসি মারতেন, কারুকে দিতেন আঁচড়ে বা কাম্‌ড়ে। তাঁর হাতে পড়ে দাদা জোসেফকেই হতে হত সবচেয়ে বেশি নাকাল। দাদাকে একচোট মেরে-ধরে তিনিই আবার আগে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে করতেন দাদার নামে নালিশ; ফলে জোসেফ বেচারাকে মায়ের হাতেও আর একদফা লাভ করতে হত উত্তম-মধ্যম।

কিন্তু নেপোলিয়নের প্রকৃতি বন্য হলেও তিনি তাঁর মায়ের একান্ত বশীভূত ছিলেন। এবং সেই ছেলেবয়সে দৃঢ়চরিত্র মায়ের কাছ থেকে যে-সব সৎশিক্ষা পেয়েছিলেন তাই-ই যে তাঁর বিচিত্র ও অভাবিত ভবিষ্যৎ-জীবনকে গঠন করে তুলেছিল, এ-কথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

প্রথম থেকেই এই ছোট্ট ছেলেটিকে কর্সিকার সকলেই অসাধারণ বলে মনে করত। তুঙ্গ গিরিশিখর, সুগভীর পার্বত্য খাত বা নির্জন গহন অরণ্য দেখে তিনি একটুও শঙ্কিত হতেন না। দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য পর্যন্ত ছিল তাঁর নখদর্পণে।

এবং নিজের জন্মভূমিকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন। বহুকাল পরে

ফ্রান্সের সম্রাট ও য়ুরোপের সর্বেসর্বা হয়েও তিনি আত্মচরিতে লিখেছিলেন : "পৃথিবীর সকল জায়গার চেয়ে কর্সিকার যা-কিছু সব ভালো—এমন-কি তার মাটির গন্ধটুকু পর্যন্ত। আজও চোখ মুদে সে গন্ধ আমি পাই—এমন গন্ধ আর কোথাও নেই। আজও আমি কল্পনায় নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই সেই সুমধুর শৈশব-দিবসে—সেই খাড়া পর্বতমালার মধ্যে, সেই তুঙ্গ শিখরশ্রেণীর উপরে, সেই গভীরতম খাতের অতলে!"

সৈনিক জীবনের দিকে তাঁর প্রাণের টান ছিল এতটুকু বয়স থেকেই। বাড়ির কাছ দিয়ে যখন ফৌজের সৈনিকরা আসা-যাওয়া করত, তিনি বিপুল আগ্রহে ছুটে তাদের দেখতে যেতেন। তাঁর সব-চেয়ে সখের খেলা ছিল পুতুল-সেপাইদের নিয়ে। তিনি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী হবেন, সেটাও তাঁর শিশু-বয়স থেকেই বোঝা গিয়েছিল। তাঁর আর সব ভাইবোনরা যখন তুচ্ছ খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকত, তখন তিনি একলা বসে ঘরের দেওয়ালে করতেন অঙ্কের রেখাপাত।

নেপোলিয়নের দুষ্টুমির আর একটি গল্প শোনো।

তাঁর বুড়ি ঠাকুমা যখন বয়সের ভারে ভেঙে দুম্‌ড়ে পড়েছেন, তখন নেপোলিয়ন ও তাঁর ছোট বোন পলিন্ ঠাকুমাকে ঠাট্টা করে তাঁর চলা-ফেরার অনুকরণ করতেন। একদিন ঠাকুমা হঠাৎ নাতি-নাতনীর কীর্তি দেখে ফেলে তাঁদের মায়ের কাছে নালিশ করে বললেন "বৌমা, তুমি ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে জানো না, তাদের অসভ্য করে তুলছ! ওরা গুরুজনদের প্রতি সম্মান দেখাতে শেখে নি।"

মা লেটিজিয়া তাঁর এই ডানপিটে ছেলে-মেয়ে দুটিকে যতই ভালোবাসুন, তাদের কোন অন্যায়কেই ক্ষমা করবার পাত্রী ছিলেন না। পলিনের পিঠে তখনই পড়ল চটাপট্ চড়-চাপড়! কিন্তু চালাক নেপোলিয়ন দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন, মা কিছুতেই তাঁকে হাতের কাছে পেলেন না। দু-চার দিন গেল। নেপোলিয়ন ভাবলেন, মা ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছেন।

তারপর একদিন মা বললেন, "নেপোলিয়ন, আজ লাটের বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ। যাও, পোশাক পরে এস।"

নেপোলিয়ন খুব খুশি হয়ে পোশাক পরবার জন্যে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। খানিক পরেই দেখা গেল, মা সেই ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায় পিঠ রেখে। মায়ের গম্ভীর মুখ দেখেই নেপোলিয়ন বুঝলেন, তিনি ফাঁদে পড়েছেন—পালাবার পথ বন্ধ! তারপর তাঁর যথাস্থানে পড়ল সপাসপ্ বেতের ঘা! মা কিছুই ভোলেন নি—মনের রাগ মনের মধ্যেই পুষে রেখে দিয়েছিলেন!

কার্লো দেখলেন, তাঁর ছেলে নেপোলিয়নের সৈনিক-জীবনের দিকেই বেশি

ঝোঁক। তিনি স্থির করলেন এ ছেলেটিকে সামরিক-বিদ্যালয়েই ভর্তি করে দেওয়া উচিত। বড় ছেলে জোসেফ নির্বিরোধী ভালোমানুষ, অতএব তাকে পুরুতের কাজেই মানাবে ভালো।

ছেলেদুটিকে নিয়ে কার্লো প্যারি শহরে গিয়ে রাজা লুইয়ের কাছে নিজের আবেদন জানালেন এবং তাঁর আবেদন মঞ্জুরও হল। এই হল নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তি। পিতার তীক্ষ্ণবুদ্ধিই করলে এই ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা।

সম্ভ্রান্তবংশজাত বলে নেপোলিয়ন ফরাসীদেশের সম্ভ্রান্তদের ইস্কুলে ঠাঁই পেলেন। কিন্তু তিনি ফরাসী ভাষা জানতেন না। তাই আগে তাঁকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হল। তাঁর বয়স তখন এগারোর বেশি নয় (১৭৭৯ খৃ.)।

স্বভাবত মৌন ও নির্জনতাপ্রিয় নেপোলিয়ন, ইস্কুল-সংলগ্ন বাগানের একটি প্রান্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে সেইখানে বসেই নিজের মনে লেখাপড়া করেন। যে-জমিটুকু তিনি ঘিরে নিয়েছিলেন, তার সবটাই তাঁর নিজের নয়। কিন্তু আর কেউ সেই বেড়ার ভিতরে ঢুকলেই আর রক্ষা নেই—নেপোলিয়নের হাতে বেদম মার খেয়ে পালিয়ে আসা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

শিক্ষকরা শাস্তির ব্যবস্থা করেও এ-বিষয়ে নেপোলিয়নকে রাজি করাতে পারলেন না। 'শিক্ষক হোক্, সহপাঠী হোক—আমার বেড়ার ভিতরে সকলেরই প্রবেশ নিষেধ!'

একজন শিক্ষক বললেন, "ছেলেটি দেখছি গ্রানাইট পাথরে গড়া। এর ভিতরে আছে আগ্নেয়গিরি।"

সে-ইস্কুলে পড়ত ফ্রান্সের যত-সব উপাধিধারী বড় ঘরের ছেলে। তারা গা-টেপাটেপি করে বলাবলি করত—"এ কোথাকার বিদেশী পাড়াগেঁয়ে ভূত রে! ও কী অদ্ভুত বেঁটে আর ওর নামটাও কি বেয়াড়া! ওর জামাটা কি-রকম লম্বা ঝল্‌ঝলে দেখেছিস্? ছোক্‌রা হাত-খরচাও পায় না—অথচ বলতে চায় ও নাকি বনেদী বংশের ছেলে! ক্ষুদে দ্বীপ কর্সিকার বনেদী বংশ! ওরে ভাই, বন-গাঁয়ের শেয়াল-রাজা!"

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করত, "তোমাদের কর্সিকার লোকরা যদি এতই বীর, তাহলে তারা আমাদের ফরাসী সৈন্যদের মারের চোটে নাকাল হয়ে হার মানলে কেন?"

ক্রুদ্ধ নেপোলিয়ন জবাব দিতেন, "দশজনের বিরুদ্ধে একজন কতদিন দাঁড়াতে পারে? সবুর কর, আমি বড় হই, তারপর ফরাসীদের দর্পচূর্ণ করব।"

বালক নেপোলিয়ন দেশে পিতাকে চিঠি লিখে জানালেন, "আমার দারিদ্র্যের জন্যে জবাবদিহি করতে করতে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এই-সব বিদেশী

ছোক্‌রার ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে দিন-রাত। এদের একমাত্র শ্রেষ্ঠতা হচ্ছে টাকার দেমাকের জন্যে; মনের আভিজাত্যে এরা আমার চেয়ে ঢের নীচে। এই স্বর্ণবাহী গর্দভদের সামনে আর কতকাল আপনি আমাকে মাথা হেঁট করে থাকতে বলেন?"

বালকের মুখে প্রৌঢ়ের উক্তি শুনে পিতা হয়তো বিস্মিত হলেন। কিন্তু উত্তরে লিখলেন : "আমাদের টাকা নেই, আমরা গরীব। তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে।"

নেপোলিয়নকে পাঁচটি বছর ওখানেই থাকতে হল।

কিন্তু তাঁকে নিয়ে তাঁর সহপাঠীরা যতই রঙ্গব্যঙ্গ ও ঘৃণা জাহির করুক, তাঁর সুদৃঢ় চরিত্র ও মানসিক শক্তির প্রভাবে তারা সকলেই অভিভূত না হয়ে পারলে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নেপোলিয়ন হতেন দলের সর্দার এবং তারা করত তাঁর হুকুম তামিল। এমন-কি, শিক্ষকরা পর্যন্ত তাঁকে বশ মানাতে পারতেন না।

একবার সামান্য কি-একটা দোষের জন্যে জনৈক শিক্ষক বললেন, "বোনাপার্ট, নতজানু হয়ে বোসো। নতজানু হয়েই আজ তোমাকে 'ডিনার' খেতে হবে।"

নেপোলিয়ন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "মাস্টারমশাই, যদি দরকার হয় আমি এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই 'ডিনার' খাব। কিন্তু আমি নতজানু হব না! কারণ আমাদের পরিবারের কেউ ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর সামনে নতজানু হয় না।"

শিক্ষক গায়ের জোরে তাঁকে নতজানু করতে গেলেন। বিষম ক্রোধে নেপোলিয়ন চীৎকার করে উঠলেন, তারপর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটির উপরে। বলা বাহুল্য, এর পরে আর কেউ তাঁকে নতজানু করবার চেষ্টা করলেন না।

নেপোলিয়নের প্রথম যুদ্ধে হাতে-খড়ি হয় এইখানেই। যদিও এ যুদ্ধ আসল নয়, নকল। একবার শীতকালে বরফে চারিদিক আচ্ছন্ন। ইস্কুলের ছেলেরা স্থির করলে, বরফ দিয়ে কেল্লা ও গড়খাই প্রভৃতি গড়ে কৃত্রিম যুদ্ধের অনুষ্ঠান করতে হবে। এক পক্ষ করবে কেল্লা রক্ষা, আর এক পক্ষ করবে আক্রমণ। নেপোলিয়ন কখনো এ-দলের, কখনো ও-দলের হয়ে লড়তেন; বলা বাহুল্য নেতা রূপেই। এবং যে-দলে তিনি থাকতেন, বরাবরই জয়ী হত সেই দল। কিন্তু এ যুদ্ধক্রীড়া বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। কারণ ছেলেরা প্রথম-প্রথম বরফের নরম গোলা ছুঁড়েই খুশি হত, তারপর বরফের গোলার ভিতরে পাথর ভরে দিতে শুরু করলে। মিথ্যা যুদ্ধে ছেলেরা যখন সত্য-সত্যই আহত হতে লাগল, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তখন এই বিপদ্‌জনক খেলা বন্ধ করে দিলেন।

একবার মা লেটিজিয়া নেপোলিয়নকে দেখতে এসে চিনতে পারলেন না।

ভাবলেন, ভুল করে তাঁর ছেলে বলে অন্য কারুকে ডেকে আনা হয়েছে! কেবল নির্দিষ্ট পাঠের সময়ে নয়, ছুটির সময়েও নেপোলিয়ন লেখাপড়া নিয়ে এমন ভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকতেন যে, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একেবারেই নজর দিতে পারতেন না। দিনে যা পড়তেন, সারারাত জেগে তাই নিয়ে চিন্তা করতেন। ফলে ক্লাসে সর্বদাই তিনি প্রথম হতেন বটে, কিন্তু তাঁর চেহারা হয়ে গিয়েছিল একেবারে শীর্ণ-বিশীর্ণ।

২

প্রথম রক্তের স্বাদ

পনেরো কি ষোলো বছর বয়সে নেপোলিয়ন পেলেন দ্বিতীয় লেফ্‌টেনান্টের পদ। অর্থাৎ সামরিক জীবনের প্রথম ধাপে পা দিয়েই তিনি হলেন একটি ছোটখাটো কর্তা।

এই পদলাভের জন্যে পরীক্ষায় তিনি সুখ্যাতির সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং পরীক্ষকরা তাঁর সম্বন্ধে যে মতপ্রকাশ করেছিলেন তা হচ্ছে এই : "সংযতবাক, উদ্যমশীল। গল্পগুজবের চেয়ে বই পড়তে ভালোবাসে। নির্জনতাপ্রিয়, উদ্ধত, অত্যন্ত অহঙ্কারী। কথাবার্তা কম কয় বটে, কিন্তু অল্প যে কথা বলে তা খুব চোখা চোখা ও অতিশয় যুক্তিপূর্ণ। যথেষ্ট আত্মানুরাগ ও প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা।"

ভ্যালেন্স শহরে গিয়ে নেপোলিয়ন নিজের পল্টনে যোগদান করলেন।

তাঁর ধনী সহতীর্থরা এখানে এসে নাচে-গানে ও আমোদপ্রমোদে কাল কাটাতে লাগল। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যে নেপোলিয়নের পক্ষে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না এবং তিনিও ছিলেন বাজে আমোদ-আহ্লাদের অত্যন্ত বিরোধী।

এখানেও তাঁর প্রধান বন্ধু হল, পুস্তক। কোন্ কোন্ শ্রেণীর বই তিনি পড়তেন? গ্রীস, পারস্য, রোম, চীন, ভারতবর্ষ, মিশর ও প্রাচীন আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতির বিবরণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, আবহ-বিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা। বড় বড় বীরের জীবনচরিত। শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকদের রচনা প্রভৃতি।

এ-সময়েও ফরাসীজাতির উপরে ছিল তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা। কর্সিকাকেই তিনি স্বদেশ মনে করতেন এবং ভালোবাসতেন কেবল কর্সিকাকেই। এবং সর্বদাই ভাবতেন, ফরাসীদের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিঁড়ে কেমন করে কর্সিকাকে স্বাধীন করা যায়!

নেপোলিয়ন যখন পড়তে বসতেন, তখন কেতাবের পাতার উপরে কেবল

চোখ বুলিয়ে যেতেন না। যা পড়তেন তার ভিতর থেকে দরকারি অংশগুলি 'কপি-বুকে' টুকে রাখতেন। এই-সব 'কপি-বুক' সযত্নে ছাপিয়ে রক্ষা করা হয়েছে। তাদের মোট মুদ্রিত পত্রসংখ্যা চারিশত। সর্বশেষ 'কপি-বুকে'র সর্বশেষে তরুণ যুবক নেপোলিয়ন স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখে রেখেছিলেন : **"সেন্ট হেলেনা, আটলান্টিক মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইংরেজদের উপনিবেশ।"**

নিজের শেষ-জীবনের শোচনীয় পরিণামের নিষ্ঠুর ইঙ্গিত সেই বয়সেই কি নেপোলিয়নের মনে জেগে উঠেছিল? না নেপোলিয়নের অজ্ঞাতসারে, তাঁরই হাত দিয়ে, নিয়তি নিজে লিখে রেখেছিল ঐ কথাগুলি?

নেপোলিয়নের উপার্জন এত সামান্য ছিল যে, ভালো করে খাওয়া-পরাও তাঁর ভাগ্যে জুটত না। মনের মধ্যে দুর্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা—দিবাস্বপ্নে সর্বদাই নিজেকে মনে করেন মানবদের মধ্যে প্রধান এবং এটাও অনুভব করেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ হবার শক্তিও তাঁর আছে—অথচ সামনে দেখেন নিরন্ধ্র অন্ধকার! মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে তাঁর আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়!

এমনি দুঃসময়ে তাঁর পিতার মৃত্যু হল (১৭৮৫ খৃ.)। তিনি ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন। একবৎসর দেশে থেকে আবার যখন কার্যক্ষেত্রে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মন আরো ভেঙে পড়েছে। দরিদ্র পরিবার, পোষ্য অনেক—সকলেরই মুখে অভাবের হাহাকার। দাদা জোসেফ বয়সেই বড়, নেপোলিয়নকেই কর্তা বলে মনে করেন। অথচ তাঁর মাহিনা এত কম যে, নিজেরই হাত-খরচ পোষায় না। আত্মহত্যার ইচ্ছা আবার প্রবল হয়ে ওঠে!

এমনি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে আরো কিছুকাল কেটে যায়। তারপরেই এল ভাগ্য-পরিবর্তনের যুগ! ফ্রান্সে বেজে উঠল বিপ্লবের তূর্য! জনতার কবলে পড়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিলে বাস্তিলের দুর্গ-কারাগার, প্যারির রাজপথ দিয়ে রক্তাক্ত অস্ত্র হাতে করে ছুটতে লাগল উন্মত্ত নর-নারী, রাজা ও রানী তখনো বন্দী হলেন না বটে, কিন্তু লুপ্ত হল তাঁদের রাজমর্যাদা!

নেপোলিয়ন ভাবলেন কর্সিকাকে স্বাধীন করবার মস্ত সুযোগ এসেছে। আবার তিনি ছুটি না নিয়েই স্বদেশে গিয়ে হাজির। একদল বিদ্রোহী তাঁর চারিপাশে এসে জড়ো হল। যৌবনের উত্তেজনায় চিন্তাশীল ব্যক্তিও আপনাকে ভুলে যায়। ফ্রান্সের বিপুল রাজশক্তির বিরুদ্ধে একদল বিদ্রোহী যে মাতঙ্গের সামনে পতঙ্গের মতই তুচ্ছ, নেপোলিয়ন সেটা বোঝবারও চেষ্টা করলেন না। বিদ্রোহীদের সঙ্গে তিনি একটি দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে খুব সহজেই পরাজিত হলেন।

ফ্রান্সে রাজবিদ্রোহী বলে নেপোলিয়নের নামে অভিযোগ এল। তাঁর চারিদিকে অন্ধকার আরো নিবিড় হয়ে উঠল। এখন তাঁর টাকাও নেই, পদমর্যাদাও নেই। যে-

কোন মুহূর্তে তিনি কাগারারে বন্ধ হতে পারেন। তিনি ফ্রান্সের বিপ্লববাদী রবেস্-পিয়েরের দলে গিয়ে ভিড়লেন। রাজশক্তির পতন না হলে আর তাঁর রক্ষা নেই।

মাহিনা বন্ধ, পেট চলে না। ঘড়ি বাঁধা পড়ল। গরিব হলেও এতদিন তিনি ধার করেন নি, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এইবার তাঁকে ধার করতেও হল।

তারপর রাজশক্তির পতন। রাজা ও রানী বন্দী, ফ্রান্সের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হলেন বিপ্লববাদীরা। সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের পদোন্নতি। তিনি এখন কাপ্তেন।

কিন্তু তখনো ফরাসী ফৌজের জন্যে নেপোলিয়নের এতটুকু মাথাব্যথা ছিল না। য়ুরোপের রাজা-রাজড়ারা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন, সেজন্যে তিনি বিচলিত হলেন না। ফরাসীরা আমার কে? আমার স্বদেশ কর্সিকা।

কর্সিকাবাসীদের প্রধান নেতা তখন পাওলী। তিনি ফরাসীদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করলেন। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে কাপ্তেন নেপোলিয়ন গেলেন পাওলীকে পাধা দিতে। কিন্তু রণক্ষেত্রে তাঁর দ্বিতীয় অভিযানও সফল হল না।

কর্সিকার সমস্ত বাসিন্দা নেপোলিয়ন ও তাঁর পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। স্বদেশে দেশদ্রোহী নাম কিনে মা-ভাই-বোনকে নিয়ে নেপোলিয়নকে পালিয়ে আসতে হল ফ্রান্সে। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর।

ফরাসীরা তাঁকে ভাবে বিদেশী। কর্সিকার লোকরা তাঁকে ঘৃণা করে ফরাসী বলে। তিনি মনে করেন, আমার স্বদেশ নেই। দুই-দুইবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ এখনো অন্ধকার।

কেবল তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশেও তখন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল অন্ধকার। বেলজিয়ামে ফ্রান্সের প্রভুত্ব বিলুপ্ত; স্পানিয়ার্ডরা ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে আসছে; রাজতন্ত্রের পক্ষপাতীরা ধীরে ধীরে আবার প্রবল হয়ে উঠছে—এমন-কি তারা ফ্রান্সের বিখ্যাত নগর ও বন্দর টুলনকেও ইংরেজ ও স্পানিয়ার্ডদের হাতে তুলে দিয়েছে!

প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে টুলনকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে প্রথমে একজন সৌখীন সেনাপতিকে নিযুক্ত করা হল—আগে ছিলেন তিনি চিত্রকর। যুদ্ধবিদ্যার কোনই ধার ধারতেন না, এমন জায়গায় কামান বসান, যার গোলা টুলন শহর পর্যন্ত পৌঁছয় না।

কাপ্তেন নেপোলিয়ন সেনাপতিকে তাঁর ভুল দেখিয়ে দিলেন এবং এ-ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতিতে আক্রমণ করা উচিত, তাও বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তবু সেনাপতির টনক নড়ল না।

নেপোলিয়ন প্যারিতে প্রজাতন্ত্রের কর্ণধারদের কাছে অভিযোগ করলেন।

তখন ফ্রান্সের উপরে ম্যাক্সিমিলিয়েন রবেস্‌পিয়েরের অবাধ প্রভুত্ব এবং তাঁর ছোট ভাই ছিলেন নেপোলিয়নের বন্ধু। কাজেই নেপোলিয়নের অভিযোগ ব্যর্থ হল না।

নতুন এক সেনাপতি এলেন। ইনিও সৌখীন যোদ্ধা, আগে করতেন ডাক্তারি। এঁকে পেয়েও নেপোলিয়নের সুবিধা হল না। যথাস্থানে আবার অভিযোগ গেল এবং আবার হল সেনাপতি-বদল। এবারে যিনি বড়কর্তা হয়ে এলেন তাঁর নাম দুগোমিয়ার, তিনি হচ্ছেন সত্যিকার যুদ্ধব্যবসায়ী। তিনি নেপোলিয়নের যুক্তি শুনে তাঁর গুণ বুঝলেন এবং সায় দিলেন তাঁর মতেই।

কার্যক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেয়ে নেপোলিয়ন নিজের ইচ্ছা অনুসারেই কামান সাজাতে লাগলেন এবং সর্বপ্রথমে বন্দী করলেন একজন ইংরেজ জেনারেলকে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পদোন্নতি। তিনি এখন কর্নেল।

নেপোলিয়ন বুঝলেন, এতদিন পরে তাঁর যুদ্ধপ্রতিভার পরিচয় দেবার মস্ত সুযোগ এসেছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে ভবিষ্যতের সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর হয়ে যাবে। রীতিমত মাথা খাটিয়ে তিনি আক্রমণের ফন্দি আঁটতে লাগলেন।

টুলন নগর অবরুদ্ধ হয়েও বিশেষ বিপদে পড়ে নি—কারণ টুলনের অনতিদূরে সমুদ্রে নোঙর ফেলেছিল ইংরেজ নৌবহর, সেখান থেকে শহরের মধ্যে এসে থানা পেতেছিল ইংরেজ ও স্পানিয়ার্ডরা। ফরাসীরা গোলাবৃষ্টি করেও তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে নি।

নেপোলিয়ন বুঝলেন সরাসরি হানা দিয়ে নগর দখল করা সহজ কাজ নয়। তিনি তখন এমন একটি জায়গা বেছে নিলেন, যেখান থেকে ইংরেজ নৌবহরের উপরে সহজেই গোলাবৃষ্টি করা যায়। সাধারণ 'প্ল্যান', কিন্তু তার কার্যকারিতা অসাধারণ। কারণ ইংরেজ নৌবহর স্থল থেকে আক্রান্ত হলে পলায়ন করবেই এবং তাহলেই দুর্গ থেকে কেবল ইংরেজ ও স্পানিয়ার্ড সৈন্যদের পলায়নের পথই রুদ্ধ হবে না, বাহির থেকেও দুর্গে সৈন্যসাহায্য এবং রসদ প্রভৃতির যোগান দেবার পথ বন্ধ হবে। তখন নগর দখল করা হবে অত্যন্ত সহজসাধ্য!

আট-ঘাট বেঁধে নেপোলিয়ন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তিনি যে-জায়গাটি বেছে নিলেন, তা আক্রমণ ও দখল করা হল। তারপর ইংরেজ নৌবহরের উপরে ক্রমাগত পড়তে লাগল ফরাসী কামানের আগুন-রাঙা গোলা!

ব্যাপার দেখে টুলনে অবরুদ্ধ ইংরেজ ও স্পানিয়ার্ডদের চক্ষু স্থির আর কি! নগর থেকে বেরুবার পথ বন্ধ হলেই তো সর্বনাশ! ফরাসীরা তারপর কলে-পড়া ইঁদুরের মতন তাঁদের ধরবে আর টিপে মারবে! তাড়াতাড়ি পাত্‌তাড়ি

গুটিয়ে তাঁরা দিলেন শহর ছেড়ে লম্বা! ইংরেজ জাহাজগুলোও পাল খাটিয়ে সরে পড়তে দেরি করলে না! টুলনের পতন হল! নেপোলিয়ন যা ভেবেছিলেন, তাই (১৭৯৩ খৃ.)!

এই যুদ্ধে ইংরেজ-নিক্ষিপ্ত বর্শায় নেপোলিয়ন প্রথম আহত হলেন।

আঘাত গুরুতর নয়। চিরজীবন যুদ্ধক্ষেত্রবাসী হয়েও তিনি কোনদিন গুরুতর আঘাত পান নি। এর পরে তিনি আর একবার মাত্র সামান্য ভাবে আহত হয়েছিলেন।

ডিসেম্বর মাসের কন্‌কনে রাত্রির হিমেল অন্ধকার, নগর থেকে পলায়নপর ইংরেজ, স্পানিয়ার্ড ও ফরাসী রাজপক্ষীয়দের ভীত কোলাহল, চতুর্দিকে রক্তরাঙা মৃতের স্তূপ, আহতদের কাতর আর্তনাদে বিদীর্ণ আকাশ-বাতাস, কামানের পর কামানের গুরু গুরু গর্জন এবং লুণ্ঠনরত বিজয়ী ফরাসীদের ঘন ঘন হুঙ্কার! মৃত্যু, অগ্নিকাণ্ড ও আগ্নেয়াস্ত্রের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম্ররাশির মধ্য দিয়ে য়ুরোপের ভাগ্যগগনে আজ প্রথম আত্মপ্রকাশ করলে নতুন ও বিচিত্র এক ধূমকেতু!

নেপোলিয়ন যদিও এ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন না তবু আসল জয়গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল তাঁর নাম। তিনি হলেন ব্রিগাডিয়ার-জেনারেল এবং পেলেন ইতালী-অভিযানের গোলন্দাজ সৈন্যদের ভার।

এই সময়ে নেপোলিয়নের যশোগৌরবে আকৃষ্ট হয়ে মার্মন্ট্ ও জুনট্ নামে দুজন যুবক সেনানী এসে তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইলেন। তিনিও তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন সহকারী সেনানী রূপে।

কিন্তু হঠাৎ আবার ভাগ্যচক্রের গতি হল নিম্নমুখী। নেপোলিয়ন এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, এ যেন বিনামেঘে বজ্রপাত!

বিপ্লবী নেতা বড় রবেস্‌পিয়ের তখন ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের সর্বেসর্বা ছিলেন। দেশের রাজা, রানী, রাজবংশীয় অধিকাংশের এবং বড় বড় অভিজাতদের দেহ হয়েছে মুণ্ডহীন! কারণে-অকারণে হাজার হাজার সাধারণ লোকেরও প্রাণদণ্ড হয়েছে। এমন দিন যায় না যেদিন ফ্রান্সের মুণ্ডপাতযন্ত্র বা 'গিলোটিন' অলস হয়ে থাকে। খেতাবী অভিজাতদের হত্যা করে বা দেশ থেকে তাড়িয়ে বিপ্লবীরা সিংহাসন লুপ্ত করে নিজেদের হাতে নিয়েছিল দেশশাসনের ভার। কিন্তু রক্তসাগরে যে প্রজাশক্তির জন্ম, বিনা রক্তে সে তৃপ্ত হতে পারে নি। বিপ্লবীদের বড় বড় কর্তাদেরও সেই রক্তসাগরে ডুবে তলিয়ে যেতে হল। বাকি ছিলেন রবেস্‌পিয়ার, হঠাৎ 'গিলোটিন' তাঁকেও গ্রহণ করলে।

প্রজাতন্ত্রের ভারগ্রহণ করলেন নতুন একদল লোক। রবেস্‌পিয়েরের দলের

লোকদের তাঁরা হত্যা বা গ্রেপ্তার বা বিতাড়িত করলেন। নেপোলিয়নও বন্দী হলেন।

তাঁর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর মাত্র। সৌভাগ্যের প্রথম আস্বাদ ভালো করে ভোগ করতে না করতেই তাঁর মাথার উপরে এসে পড়ল কল্পনাতীত দুর্ভাগ্যের বোঝা। তাঁর স্বদেশ নেই। ফ্রান্সও তাঁকে শত্রু বলে মনে করে। আগামী সপ্তাহের যে কোন দিন হয়তো সামরিক বিচারের ফলে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

বন্ধুরা বললেন, "পালিয়ে প্রাণ বাঁচাও। আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

নেপোলিয়ন ঘাড় নেড়ে বললেন, "না। আমি নির্দোষ। যদি ওরা আমার মৃতদেহ দেখতে চায়, আমি প্রস্তুত। সৈনিক হয়ে মরণকে ভয় করব না।"

পরের সপ্তাহে নেপোলিয়ন পেলেন মুক্তি।

কারণ? ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সারা য়ুরোপ। ফ্রান্সকে এখন আত্মরক্ষা করতে হবে রণক্ষেত্রে গিয়ে কিন্তু ফরাসী ফৌজে নেপোলিয়নের মতন ভালো সেনাপতির অভাব। অতএব তাঁর বাঁচা দরকার!

নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যকে নেপোলিয়ন কখনো লাভ করেন নি। চিরজীবনই পরম সৌভাগ্যের সময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চরম দুর্ভাগ্য!

৩

ফ্রান্সের সন্তান

কেবল ইংরেজ ও স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে নয়, জার্মান ও অস্ট্রিয়ানদেরও সঙ্গে ফ্রান্সের বিবাদ চলছে।

কিছুকাল কর্মচ্যুত হয়ে অলস জীবন যাপন করবার পর নেপোলিয়ন হঠাৎ একদিন শাসন-সভা থেকে আহ্বান-পত্র পেলেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। একবার রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ তা কখনো ভোলে না। জনসাধারণ আবার ক্ষেপে উঠেছে—তারা রক্ত চায়! শাসন-সভার মাতব্বররা ভীত হয়ে ডাক দিলেন নেপোলিয়নকে।

নেপোলিয়ন বললেন, "আমি রাজি। কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।"

মাতব্বররা বললেন, "তুমি যা খুশি কর।"

আজ সাত বছর ধরে ফ্রান্সের জনসাধারণ যখনি বিদ্রোহী হয়েছে, কর্তৃপক্ষ তাদের উচিতমত বাধা দিতে পারেন নি। বরং তাদের মন রাখবার চেষ্টা করেছেন। আস্কারা পেয়ে পেয়ে তাদের সাহস বেড়ে উঠেছে।

নেপোলিয়ন তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে ব্যবস্থা করতে লাগলেন। রাতারাতি শাসন-সভা হয়ে উঠল রীতিমত কেল্লার মত। ভীত সভ্যরা তার ভিতরে এসে আশ্রয় নিলেন—নেপোলিয়ন তাঁদেরও হাতে দিলেন অস্ত্র।

তিনি বললেন, "এইবারে কয়েকটা কামান চাই।"

সভ্যরা চমকে অধিকতর ভীত হয়ে ভাবলেন—ওরে বাবা, কামান? ব্যাপারটা কি এতই সাংঘাতিক হয়ে উঠবে?

মুরাট হচ্ছেন একজন যুবক, গোলন্দাজ সেনানী। তিনি নগর-প্রান্ত থেকে চল্লিশটা বড় বড় কামান টেনে নিয়ে এলেন। আজ থেকে নেপোলিয়নের ভাগ্যসূত্রের সঙ্গে তাঁরও ভাগ্য গ্রথিত হল।

জনসাধারণ হরেক-রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিকট চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে। তাদের গর্জন-রব ভেসে এল শাসন-সভার মধ্যে। সভ্যরা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে সারা!

অনেকেই বললেন, দরকার নেই বাপু এত দাঙ্গা-হাঙ্গামায়! কি হতে কি হয় বলা তো যায় না। ওদের সঙ্গে একটা মিট্‌মাট্ করে ফেলাই ভালো!

নেপোলিয়ন কিন্তু অটল। জনসাধারণকে তিনি আজ এমন শিক্ষা দিতে চান, যেন তারা ভবিষ্যতে আর কোন দিন আব্দার করতে না আসে!

ব্যূহবদ্ধ শিক্ষিত সৈনিকদের আক্রমণ করা যে কতখানি মারাত্মক ব্যাপার, নির্বোধ জনতা তা বুঝলে না। তারা বন্দুক ছুঁড়তে আরম্ভ করলে।

নেপোলিয়ন হুকুম দিলেন, "কামান দাগো!"

দেখতে দেখতে প্যারিসের রাজপথ দিয়ে বইতে লাগল রক্তের ঢেউ! দুই ঘণ্টার মধ্যে পথ সাফ! বিপুল জনতা দারুণ ভয়ে অদৃশ্য হল, পিছনে হতাহতকে ফেলে। সৈনিকদের মধ্যে মারা পড়ল ত্রিশজন, আহত হল ষাটজন।

শাসন-সভার সদস্যরা 'রক্ষাকর্তা' বলে নেপোলিয়নকে দুই হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

জনসাধারণের কাছে তিনি এখন ঘৃণ্য। কিন্তু তাদের ঘৃণা তিনি গ্রাহ্যও করেন না। তিনি আজ ফ্রান্সের মধ্যে প্রধান সেনাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন। যশ, মান, অর্থ, শক্তি—সবই আজ তাঁর! দুর্বলের ঘৃণা নগণ্য!

তাঁর ভাইরা ও আত্মীয়রা বড় বড় কাজে নিযুক্ত হলেন। এতদিন পরে মা লেটিজিয়ার আর কোন অভাব রইল না।

দাদা জোসেফ ইতিমধ্যে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। নেপোলিয়নও তাঁর দাদার শ্যালী দেসিরীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়। দেসিরী তখন বুঝতে পারে নি, নেপোলিয়নকে প্রত্যাখ্যান করে সে অর্ধ-য়ুরোপের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হল! যদিও পরে নেপোলিয়নেরই অনুগ্রহে সে হয়েছিল সুইডেনের মহারানী। কিন্তু তারপরেও সে স্বামীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল নেপোলিয়নেরই বিরুদ্ধে!

ভাই কাউন্ট বাহার্নেস্ এখন মৃত, তাঁর বিধবা জোসেফাইন এক ছেলে, এক মেয়ের মা। তিনি খেতাবওয়ালা বড় ঘরের বউ, শাসনসভার বড় কর্তারাও তাঁকে খাতির করে চলেন।

নিজের সৌভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নেপোলিয়ন স্থির করলেন, এইবারে সংসার পাতবেন।

কিন্তু মনের মতন বউ কই? দেসিরী? হ্যাঁ, সে হয়তো এখন জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে বিয়ে করতে রাজি হবে, কিন্তু এখন তাঁর যে পদমর্যাদা হয়েছে, অমন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আনলে তো চলবে না!

তখন নেপোলিয়নের দৃষ্টি পড়ল জোসেফাইনের দিকে। যদিও তিনি বয়সে নেপোলিয়নের চেয়ে বড়, তবু তাঁর উপাধি আছে এবং রূপেরও অভাব নেই।

নেপোলিয়নের সঙ্গে জোসেফাইনের বিবাহ হয়ে গেল (১৭৯৬ খৃ.)। বিয়ের আংটির উপরে এই কথাটি খোদাই ছিল—'অদৃষ্ট-পথে'। তাঁদের অদৃষ্ট-পথ কোথায় গিয়ে শেষ হবে, সেদিন কেউ তাঁরা দেখতে পান নি!

বিবাহের দুই দিন পরে নেপোলিয়ন ইতালীর দিকে যাত্রা করলেন।

ইতালীর উপরে তখন অস্ট্রিয়ানদের প্রভুত্ব এবং অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে বেধেছে ফরাসীদের লড়াই। নেপোলিয়ন গেলেন প্রধান সেনাপতিরূপে।

তখন সেনাপতি মোরো ও জোর্দান যথাক্রমে সত্তর ও আশী হাজার সৈন্য নিয়ে জার্মানীকে আক্রমণ করতে গিয়েছেন। নেপোলিয়ন পেলেন মাত্র আটত্রিশ হাজার সৈন্যের ভার।

নেপোলিয়নের বয়স তখন সাতাশ বৎসর। এবং আজ থেকে তিনি নিজেকে ফ্রান্সের সন্তান বলে মনে করতে লাগলেন।

৪

দিগ্বিজয়ের পথে

সৈন্যদলকে সম্বোধন করে নেপোলিয়ন প্রথমেই উদ্দীপনা-পূর্ণ ভাষায় এই বক্তৃতা দিলেন :

"সৈন্যগণ,

অর্ধনগ্ন হয়ে তোমরা অর্ধাহারে আছ। গভর্মেন্ট তোমাদের অনেক দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু তোমাদের জন্যে কিছু করতে অক্ষম। ধৈর্য ও সাহস তোমাদের মান বাড়িয়েছে বটে, কিন্তু দিতে পারছে না তোমাদের কোন পুরস্কার, কোন গৌরব। আমি তোমাদের নিয়ে যাব পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুজল সুফল শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে। সেখানে গেলে দেখতে পাবে তোমরা শ্রীসম্পন্ন নগরের পর নগর, জনবহুল ও ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ প্রদেশের পর প্রদেশ। সেখানে গেলে তোমরা লাভ করবে মান, যশ এবং ঐশ্বর্য। ইতালী-যাত্রী সৈন্যগণ, তোমাদের কি সাহস ও দৃঢ়তার অভাব হবে?"

কোন সেনাপতির মুখে সৈন্যরা এ-রকম আশ্চর্য ভাষা শোনে নি। তারা উৎসাহিত হয়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিলে।

কিন্তু আসলে উৎসাহিত হবার বিশেষ-কিছুই ছিল না। শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ষাট হাজার, ফরাসীদের সংখ্যা মাত্র আটত্রিশ হাজার। নেপোলিয়নের সঙ্গতির মধ্যে চব্বিশটি শৈল-কামান, চার হাজার অল্প-ভোজনে কৃশ ঘোড়া, তিন লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা এবং সৈন্যদের জন্যে পনের দিনের পূর্ণাহার! এই নিয়ে তিনি চলেছেন মহাশক্তিমান অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও সার্দিনিয়ার রাজাকে হারিয়ে ইতালী দখল করতে। ফ্রান্সের শাসন-সভার ডিরেক্টররা তাঁকে অসাধ্য সাধন করতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি দমলেন না—অসাধ্যসাধন করাই প্রতিভার ধর্ম।

আজ আমরা ইতালীর যে রূপ দেখছি তখন তার কিছুই ছিল না। সমগ্র ইতালী তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল; তার কোন দেশ পোপের দখলে, কোন দেশে প্রভুত্ব করেন সার্দিনিয়ার রাজা, কোন দেশ ছিল অস্ট্রিয়ার অধীন এবং কোন দেশ বুর্বন বা ফ্রান্সের সিংহাসনচ্যুত রাজার আত্মীয়রা শাসন করেন। ইংরেজ নৌ-বীর নেলসন তাই বলেছিলেন : 'ইতালী হচ্ছে সোনার খনি। একবার এদেশে ঢুকতে পারলে কেউ বাধা দিতে পারবে না।" নেলসন এই সোনার খনিতে ছোঁ মারবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ফরাসীদের কাছে হেরে পালিয়ে যান।

নেপোলিয়ন দ্রুত-গতিতে ইতালীর উপরে গিয়ে পড়লেন। আত্মশক্তির উপরে তাঁর অটল বিশ্বাস। তিনি জানতেন কেউ তাঁকে হারাতে পারবে না—প্রবল

যৌবন ও অটুট স্বাস্থ্য তাঁর সহায়। দিন-রাত ঘোড়ায় চড়ে থেকেও তাঁর শ্রান্তি আসে না। যে-কোন মুহূর্তে তিনি পারেন ঘুমোতে ও জাগতে (বড় বড় রণক্ষেত্রে যখন বিষম লড়াই চলছে, শ্রান্ত নেপোলিয়ন তারই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন)! এবং যে-কোন তুচ্ছ খাবারও তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি কোন-কিছুই দেখতে ভোলে না। ফৌজের সর্বত্রই তিনি সশরীরে আবির্ভূত হন।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে-সব সেনাপতি দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। অস্ট্রিয়ার রাজবংশীয় আর্কডিউক চার্ল্স্—অভিজ্ঞতায় ও সহ্যক্ষমতায় কেমন করে তিনি নেপোলিয়নের উপরে যাবেন? বিউলিউ—সত্তর বছর তাঁর বয়স। জেনারেল কোল্যি—বাতে পঙ্গু, কেউ তাঁকে বহন করে নিয়ে না গেলে তিনি চলতেই পারেন না! আল্ভিন্‌ট্‌জি ও সার্দিনিয়ার রাজাও বুড়ো। জেনারেল উর্ম্জারও তাই, তার উপরে কালা ও দীর্ঘসূত্রী।

নেপোলিয়ন যখন প্রধান হয়ে এলেন, ফৌজের মধ্যে তখন মেসেনা, অগেরু, লাহার্প্, সেরুরিয়ার ও বার্দিয়ার প্রভৃতি প্রবীণ ও বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। তাঁরা এই অতি-ক্ষুদে, ছোক্রা ও রণক্ষেত্রে নবাগত কর্তাটিকে ভালো চোখে দেখলেন না, কারণ তাঁরা নেপোলিয়নের চেয়ে অনেক বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছেন।

নেপোলিয়ন তাঁদের পরামর্শ-সভায় আহ্বান করলেন। তারপর তাঁদের কাছে প্রকাশ করলেন, কোন্ কৌশলে তিনি শত্রুদের আক্রমণ করতে চান।

নবীন সেনাপতির 'প্ল্যান' অপূর্ব! রণপ্রবীণ সেনানীরা বিস্ময়চকিত। পরামর্শ-সভা থেকে বেরিয়ে অগেরুকে ডেকে মেসেনা বললেন, "এতদিন পরে আমাদের গুরুর দেখা পেলুম!"

মিত্রপক্ষের প্রাচীন সেনাপতি বিউলিউ সার্দিনিয়ার রাজাকে বললেন, "এই আমি যুদ্ধে চললুম। ফরাসীদের এইবার দেখে নেব। রাজা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, শত্রুদের একেবারে ফ্রান্স পর্যন্ত তাড়িয়ে না গিয়ে আমি পায়ের জুতো খুলব না!"

ষাট হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে আটত্রিশ হাজার ফরাসী সৈন্য!

তবু নেপোলিয়ন বললেন, "শত্রুদের আগে আক্রমণ করব আমিই!"

তাঁর মূলমন্ত্র : সময় ও দ্রুতগতিই হচ্ছে সব!

শত্রুদের সব দল এক জায়গায় এসে মিলেমিশে বলবান ও সাবধান হবার আগেই একে একে তাদের আক্রমণ ও পরাস্ত কর!

তিন জায়গায় তিনজন শত্রু-সেনাপতি ফৌজ নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

নেপোলিয়ন তাদের একজায়গায় মিলতে দিলেন না। প্রথমে ঝড়ের বেগে আল্প্স পর্বত প্রদক্ষিণ করে মন্টিনোট্ নামক স্থানে গিয়ে মধ্যবর্তী শত্রু-ফৌজের উপরে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। তারপরেই তিনি টিউরিন নগরে

সার্দিনিয়ার রাজার কাছে গিয়ে হাজির! সার্দিনিয়ার ভীত হতভম্ব রাজা নেপোলিয়নের হাতে কেল্লা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে ফেললেন। তারপর অস্ট্রিয়ান সেনাপতি বিউলিউয়ের পালা।

বিউলিউ তখন সমস্ত সৈন্য নিয়ে মিলান শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু লোদি-সেতুর কাছে নেপোলিয়ন এমন অদ্ভুত কৌশলে তাঁকে আক্রমণ করলেন যে তিনি পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন মান্টুয়া নগরে। এই লোদি-সেতুর যুদ্ধ আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। তারপর নেপোলিয়ন ব্রেস্‌কিয়া, লেগ্‌হর্ন্‌ ও বোলোগ্না প্রভৃতি দখল করে বসলেন।

ওদিকে জার্মানিতে ফরাসী সেনাপতি জোর্দান, অস্ট্রিয়ার রাজকুমার আর্কডিউক চার্ল্‌সের কাছে হেরে পালিয়ে গেলেন। চার্ল্‌স্‌ তখন হাত খালি পেয়ে তাড়াতাড়ি মান্টুয়া নগরে অবরুদ্ধ বিউলিউকে সাহায্য করবার জন্যে অগ্রসর হলেন। শুনেই নেপোলিয়ন নিজের কতক সৈন্য নিয়ে আর্কোলা ও রাইভলি ক্ষেত্রের দুই যুদ্ধে আর্কডিউককে শোচনীয় রূপে হারিয়ে দিলেন। মান্টুয়ার পতন হল। পোপ তাড়াতাড়ি নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর হাতে বোলোগ্না ও ফেরারা দেশ ছেড়ে দিলেন। সমস্ত উত্তর ইতালী হল নেপোলিয়নের হস্তগত!

নেপোলিয়নের এই আশ্চর্য সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর বিদ্যুৎ-গতি! অস্ট্রিয়ার একজন সেনানী বন্দী হয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন : "নেপোলিয়নকে কখনো দেখি আমাদের পিছনে, কখনো পাশে, আবার হঠাৎ কখনো সামনের দিকে! আরে ছোঃ, লোকটা যুদ্ধরীতির কিছুই জানে না!"

ফ্রান্সের শাসন-সভার ডিরেক্টররা লিখে পাঠালেন, সার্দিনিয়ার রাজার সঙ্গে কোন্ শর্তে সন্ধি করতে হবে।

নেপোলিয়নের কাছ থেকে জবাব এল : "আপনাদের সন্ধি-শর্ত আমার হস্তগত হয়েছে। সেনাদল তা মঞ্জুর করেছে।"

নেপোলিয়ন হচ্ছেন শাসন-সভার দ্বারা নিযুক্ত ভৃত্য মাত্র। তাঁর মুখে এমন গর্বিত উক্তি শুনে ডিরেক্টররা বিস্মিত হলেন। কেউ কেউ বললেন, এমন উদ্ধত উক্তির জন্যে তাঁর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

কিন্তু তিনি এখন সমস্ত ফ্রান্সের আদরের দুলাল—বিজয়ী ফ্রান্সের জনসাধারণ আজ নেপোলিয়নের পক্ষে। তাঁকে শাস্তি দেবার সাধ্য কারুর নেই। বুদ্ধিমান নেপোলিয়নও তা জানতেন।

ডিরেক্টররা তখন নেপোলিয়নকে তাঁবে রাখবার জন্যে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেন। তাঁর যশের উপরে ভাগ বসাবার জন্যে জেনারেল কেলারম্যানকে তাঁর সহযোগী রূপে পাঠানো হল।

নেপোলিয়ন এ চালাকি বুঝতে পারলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে বলে পাঠালেন—"না!"

ডিরেক্টররা আরো ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, সৈন্যরা হচ্ছে নেপোলিয়নেব পক্ষে। তিনি যদি ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে ফ্রান্সে ছুটে আসেন, তখন তাঁকে ঠেকাবে কে? কাজ নেই বাপু, লোকটাকে ঘাঁটিয়ে! তাঁরা তাড়াতাড়ি নিজেদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন!

এদিকে বিজিত উত্তর-ইতালী থেকে নেপোলিয়ন কোটি কোটি টাকা ও অন্যান্য অসংখ্য ঐশ্বর্য ভারে ভারে স্বদেশে পাঠাতে ক্রটি করলেন না। বিদ্রোহ ও ধারাবাহিক যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের অর্থভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল। ঐশ্বর্যের স্তূপ দেখে ডিরেক্টরদেরও মুখ বন্ধ হল। নেপোলিয়ন আরো সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। আরো বেশি লাভের আশায় ডিরেক্টররাও তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

ডিরেক্টরদের মতামতের অপেক্ষা না রেখেই নেপোলিয়ন নিজের ইচ্ছানুসারে অস্ট্রিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। আর্কডিউক চার্লস্ আবার তাঁকে বাধা দিতে এলেন, কিন্তু আবার তিনি হলেন পরাজিত। তারপর নেপোলিয়ন যখন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার অনতিদূরে এসে পড়েছেন, তখন ভীত সম্রাটের দূত নিয়ে এল সন্ধির প্রস্তাব।

নেপোলিয়নের নিজের শর্তানুসারেই সন্ধি হল। অস্ট্রিয়া বাধ্য হয়ে হল্যান্ড, মিলান ও আংশিক ভাবে ভিনিস ছেড়ে দিলে ফ্রান্সের হাতে। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ছয়বৎসরব্যাপী যুদ্ধ শেষ হল (১৭৯৭ খৃ.)।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের জীবনের আর এক বাসনা সফল হয়েছে। ইতালীর উপরে তাঁর প্রভুত্ব দেখে ভীত হয়ে অদূরবর্তী কর্সিকা থেকে ইংরেজরা নিজেদের দেশে সরে পড়ল।

বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরে এলেন অপূর্ব গৌরবের মুকুট পরে। বিপ্লবের পর ফ্রান্স নেমে গিয়েছিল অধঃপতনের অন্ধকারে, চারিদিক থেকে আক্রমণ করে বিদেশী শত্রুরা তার অস্তিত্ব প্রায় লোপ করতে বসেছিল, নেপোলিয়নের অসাধারণ যুদ্ধপ্রতিভার মহিমায় আজ সে আবার হয়েছে য়ুরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ! তার শত্রুরা পলাতক, পরাজিত! যারা এখনো তার মিত্র নয়, নির্বিষ সর্পের মতন তারাও আজ নত করেছে মাথা!

সমস্ত ফরাসী জাতি বিপুল আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে! পুষ্পে পত্রে পতাকায় দীপমালায় রাজধানী সুসজ্জিত করে বিজয়ী বীরকে তারা অভিনন্দন দান করলে।

এ-সময়ে নেপোলিয়নের মনে কোন্ ভাবের উদয় হচ্ছিল, আমরা হয়তো সেটা কল্পনা করতে পারি। ইতালীর যুদ্ধক্ষেত্রেই যে নেপোলিয়নের মনের ভিতরে

ভবিষ্যতের সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিত জাগ্রত হয়েছিল, তাঁর নিজের মুখেই সে কথা প্রকাশ পেয়েছে।

লোদি-সেতুর যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন তাঁর বন্ধু মার্মন্ট্‌কে বলেছিলেন : "আমি অনুভব করছি, আমার জন্যে এমন সব কীর্তি অপেক্ষা করছে, বর্তমান কালের লোকেরা যার কোন ইঙ্গিতই পায় নি।"

বহুকাল পরে নিজের জীবনস্মৃতির প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : "লোদি-সেতুর যুদ্ধের পরে সেই সন্ধ্যায় সর্বপ্রথমে জানতে পেরেছিলুম যে, আমি হচ্ছি একজন অসাধারণ মানুষ! সেইদিন থেকেই অপূর্ব সব কীর্তিকলাপের জন্যে আমার মনে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা! তার আগে সে-সব ছিল আমার স্বপ্নজগতের উদ্ভট কল্পনা।"

আজ লোদী-সেতুর যুদ্ধের পরে খ্যাতির পথে তিনি আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং নিজের প্রতিভা ও বিপুল শক্তির সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোনই সন্দেহ নেই। আজ নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে ইচ্ছা করলে অনায়াসেই তিনি হতে পারেন দেশের সর্বেসর্বা!

কিন্তু জনসাধারণের কাছে দেবতার মতন পূজা পেয়েও নেপোলিয়ন তেমন কোন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। এখনো সময় হয় নি—মাহেন্দ্রক্ষণ আসে নি। তিনি বুদ্ধিমানের মতন অতি বিনীত ভাবে জনসাধারণের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

ফরাসী জাতি বুঝেছিল, নেপোলিয়নই হচ্ছেন এখন দেশের মাথা! তাঁর চেষ্টাতেই আজ ফরাসীরাজ্য পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যে। পুরাতন শত্রু অস্ট্রিয়া লাঞ্ছিত ও পরাজিত। স্পেন আজ ফরাসীদের হাতে কলের পুতুল মাত্র। একমাত্র শত্রু হচ্ছে ইংলন্ড—কিন্তু সেও হয়েছে অসহায় ও কোণঠাসা।

নেপোলিয়নের মাথার ভিতরে ঘুরছে তখন কতরকম আকাশ-ছোঁয়া কল্পনা। কিন্তু সে-সব কল্পনা কার্যে পরিণত করবার আগে তিনি স্থির করলেন, সর্বপ্রথমে ফরাসীদের মহাশত্রু ইংলন্ডের বিষ-দাঁত ভাঙতে হবে। ভারত-সাম্রাজ্য নিয়েই ইংরেজদের যত জারিজুরি ও বড়মানুষী। ইংলন্ডের হাত ছিনিয়ে ভারতবর্ষ কেড়ে নিলে কেমন হয়? ভালোই হয়, কিন্তু ওদিকে যাবার চেষ্টা করলে আগে দখল করতে হবে মিশর ও সিরিয়া।

এদিকে ডিরেক্টররা নেপোলিয়নের অতি-বাড় দেখে ভয়ে সারা হচ্ছেন। নেপোলিয়ন এখন খালি সামরিক ব্যাপারে নয়, রাজনৈতিক ব্যাপারেও হাত দিতে আরম্ভ করেছেন! অথচ তাঁকে আর কর্মচ্যুত করবারও উপায় নেই, কারণ নামে ভৃত্য হয়েও আসলে তিনি এখন প্রভুর মত। তাঁকে অপদস্থ বা নির্বাসিত

করতে গেলে সমস্ত ফরাসীজাতি মারমুখো হয়ে উঠবে! নেপোলিয়নকে নিয়ে কি করা যায়—কি করা যায়?

ঠিক এই সময়ে নেপোলিয়ন নিজেই প্রস্তাব করে বসলেন, "আমি মিশর অধিকার করতে যাব।"

ডিরেক্টররা হাতে যেন স্বর্গ পেলেন! মিশর হচ্ছে বহুদূরে। দেশ থেকে নেপোলিয়ন যত দূরে থাকেন ততই ভালো! তারপর মিশরের রণক্ষেত্রেই হতে পারে নেপোলিয়নের সমাধি। সেটা হচ্ছে আরো ভালো!

ডিরেক্টররা রাজি হয়ে গেলেন সাগ্রহে। তাঁদের অতি-আগ্রহ দেখে নেপোলিয়ন মনে মনে হেসেছিলেন কিনা জানি না।

৫

সিংহাসনের ছায়ায়

খুব গোপনে চারশোখানা ছোট-বড়-মাঝারি জাহাজ সাজিয়ে নেপোলিয়ন যাত্রা করলেন সমুদ্র-পথে। জাহাজে আছে আটত্রিশ হাজার সৈন্য।

এবং জাহাজে আছেন একদল মহাপণ্ডিত। তাঁদের কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ দার্শনিক, কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক, কেউ রাসায়নিক, কেউ জোতির্বিদ্, কেউ জ্যামিতিবিদ্ বা চিত্রকর বা কবি বা স্থাপত্যবিদ্ প্রভৃতি। মোট একশো পঁচাত্তর জন। সৈনিকরা অবহেলাভরে এদের ডাকত 'গাধার দল' বলে।

সৈন্যরা লড়াই করবে আর পণ্ডিতরা করবেন প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার অনুসন্ধান ও অনুশীলন।......এই অনুসন্ধানের ফলেই আজকের বিশ্ববিখ্যাত রোসেটা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং সকলেই জানেন, এই অমূল্য শিলালিপিখানি পাওয়া গেছে বলেই আজ আমরা প্রাচীন মিশরের সভ্যতা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি।

এইখানেই নেপোলিয়নের মহামানবতা। তিনি কাঠগোঁয়ার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন দিগ্বিজয়ী ছিলেন না। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান—প্রত্যেক বিভাগেই তিনি তাঁর অসাধারণ মস্তিষ্কের পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

ইংরেজরা খবর পেলেন, নেপোলিয়ন মস্ত একদল সৈন্য ও অনেক জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন ভূমধ্যসাগরের কোথায়। তাঁরা বিস্মিত হলেন, ভয় পেলেন। নৌ-সেনাপতি নেলসন নৌবহর নিয়ে তখনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথাও নেপোলিয়নকে পাওয়া গেল না।

নেলসন হতাশ ভাবে বললেন, "শয়তান লাভ করেছে শয়তানের সৌভাগ্য!"

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন খুব সহজে মাল্টা দ্বীপ দখল করে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে গিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়েছেন।

......উত্তপ্ত, আরক্ত মরু-জগৎ! হু-হু বাতাস আগুন-পাগল ধূ-ধূ মরুভূমির উপর দিয়ে ছোটে চারিদিকে গরম বালি ছড়াতে ছড়াতে। মূর্তিমান অতীতের মতন গগনস্পর্শী পিরামিড অটল মহিমায় তাকিয়ে থাকে বর্তমান শূন্যতার দিকে; স্পিংগ্‌ক্‌স্‌ বা নারসিংহী আকাশে মাথা তুলে চিরস্তব্ধ মুখে গম্ভীরভাবে দেখে বহু যুগের ভুলে-যাওয়া স্বপ্ন। শতাব্দীর পর শতাব্দীর পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলা ঝরে পড়েছে তাদের পাষাণ পদতলে—তারা ভ্রূক্ষেপ করে নি, ফিরে তাকায় নি!

ঘোড়ার খুরে খুরে বালির মেঘ সৃষ্টি করে মিশরের ম্যামেলিউক সওয়াররা দলে দলে ধেয়ে আসছে ফরাসীদের আক্রমণ করবার জন্যে।

সেনাদলের সামনে ঘোড়ার পিঠে বসে পিরামিডের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে নেপোলিয়ন বললেন, "সৈন্যগণ, চল্লিশ শতাব্দী তোমাদের পানে তাকিয়ে আছে চোখ নামিয়ে।"

যুদ্ধে ম্যামেলিউকরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। নেপোলিয়ন কায়রো শহর দখল করলেন (১৭৯৮ খৃ.)।

কিন্তু আবার সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে এল দুর্ভাগ্য। নেলসন খুঁজতে খুঁজতে আবুকির উপসাগরে এসে ফরাসী নৌবহরকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। জলযুদ্ধে ফরাসীদের চারখানা ছাড়া সমস্ত জাহাজ ডুবে গেল (১৭৯৯ খৃ.)।

যদিও এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্যে নেপোলিয়নকে কেউ দায়ী করবে না, তবু খবর শুনে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে সবাইকে তিনি বললেন, "দেখছি দেশে ফেরবার বা সেখান থেকে সাহায্য পাবার পথ বন্ধ হল। উত্তম! আমাদের মাথা তুলে রাখতে হবে ঝড়-দোলানো জলের উপরে; ভয় নেই, সমুদ্র আবার হবে প্রশান্ত! প্রাচ্যের রূপ বদ্‌লে দেব আমরা—এই হয়তো বিধাতার বিধান! এইখানেই আমাদের থাকতে হবে, তারপর অতীতের বীরপুরুষদের মতন আমরাও হয়ে উঠব মহিমময়!"

তাঁর দৃষ্টি ছুটল ভারতবর্ষের দিকে। সেখানে তরবারি আস্ফালন করছেন ইংরেজদের মহাশত্রু টিপু সুলতান। তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল নেপোলিয়নের কথাবার্তা। পারস্যের শা'য়ের সঙ্গেও ষড়যন্ত্র হতে লাগল। নেপোলিয়ন বললেন, "এখানে যদি কেবল পনেরো হাজার সৈন্য রেখে যেতে পারি, আর আমি যদি ত্রিশ হাজার সৈন্য পাই, তাহলে ভারতবর্ষে যাত্রা করা অসম্ভব হবে না।"

ওদিকে ফরাসী নৌবহরের পরাজয়ে উৎসাহিত হয়ে তুর্কী ও মিশরীরা আবার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। কামানের অভাবে একটি যুদ্ধে বিফল হয়ে বাকি যুদ্ধে ফরাসীরা জয়লাভ করলে।

হঠাৎ নেপোলিয়নের হাতে এসে পড়ল খানকয় পুরানো ফরাসী সংবাদপত্র। দুঃসংবাদ! সমস্ত ইতালী আবার ফ্রান্সের হাত-ছাড়া হয়েছে!

সেনাপতি ক্লেবারকে মিশরের যুদ্ধ চালাবার জন্যে রেখে, পনেরো মাস পরে নেপোলিয়ন কয়েকজন মাত্র সঙ্গীর সঙ্গে গোপনে আবার স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন।......

আবার ফ্রান্স!......দিকে দিকে উঠল আনন্দ-কোলাহল! "নেপোলিয়ন আবার ফিরে এসেছেন! ফ্রান্সের মহাবীর আবার ফিরে এসেছেন! জয় নেপোলিয়নের জয়!"

জয়ধ্বনি শুনে শাসন-সভার ডিরেক্টরদের বুক দুরু-দুরু কেঁপে উঠল। তাঁদের বুক অকারণে কাঁপে নি।

নেপোলিয়ন বজ্রকঠিন কণ্ঠে বললেন, "তোমাদের হাতে আমি যে শ্রীসমৃদ্ধিশালী ফ্রান্সকে সমর্পণ করে গিয়েছিলুম, তোমরা তার কী দশা করেছ? আমি শান্তিপ্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলুম, এসে দেখছি যুদ্ধ! আমি তোমাদের জয়গৌরবের অধিকারী করে গিয়েছিলুম, এসে দেখছি তোমরা পরাজিত! আমি তোমাদের কাছে কোটি কোটি টাকা রেখে গিয়েছিলুম, এসে দেখছি তোমরা ভিক্ষুক! তোমাদের নিয়ে আর চলবে না!"

ডিরেক্টরদের বুক অকারণে কাঁপে নি।

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের দ্বারা গৃহীত দ্বিতীয় মাসের নাম Brumaire. ঐ মাসের ৯ তারিখ। সেইদিনই সব হিসাব-নিকাশ হয়ে গেল। নেপোলিয়ন সৈন্যদের সাহায্যে অকর্মণ্য ডিরেক্টরদের শাসন-সভা থেকে দূর করে দিলেন (২৪ ডিসেম্বর, ১৭৯৯ খৃ.)।

গত কয়েক বৎসরের ধারাবাহিক দুর্ভাগ্য, বিপ্লব ও অরাজকতার ফলে ফ্রান্স এমন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, নেপোলিয়নের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না। নতুন শাসন-সভার নিয়মতন্ত্র যখন জনসাধারণের সামনে দাখিল করা হল, তখন তার স্বপক্ষে ভোট পাওয়া গেল ৩০,১১,০০৭ এবং বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা ১,৫৬২ মাত্র!

নেপোলিয়ন হলেন প্রধান এবং আর দুজন হলেন তাঁর সহকারী শাসনকর্তা—তাঁদের নাম হল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনকর্তা। প্রজাতন্ত্র এগিয়ে গেল অনেকটা রাজতন্ত্রের কাছাকাছি। এইবারে নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই দূর থেকে

পথের শেষ দেখতে পেলেন—কিন্তু, সবটা নয়! কোন মানুষ—এমন কি মহামানুষও জীবনপথের শেষটা সম্পূর্ণ দেখতে পায় না, কারণ মাঝে দোলে নিয়তির রহস্যময় কুহেলিকা।

......টুইলারিস রাজপ্রাসাদ! ফ্রান্সের রাজাদের নিবাস। নেপোলিয়ন আজ সেখানে বসে মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করেন। তাঁর সঙ্গে আরো দুজন কন্সাল আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা হচ্ছেন নেপোলিয়নেরই প্রতিধ্বনি!

নেপোলিয়ন সর্বপ্রথমে রচনা করলেন নতুন আইনের খসড়া, কারণ বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের আইনকানুন একরকম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়। প্রায় দেড়শত বৎসর হতে চলল, আজও ফ্রান্সে Code Napoleon বা নেপোলিয়ন-সংহিতা অনুসারে আদালতের বিচারকার্য নির্বাহিত হয়। এবং আজও মধ্য ও দক্ষিণ জার্মানি, প্রুশিয়া, সুইজারল্যান্ড, স্পেন—এমন কি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের উপরেও নেপোলিয়ন-সংহিতার প্রভাব বিদ্যমান আছে!

ঘরের ব্যাপার ভালো করে গুছিয়ে নিয়ে নেপোলিয়ন বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

সশস্ত্র ইংলন্ড তাঁর বিরুদ্ধে। প্রুশিয়ার রাজাও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছেন। অস্ট্রিয়া আবার ইতালী কেড়ে নিয়েছে। ফ্রান্স একা এবং তার চারিদিকে বলবান শত্রু। অন্য কোন লোক হলে ভয়ে ভেঙে পড়ত। কিন্তু নেপোলিয়ন একটুও বিচলিত হলেন না।

ফ্রান্সে তখন আর একজন বড় সেনাপতি ছিলেন তাঁর নাম জেনারেল মোরো। অনেকেই তাঁকে নেপোলিয়নের সমকক্ষ বলে মনে করতেন এবং অনেকের মতে তাঁর সঙ্গে নেপোলিয়নের রেষারেষি ছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে নেপোলিয়ন যথেষ্ট উদারতা প্রকাশ করলেন। দেড় লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে মোরোকে তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন, ফ্রান্সের যত রণপ্রবীণ যোদ্ধা ছিল সেই বিপুল বাহিনীর মধ্যে। সেখানে মোরো, সেনাপতি নে ও গ্রাউচির সাহায্যে অস্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত হোহেন্‌লিন্ডেন যুদ্ধে (১৮০০ খৃ.) জয়লাভ করেন।

জেনারেল মেসেনাকে পাঠানো হল ইতালীতে। কিন্তু সেখানে ফরাসীরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারলে না। মেসেনা পিছু হটে জেনোয়া নগরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন—নগর হল অবরুদ্ধ। সুচেট নামে আর একজন ফরাসী সেনাপতিও অস্ট্রিয়ানদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। অস্ট্রিয়ার প্রধান সেনাপতি কাউন্ট মেলাস্ সানন্দে দেখলেন, তাঁর সামনে ফ্রান্সের দ্বার খোলা। অস্ট্রিয়ানরা সগর্বে বলতে লাগল—আমরা ইতালী জয় করেছি, এইবারে ফ্রান্সের উপরে হানা দেব।

নেপোলিয়ন বুঝলেন, অবিলম্বে সসৈন্যে ইতালীতে যেতে না পারলে সর্বনাশের সম্ভাবনা। কিন্তু সৈন্য কোথায়?·আসল ফৌজ তো জেনারেল মোরের সঙ্গে!

তিনি তাড়াতাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে অর্ধশিক্ষিত নতুন লোক নিয়ে যে ফৌজ গঠন করা হল, গুপ্তচরের মুখে তার খবর পেয়ে অস্ট্রিয়ানরা বেজায় ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে—তাদের খবরের কাগজে বেরুতে লাগল হরেক-রকম ব্যঙ্গচিত্র!

নেপোলিয়ন স্থির করলেন, অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি অস্ট্রিয়ানদের আক্রমণ করবেন।

একচক্ষু হরিণের মতন অস্ট্রিয়ান সেনাপতি মেলাসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইতালীতে আবদ্ধ অর্ধপরাজিত ফরাসীদের দিকে। এবং তিনি জানতেন, নেপোলিয়নকে আসতে হবে সমতল ক্ষেত্র দিয়ে।

নেপোলিয়ন ও মেলাসের মাঝখানে আছে য়ুরোপের হিমালয়, মহাপর্বত আল্‌প্‌স, এই মেঘচুম্বী হিমারণ্য পার হয়ে বিপুল এক বাহিনী যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এ-কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

কিন্তু নেপোলিয়ন বললেন, "দু-হাজার বৎসর আগে কার্থেজের মহাবীর হানিবল যা করতে পেরেছিলেন, আমরাই বা তা করতে পারব না কেন?"

এই অপূর্ব প্রস্তাব শুনে সৈনিকেরাও পরম উৎসাহিত হয়ে উঠল।

তুষার, তুষার, তুষার! ডাইনে বামে তুষারের প্রাচীরের পর তুষারের প্রাচীর, পায়ের তলায় তুষার-কর্দম, মাথার উপরে ঝরছে তুষার-বৃষ্টি! সংকীর্ণ পথের পাশে বিরাট অতল খাদ—ভীষণ মৃত্যুগহ্বর! কোথাও কোথাও পথের রেখা পর্যন্ত বিলুপ্ত। একটু শব্দ হলেই পাহাড়ের মতন বৃহৎ বরফের স্তূপ সেই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার রাজ্যকে বজ্র-রবে প্রকম্পিত করে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে এবং শত শত লোককে নিয়ে অতল পাতালের দিকে অদৃশ্য হয়। এরই ভিতর দিয়ে হাজার হাজার ফরাসী সৈন্য অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে, ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে। পদাতিক, অশ্বারোহী, মালবাহী সৈনিক! ভারি ভারি কামানের গাড়ি, রসদের গাড়ি! এক-একটি কামান টানতে দরকার হয় একশো লোক। নেপোলিয়ন নিজে সঙ্গে সঙ্গে থেকে তদ্বির করেন—সাধারণ সৈনিকের মতন তিনিও করেন সমান কষ্টভোগ।

কাউন্ট মেলাস্ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেন নি। পাভিয়া শহরের এক মহিলা-বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন, "তোমাকে পাভিয়া ত্যাগ করতে হবে না। ওখানে কোন বিপদের ভয় নেই।" ঠিক তার বারো ঘণ্টা পরে নেপোলিয়ন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

ইতিমধ্যে জেনোয়ার পতন হল, ফরাসী সেনাপতি মেসেনা আত্মসমর্পণ করলেন।

ওদিকে নেপোলিয়নের সঙ্গী সেনাপতি লেন্স্ মন্টিবেলো ক্ষেত্রে ভীষণ এক যুদ্ধে অস্ট্রিয়ানদের হারিয়ে দিলেন।

এই সু ও কু খবর একসঙ্গে নেপোলিয়নের কানে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি ধাবিত হলেন মেলাসের অধীনস্থ প্রধান শত্রু-বাহিনীর দিকে। দুইপক্ষে মিলন হল বিখ্যাত মারেঙ্গো ক্ষেত্রে (১৪ জুন, ১৮০০ খৃ.)।

মেলাসের সৈন্যসংখ্যা চল্লিশ হাজার। নেপোলিয়নের অধীনে বিশহাজারের বেশি সৈন্য ছিল না। তবু তিনি বীর-বিক্রমে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করলেন। তিনি সেনাপতি দেসেক্সের সঙ্গে পাঁচহাজার সৈন্য রেখে এগিয়ে এসেছিলেন এবং কথা ছিল এই সংরক্ষিত সেনাদল যথাসময়ে রণক্ষেত্রে আগমন করবে।

দুই পক্ষে যুদ্ধ হল বহুক্ষণ ধরে। কিন্তু চল্লিশ হাজার শত্রুর সঙ্গে বিশ হাজার ফরাসী শেষ পর্যন্ত যুঝতে পারলে না, তারা পশ্চাদপদ হতে লাগল।

মেলাস্ বিপুল আনন্দে তাঁর সহকারী জাক্‌কে ডেকে বললেন, "আমরা জয়লাভ করেছি! শত্রুরা পালাচ্ছে, তুমি অশ্বারোহীদের নিয়ে ওদের পশ্চাদ্ধাবন কর।" এই বলে তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। 'লড়াই তো শেষ হয়ে এল, আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করি কেন?'—তাঁর ভাবটা ছিল অনেকটা এইরকম আর কি!

নেপোলিয়ন যখন ভাবছেন ভাগ্যদেবী আমার উপরে আবার বিমুখ হয়েছেন, তখন প্রান্তরের প্রান্তে আবির্ভূত হল দেসেক্সের সংরক্ষিত সেনাদল।

দেসেক্স ঘোড়া ছুটিয়ে নেপোলিয়নের কাছে এসে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছি।"

নেপোলিয়ন বললেন, "আমার মনে হচ্ছে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি! তুমি আক্রমণ কর, আমি পলাতকদের ফিরিয়ে আনি।"

তাজা পাঁচহাজার সৈনিক নিয়ে দেসেক্স শত্রুদলের উপরে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যারা পালাচ্ছিল, নেপোলিয়নের উৎসাহবাণী শুনে তারাও আবার ফিরে দাঁড়াল। খানিক পরেই মারেঙ্গোর ক্ষেত্রে দশহাজার হতাহত অস্ট্রিয়ান সৈন্যের উপরে উড়তে লাগল ফরাসীদের বিজয়পতাকা! বন্দীও হল কয়েক হাজার শত্রু!

নেপোলিয়নের জীবনে মারেঙ্গো হচ্ছে একটি অদ্ভুত ও স্মরণীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি হেরেও জিতে গেলেন। এবং এই একটিমাত্র যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়ার সমস্ত লম্ফঝম্প বন্ধ হয়ে গেল, সন্ধি করে সে ইতালীকে আবার ফিরিয়ে দিলে

নেপোলিয়নের হাতে! কিন্তু যাঁর জন্যে মারেঙ্গো হল ফরাসীদের গৌরব-স্মৃতি, সেই সেনাপতি দেসেক্স রণক্ষেত্রেই বরণ করে নিলেন বীরের মৃত্যুকে।

ফরাসীরা যখন মারেঙ্গোর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন একজন পর্যটক ফ্রান্সের দিকে আসছিলেন সেইখান দিয়ে। তিনি সদলবলে দেসেক্সের আগমন দেখেন নি। ফ্রান্সে পৌঁছে তিনি দিলেন ফরাসীদের পরাজয়-সংবাদ! নেপোলিয়নের শত্রুরা যো পেয়ে অমনি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলে—প্রথম কন্সালকে তাড়াবার জন্যে! কিন্তু তাদের বড় আশায় পড়ল ছাই, কারণ তারপরেই এল এই অপূর্ব জয়লাভের সমস্ত সংবাদ—সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের মাথা হেঁট, মুখ বন্ধ!

মারেঙ্গোর যুদ্ধের পরে ফরাসী দেশে নেপোলিয়নের প্রভুত্ব হল সুপ্রতিষ্ঠিত। এবং ফরাসীরা বেশ বুঝলে, তাদের রক্ষা করতে পারেন একমাত্র নেপোলিয়নই।

নেপোলিয়নের ক্রমোন্নতি দেখে রাজপক্ষভুক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত ভীত হল। তারা ফ্রান্সের সিংহাসনে বিতাড়িত ও নির্বাসিত রাজবংশের কারুকে বসাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা যখন বুঝলে যে নেপোলিয়ন বেঁচে থাকতে তাদের বাসনা পূর্ণ হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, তখন তাঁকে হত্যা করবার ঘৃণ্য চেষ্টা হল।

নেপোলিয়ন একদিন সস্ত্রীক রঙ্গালয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ গাড়ির অনতিদূরেই ফাটল একটা মস্ত বোমা। আশপাশের বাড়িগুলোর ছাদ ভেঙে পড়ল এবং নেপোলিয়নের গাড়িরও জান্‌লাগুলো চুরমার হয়ে গেল—কিন্তু তিনি ও তাঁর স্ত্রী বেঁচে গেলেন আশ্চর্যভাবে।

অধিকাংশ য়ুরোপ হল নেপোলিয়নের বশীভূত। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন, ইতালী, রুসিয়া ও হল্যান্ড— সকলেই নেপোলিয়নের দলে। তাঁকে স্বীকার করতে নারাজ কেবল ইংলন্ড। নেপোলিয়ন স্থির করলেন এইবার তাঁর শেষ-শত্রু নিপাত করবেন।

ডানকার্ক্ ও বুলোন্ বন্দরে ইংলন্ড আক্রমণের বন্দোবস্ত হতে লাগল। নেপোলিয়ন নানা আকারের অনেক জাহাজ ও একলক্ষ সৈন্য এনে সেখানে জড়ো করলেন।

এই বন্দোবস্ত পণ্ড করবার জন্যে ইংলন্ড থেকে প্রেরিত হলেন নেলসন। ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের জলযুদ্ধ হল। যুদ্ধে হেরে ইংরেজরা পলায়ন করলেন। তাঁদের অনেক লোকও মারা পড়ল। নেপোলিয়নের সৈনিকদের কাছে নেলসনের এই প্রথম পরাজয়।

নেলসনের অসাফল্যে ইংলন্ডের ভাবনার আর সীমা রইল না। ইংরেজরা ভাবলেন, য়ুরোপে কেউ আমাদের বন্ধু নেই। নেপোলিয়ন যদি ইংলন্ড আক্রমণ

করেন তাহলে হয়তো আমরা তাঁকে ঠেকাতে পারব না। তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করে ফেললেন (১৮০২ খৃ.)। এই সন্ধি আমেন্সের সন্ধি নামে বিখ্যাত। দীর্ঘ দশবৎসর পরে য়ুরোপের সর্বত্র শান্তির প্রতিষ্ঠা হল। কেবল রণক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও নেপোলিয়নের যশ হল ষোলো কলায় পরিপূর্ণ।

ফ্রান্সের কৃতজ্ঞ জনসাধারণ নেপোলিয়নকে তখন আজীবনের জন্যে কন্সাল বলে স্বীকার করে নিলে।

নেপোলিয়ন শ্রেষ্ঠাসন লাভ করলেন। আর একপদ অগ্রসর হলেই, রাজমুকুট!

৬

মখ্‌মল-ঢাকা কাষ্ঠখণ্ড

রাজমুকুটের জন্যে নেপোলিয়ন অপেক্ষা করতে পারেন। তাঁর বয়স মোটে তেত্রিশ বৎসর! তিনি বেশ বুঝেছেন, মুকুট আছে তাঁর হাতের কাছেই।

কিন্তু তাঁর মনের কথা কি, জানে না তা কেউই।

একজন বললেন, "রাজপক্ষের লোকরা কি বলছে জানেন? 'নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী হবে কে?' কাল যদি আপনি মারা যান, আমাদের কি দশা হবে? আপনি উত্তরাধিকারী নির্বাচন করুন।"

—"সেটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

—"আপনার পদে কে বসবে জানতে পারলে ফ্রান্স হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।"

—"আমার সন্তান নেই।"

—"তাহলে দত্তক পুত্র গ্রহণ করুন।"

—"আমার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হচ্ছে ফ্রান্সের জনসাধারণ।"

নেপোলিয়ন বাইরে আত্মপ্রকাশ করলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তখনই তিনি পুত্র বা উত্তরাধিকারীর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

আরো এক বছর কয়েক মাস কেটে গেল। অখণ্ড শান্তির মধ্যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে সকল দিক দিয়ে মহান করে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন। ধনে-ধান্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে ফ্রান্স এমন উন্নত হয়ে উঠল যে, ঘরে ঘরে তাঁর নামে জয়জয়কার পড়ে গেল। রাজ্যের এমন কোন বিভাগ নেই যেদিকে পড়ল না তাঁর চোখ। নেপোলিয়ন বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কেবল যোদ্ধা নন, রাজোচিত সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে।

এই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে আবার এক ষড়যন্ত্র হল। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে গেল, ধরা পড়ল অনেক লোক। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের দুইজন বিখ্যাত

জেনারেল—পিচেগ্রু ও মোরো। বিচারে তের জনের হল মৃত্যুদণ্ড। একদিন দেখা গেল, পিচেগ্রু কারাগারেই গলায় দড়ি দিয়ে মারা পড়েছেন। কিন্তু হোহেনলিণ্ডেন-বিজয়ী মোরোকে অপরাধী জেনেও নেপোলিয়ন ক্ষমা করে নির্বাসন-দণ্ড দিলেন।

(যাঁরা বলেন নেপোলিয়ন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল মোরোকে বরাবরই পথ থেকে সরাতে চেয়েছেন, তাঁরা মিথ্যুক ও নিন্দুক। কারণ মোরোর এই গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁর নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হত। হল না খালি নেপোলিয়নের উদারতার জন্যে।

কিন্তু মোরো এ উদারতার সম্মান রাখেন নি। কারণ পরে তিনি প্রকাশ্যভাবেই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে করেছিলেন অস্ত্রধারণ।)

আর একজনও ধরা পড়লেন—তিনি হচ্ছেন ফ্রান্সের বিগত রাজবংশজাত ডিউক অফ ইংহিয়েন। তিনি জার্মান রাজ্যের বাসিন্দা, রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নেপোলিয়নের নাগালের বাইরে। তবু তাঁকে ধরে আনা হল। কাজটা বেআইনী হলেও বিচারে ডিউকেরও অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেল। তাঁরও হল প্রাণদণ্ড।

হয়তো ডিউক বেঁচে যেতেন, কিন্তু নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র-সচিব কূটরাজনীতি-বিদ টালিরাণ্ড্ ডিউকের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নকে উত্তেজিত করলেন। এই টালিরাণ্ড্ ছিলেন মুখে নেপোলিয়নের বন্ধু, মনে-মনে বিষম শত্রু। ডিউকের বেআইনী গ্রেপ্তার ও রাজরক্তপাতের জন্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে য়ুরোপে যে তুমুল আন্দোলন উঠবে, এটা তাঁর অজানা ছিল না।

ডিউকের প্রাণদণ্ড হয়ে গেলে টালিরাণ্ড্ নিজেই মতপ্রকাশ করেছিলেন, "এ হল অপরাধের চেয়ে খারাপ,—এ হল বিষম ভ্রম।"

ডিউকের মৃত্যুর জন্যে য়ুরোপ কি মতামত প্রকাশ করছে তা জানবার আগেই নেপোলিয়ন গিয়ে পড়লেন তাঁর জীবনের চরম উন্নতির স্রোতের মধ্যে!

ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন প্রবীণ সভ্য এলেন এই প্রস্তাব নিয়েঃ ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হোক্।

নেপোলিয়ন মুখে বলতেন, "সিংহাসন কি? একখানা কাঠ, মখ্‌মলে ঢাকা।" কিন্তু কাজে এই একখানা কাঠের লোভ সাম্‌লাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ঐ একখণ্ড মাত্র কাষ্ঠ পৃথিবীকে চিরদিন অভিভূত করে এসেছে—বিপ্লবের ও জনসাধারণের মানসপুত্র নেপোলিয়নও অভিভূত হলেন।

কিন্তু কোন্ উপাধি গ্রহণ করা যায়? ফ্রান্সের সিংহাসনে তাঁর আগে যাঁরা বসেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন 'রাজা'। ও নামের কোন মর্যাদাই আর নেই। নেপোলিয়ন উপাধি বেছে নিলেন 'সম্রাট'! কর্সিকার বিদেশী গৃহস্থের ও উকিলের

গরিব ছেলে হলেন য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন (১৮০৪ খৃ.)! উচ্চাকাঙ্ক্ষার কী সফলতা! মানুষের কল্পনাও স্তম্ভিত হয়ে যায়!

কিন্তু এর মধ্যে প্রহসনেরও অভাব ছিল না। প্রথম চার বৎসর মুদ্রার উপরে নেপোলিয়ন পরিচিত হতেন 'প্রজাতন্ত্রের সম্রাট' বলে। 'রাজা' উপাধি লুপ্ত ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে হাজার হাজার ফরাসী আত্মদান করেছে। বিপ্লবের বা বিদ্রোহের ধর্ম ফরাসীরা এখনো ভোলে নি। অতএব 'শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্'! প্রথম ধাপ 'প্রথম কন্সাল'। দ্বিতীয় ধাপ 'আজীবনের জন্যে কন্সাল'। তৃতীয় ধাপ 'সম্রাট'। চতুর্থ ধাপ 'প্রজাতন্ত্রের সম্রাট'। পঞ্চম ধাপে প্রজাতন্ত্রের নামও লুপ্ত হল। নেপোলিয়ন ফরাসীদের চিনেছেন। তাদের মন তৈরি করবার কৌশল তিনি জানেন!

সম্রাট নেপোলিয়নের পতাকার তলায় এসে দাঁড়াতে লাগল দলে দলে লোক। মাত্র বারো বৎসর আগে যারা ফ্রান্সের রাজার মৃত্যুদণ্ডের জন্যে 'ভোট' দিয়েছিল, তাদেরও একশো ত্রিশজন সম্রাটের অধীনে চাকরি নিতে আপত্তি করলে না! মাত্র বারো বৎসর পরে! মানুষ কী জীব!

সম্রাটের রাজসভা দরকার। এখানকার আইন-কানুন বা আদব-কায়দা নেপোলিয়নের জানা ছিল না। তার জন্যে ডেকে আনা হল পুরানো রাজসভার বিশেষজ্ঞগণকে! রাজসভায় উপাধিধারীদের দরকার! নেপোলিয়নের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা 'বড়' হয়েছেন, তাঁদের উপরে উপাধি বৃষ্টি হতে লাগল। বার্দিয়ার, মুরাট, লেন্‌স্, নে ও দাভউস্ট্ প্রভৃতি জেনারেলরা আর সাধারণ লোক রইলেন না—যদিও প্রথম জীবনে অনেকেই আস্তাবল, হোটেল বা জাহাজ-কেবিনের চাকর ছিলেন।

নেপোলিয়নের নখদর্পণে নরচরিত্র! তিনি বললেন, "ওদের আমি উপাধি দিচ্ছি কেন জানো? নিজেদের উপাধির মান রাখবার জন্যে ওরা আমার 'সম্রাট' উপাধিকে অমান্য করতে পারবে না!"

মা লেটিজিয়া, মা লেটিজিয়া! তিনি আজ সম্রাটজননী! মাতৃত্বের এর চেয়ে গর্ব ও সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? নেপোলিয়ন সাদরে তাঁকে প্যারিসে আহ্বান করলেন। কিন্তু তিনি আসতে নারাজ! ছেলের মাথায় রাজমুকুট দেখে তিনি সুখী হন নি, ভীত হয়েছেন। অনেক কষ্টে তাঁকে রাজধানীতে আনা হল।

সেকালকার য়ুরোপিয়ান সম্রাটরা অভিষেকের জন্যে যেতেন রোমে, পোপের কাছে। কিন্তু নেপোলিয়নের অভিষেকের জন্যে রোম থেকে এলেন স্বয়ং পোপ। রাজধানী হাসছে—ফুলের মালায় আর আলোর মালায়। চারিদিকে গান-বাজনা, উৎসব-আনন্দের সাড়া।

পোপ নেপোলিয়নের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিতে উদ্যত হলেন।

নিয়ম হচ্ছে, পুরোহিত যখন মুকুট পরাবেন, রাজা ও রানীকে তখন নতজানু হয়ে থাকতে হবে।

জীবনে কখনো যিনি কারুর কাছে নতজানু হন নি, এখন তিনি কি করেন দেখবার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

নেপোলিয়ন নতজানুও হলেন না, পোপকে মুকুট পরাতেও দিলেন না।

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, নেপোলিয়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোপের হাত থেকে টেনে নিয়ে মুকুট পরলেন স্বহস্তেই! তারপর তিনিই মুকুট পরালেন নতজানু জোসেফাইনকে! কেন? হয়তো এই ভেবেই যে, এ মুকুট তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেন নি, অর্জন করেছেন স্বহস্তেই (১৮০৪ খৃ.)!

পোপ এ অপমান ভুললেন না।

রাজদণ্ড হস্তে নেপোলিয়ন সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। তাঁর তখনকার মনের ভাব একটি কথায় প্রকাশ পায়। সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বড় ভাই জোসেফ। নেপোলিয়ন জনান্তিকে বললেন, "দাদা, বাবা যদি এ দৃশ্য দেখতে পেতেন!"

নেপোলিয়নের বয়স চৌত্রিশ বৎসর কয়েক মাস।

রুশিয়া এতদিন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি। তার প্রধান কারণ, পূর্ববর্তী জার পল ছিলেন নেপোলিয়নের প্রতিভার ভক্ত। পল এখন নিহত। সিংহাসনে বসেছেন তাঁর ছেলে। কিন্তু ডিউক অফ ইংহিয়েনের প্রাণদণ্ডের জন্যে নতুন জার আলেকজান্ডার হলেন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। সুইডেনের রাজাও গেলেন তাঁর দলে।

য়ুরোপে আর কোন মিত্রশক্তির সাহায্য-প্রাপ্তির আশা ছিল না বলে ইংলন্ড এতদিন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চুপচাপ ছিলেন। এইবারে রুসিয়াকে দলে পেয়ে ইংরেজরাও বেঁকে দাঁড়ালেন এবং রুশিয়ার সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেললেন।

অস্ট্রিয়া নিজের শোচনীয় পরাজয়ের অপমান ভুলতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে সে প্রাণপণে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের আয়োজন করছিল। এখন সেও দলে যোগ দিলে। সুইডেনও।

নেপোলিয়নের অভিষেকের এক বৎসর পরেই য়ুরোপের দিকে দিকে বেজে উঠল রণদেবতার ভেরী! চার বৎসর ধরে নেপোলিয়ন শান্তিরক্ষার জন্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আর সে চেষ্টার ফল ফলল না।

মারেঙ্গোর পাঁচ বৎসর পরে নেপোলিয়নকে আবার তরবারি ধরতে হল। এটা হল তাঁর যোদ্ধাজীবনের দ্বিতীয় স্তর এবং এই স্তরেই যোদ্ধা নেপোলিয়নের গৌরবোজ্জ্বল স্বরূপ যথার্থ ভাবে প্রকাশ পায়।

অস্ট্রিয়া ভেবেছিল, নেপোলিয়নের রণকৌশল সে আয়ত্ত করে ফেলেছে,

তাঁকে হারানো আর কঠিন হবে না। কিন্তু অস্ট্রিয়া বোঝে নি, প্রতিভা চলে নতুন নতুন পথ ধরে। তার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হবার দুই মাস আগে, ঘটনাস্থল থেকে ছয়-সাতশো মাইল দূরে স্বদেশে বসে নেপোলিয়ন এবারকার যুদ্ধে যা-যা করতে হবে, সমস্তই ঠিক করে ফেলেছিলেন!

তাঁর বিরুদ্ধে য়ুরোপের তিন শ্রেষ্ঠ শক্তি একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে দেখে তিনি একটুও ভীত হলেন না। প্রথমে তিনি ইংলন্ড আক্রমণের জন্যে সমুদ্র-তটে সৈন্য সাজাচ্ছিলেন; কিন্তু অস্ট্রিয়ানরা অগ্রসর হচ্ছে শুনে তাকেই আগে জব্দ করতে ছুটে চললেন।

এবারকার অস্ট্রিয়ান সেনাপতির নাম, ম্যাক্। নেপোলিয়ন তাঁর সেনাদলকে সাত ভাগে বিভক্ত করলেন। কয়েক দলকে পাঠিয়ে দিলেন দানিয়ুব নদী পার হয়ে অস্ট্রিয়ানদের পিছনে গিয়ে পড়বার জন্যে। আরো দুদিক থেকে সেনাপতি দুপনত্ ও নে-র অধীনস্থ দুই দল সৈন্য অস্ট্রিয়ানদের বাধা দিতে লাগল। কিছু বোঝবার আগেই ম্যাক্ সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর পিছনে শত্রু, ডাইনে শত্রু, বাঁয়ে শত্রু! নিরুপায় হয়ে তিনি উল্‌ম্ নগরের দিকে এসে সৈন্য-সমাবেশ করলেন।

নেপোলিয়নের দূত গিয়ে বললেন, "সেনাপতি, আত্মসমর্পণ করুন।"

ম্যাক্ সগর্বে বললেন, "আটদিনের জন্যে যুদ্ধ স্থগিত থাকুক। নইলে মৃত্যুই শ্রেয়।"

দূত বললেন, "যুদ্ধ বন্ধ হবে না।"

ম্যাক্ বললেন, "তবে আত্মসমর্পণই করছি।" হাস্যকর ব্যাপার! তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যে নেপোলিয়ন, দূত আসবার আগে পর্যন্ত ম্যাক্ সে-কথাও জানতেন না! উল্‌মের যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ানরা একটা বন্দুক ছোঁড়বারও সুযোগ পায় নি! এমন আশ্চর্য যুদ্ধজয়ের কাহিনী ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই (১৮০৫ খৃ.)।

নেপোলিয়ন বললেন, "সৈন্যগণ, পনের দিনের মধ্যে আমরা অস্ট্রিয়ানদের ব্যাভেরিয়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি; এক লক্ষ শত্রুর ভিতরে বন্দী হয়েছে ষাট হাজার নব্বই জন। আমাদের জয়চিহ্ন হচ্ছে দুই শত কামান আর আশীটা পতাকা। কিন্তু এখনো আমাদের সামনে রয়েছে আর একটা যুদ্ধ। ইংরেজরা পৃথিবীর শেষ-প্রান্ত থেকে ডেকে এনেছে রুশিয়ানদের। এবারে আমাদের লড়তে হবে তাদের সঙ্গেই। এই যুদ্ধই বলে দেবে, ফরাসী সৈন্যেরা য়ুরোপে অধিকার করবে প্রথম কি দ্বিতীয় স্থান!"

ওদিকে ঠিক পরের দিনেই নেলসন ট্রাফাল্‌গারের জলযুদ্ধে ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত নৌবাহিনীকে হারিয়ে দিয়ে নিজে মারা পড়লেন।

নেপোলিয়ন এবার আর কোথাও থামলেন না। শত্রু তাড়াতে তাড়াতে

প্রথমে তিনি অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পার হলেন। তারপর একেবারে প্রবেশ করলেন তার রাজধানী ভিয়েনা নগরে।

কিন্তু অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ একটুও দমলেন না, সসৈন্যে পিছিয়ে গিয়ে রুশিয়ার সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের দলে রুশ ও অস্ট্রিয়ান সৈন্য ছিল আশী হাজার।

নেপোলিয়নের সৈন্য-সংখ্যা মাত্র ষাট হাজার। কিন্তু পুরো ষাট হাজার সৈন্যও তিনি কাজে লাগাতে পারলেন না। অধিকৃত অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে ও নানা স্থানে অনেক সৈন্য রক্ষীরূপে রেখে তাঁকে এগিয়ে আসতে হল। যুরোপের সকলেরই দৃঢ় ধারণা হল, আর নেপোলিয়নের রক্ষা নেই। নেপোলিয়নও বুঝলেন, এবারের যুদ্ধে হারলে তাঁর মুকুট তো ধুলোয় লুটোবেই, উপরন্তু তাঁর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিণত হবে নিষ্ফল স্বপ্নে। কারণ, গত মাসের একুশ তারিখে ট্রাফালগারের জলযুদ্ধে ইংরেজরা তাঁর সমস্ত নৌবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। যদিও সে পরাজয়ের জন্যে তিনি দায়ী নন, কিন্তু জলপথ তাঁর হাতছাড়া হয়েছে। এর উপরে স্থলে হারলে কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই তিনি যুদ্ধের ফন্দি স্থির করতে লাগলেন খুব সাবধানে।

অতঃপর আমরা যে-যুদ্ধের কথা বলব, নেপোলিয়নের জীবনে সেইটিই হচ্ছে সবচেয়ে গৌরবজনক যুদ্ধ! সুতরাং তার আলোচনা করব বিস্তৃত ভাবেই।

ব্রান্ নামক স্থানে নেপোলিয়ন নিজের সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। রুশ ও অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা সেইখানে তাঁকে আক্রমণ করতে এল।

কিন্তু নেপোলিয়নের পরিকল্পনা তখন সম্পূর্ণ। তিনি সসৈন্যে পিছিয়ে আসতে লাগলেন, এবং ফরাসীদের দক্ষিণ পার্শ্বটাকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে দিলেন এই মতলবে, শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠুক! শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের জন্যে যদিও তাঁর এই পদ্ধতিটা অত্যন্ত বিপদ্‌জনক, তবু তিনি ভয় পেলেন না।

শত্রুরা নেপোলিয়নের কৌশল বুঝলে না, ভাবলে চমৎকার সুযোগ উপস্থিত! তারা মহোৎসাহে অগ্রসর হল। যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে ফরাসীরা আরো পিছিয়ে পড়তে লাগল। এমন-কি দু-একটা ছোটখাটো সংঘর্ষে তারা পলায়নেরও অভিনয় করলে! নেপোলিয়ন নিজেও রুশ-সম্রাট্ আলেকজান্ডারের কাছে চব্বিশ ঘণ্টার যুদ্ধ-নিবৃত্তির জন্যে আবেদন করলেন। তিনি জানতেন, সে আবেদন গ্রাহ্য হবে না এবং রুশ-সম্রাট্ ভাববেন যে, তিনি সমস্ত দলবল নিয়ে নিরাপদে পালাবার জন্যেই যুদ্ধ থামাবার অনুরোধ করছেন। ফলে শত্রুরা অধিকতর উৎসাহিত হয়ে আরো তাড়াতাড়ি তাঁকে আক্রমণ করতে আসবে!

নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। শত্রুরা বোকার মতন ফাঁদে পা দিলে। পয়লা ডিসেম্বর তারিখে ফরাসীদের পশ্চাৎপদ দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্যদের বেষ্টন করবার জন্যে অধিকাংশ শত্রুসৈন্য তাদের ব্যূহের বামদিকে গিয়ে সমবেত হল। নেপোলিয়নের ফন্দি ছিল এই, শত্রু-ব্যূহের মধ্যভাগ রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়ল।

যুদ্ধের ফল যে কি হবে, সে-সম্বন্ধে নেপোলিয়নের আর কোনই সন্দেহ রইল না। তিনি সানন্দে দৃঢ়স্বরে বললেন, "কালকের সূর্যাস্তের আগেই শত্রুরা আসবে আমাদের হাতের মুঠোর ভিতরে!"

এ-বিষয়ে তিনি এতটা নিশ্চিত হলেন যে, তখনি একখানা প্রচারপত্র ছাপিয়ে নিজের সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন, "শত্রুরা আমাদের ডান পাশ পেরিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করতে এসে নিজেদের পার্শ্বদেশ অরক্ষিত করে ফেলছে!"

ফরাসীরা তখন অস্টারলিট্‌জ্ ক্ষেত্রে এসে তাঁবু ফেলেছে। রাত হল। নেপোলিয়ন খুশি মনে বিশ্রাম করতে গেলেন। পরের দিন দোস্‌রা তাঁর সিংহাসন আরোহণের প্রথম বাৎসরিক উৎসব।

রাত্রি প্রভাত। সেদিনকার সূর্যের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য দেখে ফরাসী সৈন্যরা বিপুল আনন্দে তার জয়গান করে উঠল। এ সূর্য তারপর তাদের কাছে "অস্টারলিট্‌জের সূর্য" বলে বিখ্যাত হয়েছিল। অস্টারলিট্‌জ্ একটি ছোট গ্রামের নাম। য়ুরোপের অন্য কোন দেশ তার নাম পর্যন্ত জানত না। কিন্তু আজ থেকে সে কেবল পৃথিবীবিখ্যাত নয়, ইতিহাসেও অমর হয়ে রইল।

যুদ্ধ আরম্ভ হল ফরাসীদের দক্ষিণ পার্শ্বেই। এদিকে ছিলেন দু-জন ফরাসী নায়ক— সোল্ট্ ও ডাভোট্। এখানকার জমিটা ছিল জলাভূমি ও তার উপরে ভাসছে এমন পাতলা বরফের আচ্ছাদন যে, পায়ের চাপেই ভেঙে যায়! কাজেই ফরাসীদের পক্ষে শত্রুদের বাধা দেবার সুবিধা হল যথেষ্ট। সোল্ট্ ও ডাভোটের উপরে হুকুম ছিল, একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যেমন করেই হোক্ শত্রুদের নিযুক্ত করে রাখবার জন্যে।

নেপোলিয়নের অভিপ্রায় হচ্ছে এই : অধিকাংশ শত্রু যখন ফরাসীদের ডান পাশে গিয়ে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে থাকবে, তখন তিনি নিজের বাম পাশের ও মধ্যভাগের সমস্ত সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের দক্ষিণ পার্শ্ব ও মধ্যভাগ আক্রমণ করবেন। শত্রু-ব্যূহের ঐ দুই অংশের সৈন্যরা দলে হাল্‌কা, সুতরাং ফরাসীদের আক্রমণ সইতে পারবে না, ফলে তাদের বাম পাশের সৈন্যরা ব্যূহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়বে।

শত্রুদের বাম পার্শ্বের সঙ্গে ফরাসীদের দক্ষিণ পার্শ্বের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হল। শত্রুরা এখানে দলে ভারি, কিন্তু জলাভূমির সাহায্য পেয়ে ফরাসীরা দলে

হাল্কা হয়েও শত্রুদের প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল। উচ্চভূমির উপর থেকে দলে দলে আরো বেশি শত্রু-সৈন্য ক্রমাগত এইদিকেই নেমে আসতে লাগল ফরাসীদের একেবারে চেপে মেরে ফেলবার জন্যে! আসন্ন জয়লাভের উত্তেজনায় শত্রু-সেনাপতিদের এ খেয়াল একবারও হল না যে, নিজেদের বাম পার্শ্বে তাঁরা যত-বেশি সৈন্য সরবরাহ করছেন, তাঁদের দক্ষিণ পার্শ্ব ও মধ্যভাগ তত দুর্বল হয়ে পড়ছে!

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। ডান পাশের ফরাসীরা সংখ্যাতীত শত্রুদের আর বুঝি বাধা দিতে পারে না! নিজের সাদা ঘোড়ার পিঠে স্থির পাথরের মূর্তির মতন বসে নেপোলিয়ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন।

অনেকে এসে বারংবার বলতে লাগল, "সম্রাট্ হুকুম দিন! আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্যরা আর আত্মরক্ষা করতে পারছে না—আমরা গিয়ে ওদের সাহায্য করি।"

নেপোলিয়ন গম্ভীর স্বরে বলেন, "না! এখনো সময় হয় নি।"

তারপর বন্দুক ও কামানের গর্জন, আহতদের আর্তরব ও যোদ্ধাদের সিংহনাদ যখন চরমে উঠেছে, নেপোলিয়ন তখন বুঝলেন তাঁর মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত!

এতক্ষণ শত্রুদের বামপার্শ্ব আক্রমণের পর আক্রমণ করছিল এবং ডানপাশের অল্পসংখ্যক ফরাসীরা করছিল কেবল আত্মরক্ষা। কিন্তু অধিকাংশ ফরাসী সৈন্য এখন পর্যন্ত চিত্রলিখিতের মতন স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে প্রধান সেনাপতির বা সম্রাটের আদেশের অপেক্ষা করছিল। এইবারে নেপোলিয়ন আদেশ দিলেন—"অগ্রসর হও! আক্রমণ কর!"

নেপোলিয়নের বিভিন্ন বিভাগের সেনানায়করা—লেন্স্, বার্নাডোটে, লেগ্রাণ্ড্ ও সেন্ট্-হিলেয়ার প্রভৃতি হুকুম পেয়েই আপন-আপন পল্টনের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফরাসীদের আক্রমণ আরম্ভ হল।

রুশ সৈন্যরা তখন উচ্চভূমি বা পাহাড়ের উপর থেকে নেমে তির্যক বা তের্ছা ভাবে ফরাসীদের দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। আচম্বিতে ফরাসীদের বামপার্শ্ব থেকে এই প্রবল আক্রমণের জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ের ধাক্কা সাম্লাবার আগেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাৎপদ হতে লাগল। ফরাসীরা তাদের ঠেলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের আশে-পাশে ছড়িয়ে দিলে এবং নিজেরা উচ্চভূমি দখল করলে। শত্রুদের এ অংশে ছিল Reserve বা সংরক্ষিত সৈন্য এবং এর মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রুশ সম্রাট্।

রুশ ফৌজের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ—অর্থাৎ রক্ষী সৈন্যরা তখন অস্টারলিট্জের ক্ষেত্র দিয়ে ফরাসীদের ডান দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তারাও ফরাসীদের মধ্যভাগ

থেকে এই অভাবিত আক্রমণে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রুশ সম্রাট্ ও অন্যান্য সেনাপতিরা এসে পড়ে তাদের আবার উৎসাহিত করে তুললেন। রুশ রক্ষী সৈন্যরা প্রতিআক্রমণ করলে এবং দেখতে দেখতে ফরাসীরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। অনেকে পালাতেও লাগল।

যুদ্ধক্ষেত্রের এ অংশটা ছিল নেপোলিয়নের চোখের আড়ালে। কিন্তু কোলাহল শুনেই তিনি আন্দাজ করলেন, গতিক সুবিধার নয়। তাড়াতাড়ি সেনাপতি র‍্যাপ্‌কে ডেকে বললেন, "যাও, যাও! ব্যাপার কি দেখে এস!"

কয়েক দল রক্ষী সৈন্য নিয়ে র‍্যাপ্ ছুটে গেলেন। পথিমধ্যে তাঁকে দেখে ও তাঁর উৎসাহবাণী শুনে পলাতক ফরাসীরা আবার ফিরে দাঁড়াল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে র‍্যাপ্ দেখলেন, বিজয়ী রুশীয়রা তরবারি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ ফরাসীদের খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছে! র‍্যাপের নতুন সৈন্যদের দেখে শত্রুরা কামান সাজাতে আরম্ভ করলে।

কিন্তু র‍্যাপ্ তাদের কামান ছোঁড়বার সময় দিলেন না। চীৎকার করে বললেন, "সৈন্যগণ, তোমাদের বন্ধুদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও!" ফরাসী রক্ষীরা রুশ রক্ষীদের আক্রমণ করলে।

দুই পক্ষের রক্ষীদের মধ্যে যখন বিষম যুদ্ধ চলছে, সেই অবসরে ছত্রভঙ্গ ফরাসীরা আবার শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ফিরে দাঁড়াল। আধঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের গতি আবার ফিরে গেল। রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দুই সম্রাটের চোখের সামনে তাদের সৈন্যদের মৃতদেহের স্তূপ ক্রমেই উচ্চ হয়ে উঠতে লাগল! রুশরা পালাতে আরম্ভ করলে।

রক্তাক্ত দেহে ভগ্ন তরবারি হস্তে র‍্যাপ্ ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে নেপোলিয়নকে বললেন, "সম্রাট্, শত্রুরা পলায়ন করছে!"

শত্রুদের বামপার্শ্ব তখন প্রধান দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! ফরাসীদের ঘিরে ফেলতে এসে শত্রুরা সভয়ে দেখলে, এখন তাদেরই তিন দিকে ফরাসী সৈন্য! দলে দলে তারা মারা পড়তে লাগল। বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে শত্রুরা বরফে-ঢাকা এক হ্রদের উপর দিয়ে পালাতে শুরু করলে। অত সৈন্যের পদভার সইতে না পেরে হুড়্মুড় করে ভেঙে গেল তুষারের আচ্ছাদন। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হ্রদ যেন হাঁ করে গিলে ফেললে হাজার হাজার মানুষকে। সে ভীষণ দৃশ্য দেখে বিজয়ী ফরাসীরাও ভয়ে শিউরে উঠল!

এই হল চিরস্মরণীয় অস্টারলিট্‌জ্ যুদ্ধ (২ ডিসেম্বর, ১৮০৫)।

তিরাশী হাজার রুশ ও অস্ট্রিয়ান সৈন্যদের মধ্যে প্রায় অর্ধাংশ হত, আহত বা বন্দী হল। রুশ সম্রাট্ নিজের দেশে পালিয়ে গেলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ সেইদিন

সন্ধ্যাতেই নেপোলিয়নের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করতে এলেন। প্রুশিয়ার অধিপতি ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখে মুষড়ে পড়ে নেপোলিয়নের অদ্ভুত বিজয় লাভের জন্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ট্রাফালগারের জলযুদ্ধে জিতে ইংলন্ড আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অস্টারলিট্‌জের আশ্চর্য খবর সে আশাকে পরিণত করলে গভীর নিরাশায়! অস্টারলিট্‌জে নেপোলিয়নের আশ্চর্য যুদ্ধ-কৌশল নেলসনের বিজয় গৌরবকে করে দিলে পরিম্লান। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ন পিট্ ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। নেপোলিয়নের শত্রুদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল।

অস্টারলিট্‌জের যুদ্ধ হচ্ছে নেপোলিয়নের অপূর্ব রণপ্রতিভার অতুলনীয় নিদর্শন। যুদ্ধের শেষে তিনি সৈন্যদের সম্বোধন করে এই কথাগুলি বলেছিলেন :

"সৈন্যগণ, সাবাস! তোমাদের সাহসের কাছ থেকে আমি যা যা প্রত্যাশা করেছিলুম, অস্টারলিট্‌জের যুদ্ধে তোমরা সে-সমস্তই সফল করেছ; তোমাদের ঈগল-চিহ্নিত পতাকাকে তোমরা অমর যশগৌরবে মণ্ডিত করে তুলেছ। রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট্‌দ্বয়ের দ্বারা পরিচালিত একলক্ষ সৈন্যকে তোমরা চার ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে বিতাড়িত বা বন্দী করেছ। যারা তোমাদের হাত ছাড়িয়ে পালাতে গিয়েছিল, তারা হ্রদের জলে ডুবে মরেছে। এই চিরন্তন মহিমায় সমুজ্জ্বল যুদ্ধের ফল হচ্ছে চল্লিশটি শত্রু-পতাকা, একশো-কুড়ি কামান, কুড়িজন সেনাপতি ও ত্রিশ হাজারেরও বেশি বন্দী। সংখ্যায় প্রবল হয়েও শত্রুরা তোমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে নি, এর পরে তোমাদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় করতে হবে না।... ভবিষ্যতে তোমাদের দলের কেউ যদি বলে যে—'আমি অস্টারলিট্‌জের যুদ্ধে হাজির ছিলুম', তাহলে উত্তরে সে এই কথাই শুনবে—'তাহলে তুমি হচ্ছ মহাবীরদেরই একজন'!"

৭

অধঃপতনের পূর্বাভাস

নেপোলিয়নের সূর্য এখন মধ্য-গগনে। য়ুরোপে শত্রুর অভাব নেই, কিন্তু কেউ আর তাঁর সুমুখে দাঁড়াতে ভরসা করে না। অস্টারলিট্‌জের ফলাফল দেখে সকলে স্তম্ভিত।

নেপোলিয়ন তাঁর দাদা জোসেফকে বসিয়ে দিলেন নেপ্‌ল্‌সের সিংহাসনে। আর এক ভাই লুইকে পরালেন হল্যান্ডের রাজমুকুট।

ফ্রান্সের সীমান্তে তখন একমাত্র যথার্থ স্বাধীন রাজ্য ছিল প্রুশিয়া। তার নিয়মিত সৈন্য-সংখ্যা দেড় লক্ষ। গত বৎসরে সে সম্মিলিত শক্তিদের সঙ্গে যোগদান করে নি বটে, কিন্তু এখন তার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

প্রুশিয়ার আশপাশের ক্ষুদ্রতর জার্মান রাজ্যগুলি প্রুশিয়ার সম্রাট্‌কে নিজেদের মধ্যে প্রধান বলে মেনে চলত। কিন্তু নেপোলিয়ন তাদের এক নতুন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করলেন—যার ফলে এবার থেকে তাঁকেই তারা অধিরাজ বলে স্বীকার করবে।

প্রুশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, তার উপরে রুশিয়ার জার আলেকজান্ডার তাঁকে আরো উত্তেজিত করে বললেন, "আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করুন, আমিও আপনাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করব।"

প্রুশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করলে। প্রুশিয়া তখনো নেপোলিয়নকে চেনে নি। তার সৈন্যরা সগর্বে ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হল।

তারা কিছু জানতে পারবার আগেই নেপোলিয়ন সসৈন্যে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে তাদের পিছনে গিয়ে পড়লেন—ফলে দেশ থেকে প্রুশিয়ানদের নতুন সৈন্য ও রসদ আসবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একদিকে ফরাসী দেশ, আর একদিকে ফরাসী সৈন্য!

প্রুশিয়ানদের তখন প্রধান লক্ষ্য হল, স্বদেশে ফেরবার পথ সাফ করা। তারপর একদিনেই জেনা ও অয়েরস্টাড্‌ট্‌ নামক দুই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রুশিয়ার দুই বাহিনীর সঙ্গে নেপোলিয়নের দুই ফৌজের শক্তিপরীক্ষা হল (১৮০৬ খৃ.)।

পরীক্ষার ফল? চমকপ্রদ! সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে প্রুশিয়ানরা পলায়ন করলে। এবং তার তেরদিন পরে বিজয়ী নেপোলিয়ন প্রবেশ করলেন প্রুশিয়ার রাজধানী বার্লিন শহরে। সমস্ত প্রুশিয়া-রাজ্য ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতন।

বার্লিন শহরে বসে নেপোলিয়ন দিকে দিকে আদেশ-বাণী পাঠালেন, "আজ থেকে য়ুরোপের আর কোন দেশ ইংলন্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বা অন্য কোন-কিছুর সম্পর্ক রাখতে পারবে না। যে কোন দেশে ইংরেজ নামলেই বন্দী হবে। যে কোন বন্দরে ইংরেজ জাহাজ এলেই বাজেয়াপ্ত হবে।"

এইবার রুশিয়া এল নেপোলিয়নকে আক্রমণ করতে। ইলাউ প্রান্তরে সম্মিলিত রুশ ও প্রুশিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে ফরাসীদের এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রুশ আর প্রুশিয়ানদের আঠারো হাজার ও ফরাসীদের পনেরো হাজার লোকক্ষয় হয়। সারাদিন মরিয়ার মতন লড়ে দুই পক্ষই শেষটা হাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে ক্ষান্তি দেয় এবং দুই পক্ষই বলে—"জয়লাভ করেছি আমরা" (১৮০৭ খৃ.)!

তারপরেই ফ্রেড্‌ল্যান্ড ক্ষেত্রে দুই পক্ষের আবার দেখা হল। সকাল দশটা

থেকে বৈকাল চার-পাঁচটা পর্যন্ত সমানে লড়াই চলল। অবশেষে নেপোলিয়ন নিজে সমস্ত সৈন্য নিয়ে শত্রুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, রুশ ও প্রুশিয়ানরা সে আক্রমণ সহ্য করতে পারলে না। যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ণ বারো হাজার মৃতদেহ ফেলে বাকি সৈন্য নিয়ে রুশ জেনারেল বেনিগ্‌সেন বেগে পলায়ন করলেন।

রুশিয়ার জার ও প্রুশিয়ার রাজা তখন সন্ধি করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখলেন না, এই সন্ধির নাম টিলসিটের সন্ধি (১৮০৭ খৃ.)। এই বছরেই নেপোলিয়ন তাঁর ছোট ভাই জেরোম বোনাপার্টকে প্রুশিয়ার অন্যতম প্রদেশ ওয়েস্টফালিয়ার সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

বিজয়-পতাকা উড়িয়ে নেপোলিয়ন ফিরে এলেন আবার স্বদেশে। য়ুরোপে তিনি হলেন সকল রাজার মাথার মণি—মহারাজাধিরাজ!

তারপর নেপোলিয়নের প্রধান কর্তব্য হল, য়ুরোপের সমুদ্র তীরবর্তী সকল দেশ থেকে ইংলন্ডের প্রভুত্ব লুপ্ত করা। তাঁর শক্তি তখন অসীম, তাঁর মুখের একটি মাত্র কথায় য়ুরোপের সর্বত্র রাজ্যের নাম বদ্‌লে যায়, রাজার মুকুট খসে পড়ে। তিনি ভয় দেখিয়ে সুইডেন ও পর্তুগালকে বাধ্য করলেন এবং গোপনে স্পেনের সম্মতি নিয়ে করলেন পর্তুগালের অঙ্গচ্ছেদ। তারপর ফরাসী সৈন্যরা একে একে স্পেনের দরকারি জায়গাগুলি দখল করে সর্বশেষে তার রাজধানী মাদ্রিদও অধিকার করলে। অন্যায় ও চতুর কৌশলের দ্বারা স্পেনের বুর্বন-বংশীয় রাজাদের তাড়িয়ে সিংহাসনে বসানো হল জোসেফ বোনাপার্টকে (১৮০৮ খৃ.)। এবং জোসেফের পরিত্যক্ত নেপ্‌ল্‌সের সিংহাসন লাভ করলেন তাঁর ভগ্নীপতি মুরাট। ওদিকে রোমের পোপের অধিকৃত প্রদেশের উপরেও ভাগ বসানো হল। পোপ ক্রুদ্ধ হয়ে নেপোলিয়নকে ধর্মসমাজচ্যুত করলেন (১৮০৯ খৃ.)।

সমস্ত য়ুরোপকে স্ববশে আনবার চেষ্টা করার মধ্যে নেপোলিয়নের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় নি। তাঁর পক্ষে খুব একটা বড় যুক্তি ছিল নিশ্চয়ই এবং সে যুক্তি হচ্ছে, ইংলন্ডের গর্ব খর্ব করা। আট-ঘাট বেঁধে বাণিজ্যজীবী ইংলন্ডকে জব্দ করতে পারলে নেপোলিয়নের আর কোন ভাবনা থাকবে না। আজকের হিটলারও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু স্পেনের স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণ ফরাসীদের প্রভুত্ব মাথা পেতে গ্রহণ করলে না। তারা বিদ্রোহী হল এবং সুযোগ বুঝে ইংলন্ডও তাদের সাহায্যের জন্যে সৈন্য পাঠিয়ে দিলে। তার ফলে, ১৮০৮ খৃস্টাব্দ থেকে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত নেপোলিয়নকে স্পেন দেশে প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হল। এইখানেই ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন প্রথম নাম কেনেন।

ফরাসী সেনাপতিরা ছোট ছোট যুদ্ধে তাঁর কাছে হেরেও যান। ব্যাপার দেখে শেষটা নেপোলিয়নও স্পেনে গিয়ে হাজির হন। অল্পদিনের ভিতরেই তিনি স্পেনের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় আবার ফরাসীদের বিজয়-পতাকা উড়িয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন, অন্যান্য সেনাপতিদের হাতে কর্তব্য-ভার অর্পণ করে। কিন্তু নেপোলিয়নের অবর্তমানে ফরাসীরা আবার কাহিল হয়ে পড়ে। ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে থাকে—কিন্তু কোনটাই খুব বড় যুদ্ধ নয়। কখনো জেতে ফরাসীরা, কখনো ইংরেজরা।

নেপোলিয়ন স্পেনের যুদ্ধ ও বিদ্রোহ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে পারেন নি, কারণ তার চেয়েও ঢের বড় বড় হাঙ্গামা নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

টিল্‌সিটের যুদ্ধের পর কিছুকাল কাটল বেশ ভালোয় ভালোয়। কিন্তু ধীরে ধীরে আকাশে আবার মেঘ হতে লাগল পুঞ্জীভূত। অস্ট্রিয়া আবার শান্তিভঙ্গের চেষ্টা আরম্ভ করলে। কিন্তু জাতে এক হলেও প্রুশিয়া আপাতত অস্ট্রিয়ার দলে ভিড়তে রাজি হল না, তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

নেপোলিয়ন স্পেন নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন দেখে অস্ট্রিয়ার সাহস বাড়ল এবং সে যুদ্ধ না করে ছাড়বে না দেখে নেপোলিয়ন তাড়াতাড়ি স্পেন থেকে চলে এলেন; কারণ আর্ক্ ডিউক চার্লস্ প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

এবারে নেপোলিয়নের সঙ্গে ফরাসী সৈন্য ছিল না বললেই চলে। তাঁকে যুদ্ধযাত্রা করতে হল মিত্র জার্মান রাজাদের সেনাদল নিয়ে। এবারকার অভিযানে তিনি প্রমাণিত করলেন, যুদ্ধজয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে, সেনাপতির নিজস্ব প্রতিভা!

এক হপ্তার মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট যুদ্ধের পরই খবর পাওয়া গেল যে, নেপোলিয়ন শত্রুদের কাছ থেকে আদায় করেছেন একশোটা কামান ও চল্লিশটা পতাকা এবং বন্দী করেছেন পঞ্চাশ হাজার সৈন্য! ফ্রান্সের যুদ্ধ জিতছে জার্মানরা! এই সময়ে নেপোলিয়ন জীবনে দ্বিতীয় ও শেষবার শত্রুর গুলিতে সামান্য ভাবে আহত হন।

তারপর এস্‌লিং ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন বহুকাল পরে প্রথমবার পরাজিত হলেন। অস্ট্রিয়ানরা জিতেছিল সংখ্যাধিক্যের জন্যে। এই যুদ্ধে তাঁর মহাবীর ও বিশ্বস্ত সেনাপতি লেন্‌স্ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে মারা পড়লেন। তাঁর মৃত্যুভয় ছিল না, কিন্তু নেপোলিয়নের সঙ্গে থেকে আর সে গৌরব অর্জন করতে পারবেন না তাই নিয়েই বারংবার হাহাকার করতে লাগলেন।

অন্যান্য সেনাপতিরা নেপোলিয়নকে পলায়ন করবার পরামর্শ দিলেন।

নেপোলিয়ন দৃঢ়স্বরে বললেন, "না! এখন থেকে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাই

হবে আমার রাজধানী—আমার আশ্রয়স্থল। আমি তাকে ছাড়বও না, নিজেও পিছু হটব না!"

দেখতে দেখতে সাম্রাজ্যের চারিদিক থেকে দলে দলে ফরাসী সৈন্য ছুটে এল নেপোলিয়নকে সাহায্য করতে। প্রায় দেড়লক্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি বিখ্যাত ওয়াগ্রাম যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ানদের এমন ভাবে পরাজিত করলেন যে, শত্রুরা আর সেখানে দাঁড়াল না (১৮০৯ খৃ.)।

নেপোলিয়ন আবার ভিয়েনায়! সন্ধি হয়ে গেল।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে এলেন। তারপরের প্রধান ঘটনা হচ্ছে জোসেফাইনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ।

সবাই বলতে লাগল এবং তিনি নিজেও বুঝলেন যে, উত্তরাধিকারী না থাকলে তাঁর মৃত্যুর পরে ফ্রান্সের সিংহাসন নিয়ে অনেক বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা। রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাট-দুহিতা মেরিয়া লুইসাকে তিনি দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন (১৮১০ খৃ.)। এবং পরের বছরেই তিনি লাভ করলেন একটি পুত্রসন্তান। সারা দেশে পড়ে গেল সমারোহের সাড়া! আপাতত নবপুত্রের উপাধি হল "রোমের রাজা"। রোমে তখন পোপ ছিলেন না। কারণ ইতিমধ্যেই তাঁকে ধর্মসমাজচ্যুত করেছিলেন বলে নেপোলিয়নের হুকুমে পোপ হয়েছেন নির্বাসিত ও সিংহাসনচ্যুত!

কিছুকাল সুখ-শান্তিতে কাল কাটাবার পর নেপোলিয়ন আবার শুনতে পেলেন রুশ-ভল্লুকের গর্জন!

সত্য সত্যই নেপোলিয়নের আর অস্ত্র ধরবার সাধ ছিল না। মানব-জীবনের যা-কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, সমস্তই সফল হয়েছে তাঁর জীবনে—এমন সফলতা পৃথিবী আর কখনো দেখে নি। এমন-কি প্রৌঢ়-বয়সে তাঁর পুত্র-কামনাও বিফল হয় নি। সমস্ত যুরোপ তাঁর পদতলে—একমাত্র ইংলন্ড ছাড়া। এবং ইংলন্ডের সঙ্গেও তিনি সন্ধি স্থাপনের জন্যে চেষ্টা করছিলেন। ভেবেছিলেন বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন শান্তির স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু বিধাতার লিখন অন্যরকম। পৃথিবীকে তিনি বোধহয় দেখাতে চান, মানুষ কত উঁচুতে উঠতে ও কত নীচুতে পড়তে পারে!

অতি-সৌভাগ্যে মহামানবরাও হয়তো অন্ধ হন। নেপোলিয়নের প্রথম ভ্রম হয়েছিল, স্পেন নিয়ে অনর্থক গোলমাল করা। তাঁর দ্বিতীয় এবং প্রধান ভ্রম, রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। রুশিয়াকে হারালে তাঁর গৌরববৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু রুশিয়ার কাছে হারলে তাঁরই সর্বনাশ!

রুশিয়ায় যুদ্ধযাত্রা করবার আগে নেপোলিয়ন ড্রেস্‌ডেন শহরে রাজা-

রাজড়াদের নিয়ে এক দরবারের আয়োজন করলেন। এমন অপূর্ব রাজ-সম্মিলন দেখবার সুযোগ য়ুরোপের আর কখনো হয় নি। সম্রাট্ নেপোলিয়নের সামনে এসে দাঁড়ালেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ ও প্রুশিয়ার অধিপতি—অনুগ্রহপ্রার্থী সামন্তরাজের মতন। ছোট-বড়-মাঝারি আরো কত অভিজাত বংশীয় রাজা, গ্রান্ড ডিউক ও ডিউকের দল এলেন কালকের ভুঁইফোঁড় সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়নকে অভিনন্দিত করতে ও তাঁর মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনতে! সেদিন নেপোলিয়নের মনে ভাব হয়েছিল কেমন, সে কথা কেউ জানে না—আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র! নেপোলিয়নের ভাগ্যলক্ষ্মীই বিদায় নেবার আগে বোধহয় এই শেষ মেলা বসিয়ে গেলেন!

১৮১২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে নেপোলিয়ন প্রবেশ করলেন রুশিয়ার মধ্যে—সঙ্গে ছিল তাঁর পাঁচলক্ষ সৈন্য।

কিন্তু তারপর যে-ব্যাপার আরম্ভ হল সেটা আর বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই, স্থানও নেই।

নেপোলিয়ন যত অগ্রসর হন, রুশরা তত পিছিয়ে যায়! তারা সামনা-সামনি লড়াই করে না, কেবল পিছিয়ে যায়! পথে যে-সব গ্রাম পড়ে সেগুলো মরুভূমির মতন জনশূন্য, খাদ্যশূন্য! মাঝে মাঝে আশে-পাশে পিছনে শত্রুদল হঠাৎ যেন আকাশ থেকে সদ্য-পতিতের মতন আবির্ভূত হয়, খানিক হানাহানি লুঠতরাজ করে অদৃশ্য হয় আবার স্বপ্নের মতন! এই মরুপ্রদেশে, দেশ থেকে এত দূরে এসে এমন বৃহৎ বাহিনীর খোরাক যোগান দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে, ফরাসীরা অনাহারে মারা পড়তে লাগল!

স্মোলেন্‌স্‌ক্ শহরে ফরাসীরা বাধা পেলে রুশ সৈনিকদের কাছে। ফরাসীদের মতন রণচতুর না হলেও রুশরা মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল। কিছুতেই তারা হটতে চায় না! প্রায় ছয় হাজার ফরাসী সৈন্য বধ করে রাত্রে সারা শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে রুশরা আবার কোথায় চলে গেল!

তারপর বোরোডিনো গ্রামের কাছে হল এক বড় যুদ্ধের আয়োজন। নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা একলক্ষ বিশ হাজার, রুশদের সংখ্যা আরো বেশি। দীর্ঘকালব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধের পর রুশরা হেরে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার রুশ ও ত্রিশহাজার ফরাসী সৈন্য মারা পড়ল। একটি মাত্র যুদ্ধে নেপোলিয়ন আর কখনো এত লোক হারান নি। বোরোডিনোয় অসীম বীরত্ব ও রণকৌশল দেখিয়ে সেনাপতি নে "প্রিন্স" উপাধি লাভ করেছিলেন (১৮১২ খৃ.)।

ফরাসীদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যিকার যুদ্ধ করা যে কি মারাত্মক ব্যাপার, বোরোডিনোর ক্ষেত্রেই রুশরা তা বুঝে আর সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল না। নেপোলিয়ন

বিনা বাধায় জনশূন্য মস্কো নগরে প্রবেশ করে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, এতদিন পরে আশ্রয় পাওয়া গেল। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই রুশরা আগুন লাগিয়ে সারা শহর পুড়িয়ে দিলে!

এমন অসম্ভব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাও অসম্ভব! নেপোলিয়ন আবার স্বদেশের দিকে প্রত্যাগমন করতে লাগলেন। কিন্তু প্রত্যাগমনের পথ হল আরো ভয়ানক! রুশিয়ার বিখ্যাত শীত এসে আক্রমণ করলে ফরাসীদের! পথ, প্রান্তর, অরণ্য—তুষারে তুষারে সব সাদা ধপ্-ধপ্ করছে, নদীর জল জমে বরফ! শূন্য থেকে ঝর্‌ঝর্ করে ঝরছে তুষারের ঝরনা! এবং ঝোড়ো বাতাস সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তুষারেরও চেয়ে কন্‌কনে হয়ে! প্রতিদিন নিয়মিতভাবে হাজার হাজার তুষারার্ত সৈনিক মারা পড়তে লাগল। তার উপরে যখন-তখন এপাশে-ওপাশে শত্রু সৈন্যেরা এসে আক্রমণ করতে ছাড়ে না।

এই ভীষণ অভিযান শেষ হলে পর জানা গেল, রুশিয়ার কবলগত হয়ে মারা পড়েছে বা বন্দী হয়েছে তিনলক্ষ ফরাসী সৈন্য! অথচ সমগ্র অভিযানে নেপোলিয়নের বাহিনী একবারও পরাজয়ের গ্লানি মাখে নি। তাদের মৃত্যুর কারণ—শীত ও অনাহার!

৮

ভাগ্যলক্ষ্মীর ত্যাজ্যপুত্র

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরা পাঁচ-পাঁচ বার নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়েছিল, কিন্তু পাঁচবারই তাদের আর্তনাদ করতে হয়েছে একজন মাত্র মানুষের পায়ের তলায় পড়ে!

এইবারে ষষ্ঠবারের জন্যে তারা আবার সম্মিলিত হল। এবারে দলে আছে রুশিয়া, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংলন্ড ও সুইডেন।

নেপোলিয়ন রুশিয়ায় নিজের সর্বনাশ করে এসেছেন। যে শিক্ষিত সেনাদলের জন্যে য়ুরোপে তিনি অপরাজেয় হয়েছিলেন, তাদের কঙ্কাল পড়ে আছে এখন রুশিয়ার তুষার-মরুর মধ্যে।

কিন্তু নেপোলিয়ন-নামের এমনি মোহিনী-শক্তি, আবার তাঁর আহ্বানে প্রাণ দিতে ছুটে এল্ দলে দলে নতুন বীর! যদিও এই নতুন বাহিনীর মধ্যে আগেকার মতন শিক্ষিত ও রণপ্রবীণ সেপাই নেই, তবু তাদের নিয়েই আবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না।

প্রথমে লড়াই হল প্রুশিয়া ও রুশিয়ার সঙ্গে (১৮১৩ খৃ.)।

একেবারে কাঁচা সেপাই, তার উপরে কামানের অভাব—কামানও খোয়া গেছে রুশিয়ায়। তবু লুট্‌জেন ও বউট্‌জেন ক্ষেত্রে মায়াবী নেপোলিয়নকে সঙ্গে পেয়ে নবীন ফরাসী সৈনিকরা এমন উন্মাদনা ও বীরত্ব প্রকাশ করলে যে, শত্রুরা দুইবারই পলায়ন করতে বাধ্য হল।

নেপোলিয়ন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "আমি আজ বিশ বৎসর ধরে ফরাসী-সৈন্য চালনা করছি, কিন্তু এর চেয়ে সাহস আর ঐকান্তিকতা আর কখনো দেখি নি! আমার সাহসী, নবীন সৈন্য এরা। গৌরব আর বীরত্বের ধারা এদের শিরায় শিরায়।"

নেপোলিয়ন আবার বার্লিনের কাছে! রুশ ও প্রুশিয়ানরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে অস্ট্রিয়ায় এবং অস্ট্রিয়াও ভিড়ে গেল তাদের দলে। সংখ্যায় তারা দুই লক্ষ! রুশ ও প্রুশিয়ানদেরও ফৌজে হাজার হাজার নতুন সেপাই এসে যোগ দিয়েছে! সুইডেনও পাঠিয়েছে কয়েক হাজার সৈন্য! দাদা জোসেফের ভায়রা-ভাই বার্নাদেট্‌কে নেপোলিয়ন দয়া করে সুইডেনের সিংহাসন দান করেছিলেন, এখন সে তারই প্রতিদান দিতে এসেছে উপকারীর মাথার উপরে খাঁড়া তুলে!

অন্যান্য সেনাপতিদের সসৈন্যে দিকে দিকে রেখে মূল ফৌজ নিয়ে নেপোলিয়ন শত্রুদের আক্রমণ করলেন। কিন্তু শত্রুরা যুদ্ধ করতে লাগল নতুন পদ্ধতিতে। নেপোলিয়নকে দেখলেই তারা পশ্চাৎপদ হয়, আর লড়াই করে হারায় অন্যান্য ফরাসী সেনাপতিদের! তবু নেপোলিয়ন ড্রেসডেন শহরের কাছে আবার তাদের যুদ্ধে নামতে বাধ্য করলেন। এখানে শত্রুদের সঙ্গে ছিলেন ভূতপূর্ব ফরাসী সেনাপতি জেনারেল মোরো—যাঁর মুণ্ড কাটা যায় নি নেপোলিয়নেরই উদারতায়!

ড্রেস্‌ডেনের যুদ্ধই হচ্ছে বিজয়ী নেপোলিয়নের শেষ বড় যুদ্ধ (১৮১৩, জুলাই)। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি বিশ হাজার শত্রু বন্দী করেন। এবং এইখানেই মারা পড়েন জেনারেল মোরো।

কিন্তু যুদ্ধে জিতলে কি হবে, এবারে শত্রু-সংখ্যা যেন অনন্ত! তাদের কাবু করা অসম্ভব! উপরন্তু তারা নেপোলিয়নের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করে না, যেখানে নেপোলিয়ন নেই, সেইখানেই তাদের আবির্ভাব! এমনি করে দিনে দিনে ফরাসীরা যত দুর্বল হয়ে পড়ছে, শত্রুরা হয়ে উঠছে ততই প্রবল!

তারপরে আরম্ভ হল লিপ্‌জিকের তিনদিন ব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ। আসলে এটি হচ্ছে ধারাবাহিক ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের সমষ্টি (১৮১৩ খৃ. ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত)। মিত্রপক্ষে ছিল তিনলক্ষ সৈন্য এবং নেপোলিয়নের সৈন্য-সংখ্যা মাত্র এক লক্ষ বিশহাজার। তার উপরে যুদ্ধের সময়ে তাঁর সামন্ত-রাজাদের বহু সৈন্য শত্রুপক্ষে

গিয়ে যোগদান করেছিল। তবু নেপোলিয়ন প্রাণপণে লড়লেন, কিন্তু প্রায় ষাট হাজার শত্রু বধ করেও অসম্ভবকে আর সম্ভব করতে পারলেন না! অবশেষে তাঁর কামানের গোলাও ফুরিয়ে গেল। কেবল গোলা নয়, ফরাসীদেরও লোকক্ষয় হল পঞ্চাশ হাজার। তাঁর পক্ষে তখন পশ্চাৎপদ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

এই পরাজয়ের পর সমগ্র য়ুরোপের দিকে দিকে নতুন নতুন শত্রু নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল। এমন কি, তাঁর দয়ায় আজ যারা মাথায় পরেছে রাজমুকুট, তারাও শত্রুরূপে আত্মপ্রকাশ করতে লজ্জিত হল না—এমন-কি তাঁর ভগ্নীপতি ও হাতে-গড়া নেপ্‌ল্‌সের রাজা মুরাট পর্যন্ত! ইতালীতে আবার ফরাসী প্রভুত্ব বিলুপ্ত হল, স্পেনেও তাই!

নেপোলিয়ন তখন সন্ধিপ্রার্থনা করলেন! মিত্রপক্ষ সন্ধির যে শর্ত দিলেন তা অন্যায় নয়। নেপোলিয়নকে তাঁরা কেবল ফ্রান্সরাজ্য ছেড়ে দিতে রাজি হলেন, কিন্তু সে শর্ত বাতিল করে নেপোলিয়ন নিজের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনলেন নিজেই!

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল, নেপোলিয়ন লড়তে লাগলেন সপ্তরথীর দ্বারা বেষ্টিত একা অভিমন্যুর মতন! মিত্রপক্ষের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় তাঁর সৈন্যবল নগণ্য! সাধারণ সৈনিকের মতন তিনি যুদ্ধসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, তাঁর চারিদিক দিয়ে ছুটতে থাকে মৃত্যু-ঝটিকা!

মন্ট্‌রিউ যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই যেখানে ঘোরতর হয়ে উঠেছে, নেপোলিয়ন সেইখানে গিয়ে হাজির! অশ্বপৃষ্ঠে নয়, পদব্রজে!

বুড়ো গোলন্দাজরা তাদের প্রিয় সম্রাট্‌কে এই বিপদের মধ্যে এসে দাঁড়াতে দেখে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠল।

তারা আজন্ম সৈনিক, কেউ আদব-কায়দা ও মার্জিত ভাষার ধার ধারে না। ছেলেকে স্নেহশীল বাপ যেমন ভাবে ধমক দেয়, তেমনি ভাবেই একজন কঠোর স্বরে বললে, "সম্রাট্! এ তোমার জায়গা নয়!"

নেপোলিয়ন হেসে বললেন, "বীর, যে বুলেটে আমি মরব, এখনো তা তৈরি হয় নি!"

দুর্বল হয়েও একে একে নেপোলিয়ন আরো কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেন—কিন্তু বৃথা! শত্রুরা বেড়ে উঠছে রক্তবীজের ঝাড়ের মতন! নেপোলিয়নের সৈন্য-সংখ্যা কমছে বৈ বাড়ছে না! প্রুশিয়ান জেনারেল ব্লুচার এ-পর্যন্ত যে কতবার তাঁর কাছ থেকে হেরে পালালেন তার আর সংখ্যা হয় না! তবু যতবারই তিনি পালান, ততবারই নতুন পল্টন নিয়ে আবার ফিরে আসেন! প্রত্যেক পরাজয়ের পর ব্লুচার যেন অধিকতর বলবান্ হয়ে ওঠেন!

নতুন সৈন্যদলের উপায় নেই, নতুন শক্তিলাভের সম্ভাবনা নেই, তবু নেপোলিয়ন লড়ছেন, লড়ছেন, লড়ছেন! কিন্তু বৃথা! লক্ষ লক্ষ শত্রু চারিদিক দিয়ে প্যারির দিকে ধেয়ে আসছে মহাবন্যার মতন! এই দুর্বল অবস্থায় কোন্‌দিক সামলাবেন তিনি? অবশেষে অসম্ভবকে লাভ করবার জন্যে ফরাসী সৈন্যদেরও আর কোন আগ্রহ রইল না, নতুন যুদ্ধের কথা শুনলে ফরাসী সেনাপতিরাও বিরক্ত হয়ে ওঠেন! ফ্রান্সের জনসাধারণও অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-প্রবাহে পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। দেশের অধিকাংশ পরিবারই সন্তান বা পিতা বা স্বামী বা আর কারুকে হারিয়েছে—তাদের আর সৈনিক যোগান দেবারও শক্তি নেই! তারাও একবাক্যে বলে উঠল, "যুদ্ধ নয়, আর যুদ্ধ নয়!"

নেপোলিয়ন তখনও সত্তর হাজার সৈন্য জোগাড় করতে পারতেন এবং শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অগণ্য হলেও তখনো তাঁকে এমন যমের মতন ভয় করে যে, আট-ঘাট বেঁধে প্যারির চারিদিক ঘিরে দূরে বসে থাকলেও, কেউ আর তাঁর কাছাকাছি আসতে রাজি নয়!

ঘরে-বাইরে বাধা পেয়ে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করলেন (১৪ এপ্রিল, ১৮১৪ খৃ.)।

মিত্রপক্ষ বললেন, ভূমধ্যসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপ এল্‌বা, অতঃপর নেপোলিয়নকে সেইখানেই বাস করতে হবে। নিজের দ্বীপের ভিতরে তিনি স্বাধীনই থাকবেন, তাঁর সম্রাট্ উপাধিও বজায় রইল।

সমগ্র য়ুরোপে যাঁর ছায়া ধরত না, তাঁর রাজ্য হবে এল্‌বা দ্বীপ—চওড়ায় ছয় ও লম্বায় ঊনিশ মাইল!

নেপোলিয়ন আর সইতে পারলেন না, চেষ্টা করলেন সকল জ্বালা জুড়োতে। তিনি বিষপান করলেন। কিন্তু মৃত্যুও তাঁকে সাহায্য করলে না, বিষের তাড়নায় কেবল কষ্ট পেলেন মাত্র। নিয়তি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলে, অধিকতর দুর্ভাগ্যের জন্যে! (কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই এই আত্মহত্যা চেষ্টার কথা বিশ্বাস করেন না এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে।)

নেপোলিয়নের ছেলেকে নিয়ে স্ত্রী চলে গেলেন বাপের বাড়িতে, অস্ট্রিয়ার রাজপ্রাসাদে। নেপোলিয়ন জীবনে আর স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখেন নি।

ফ্রান্স থেকে বিদায় নেবার দিন এল। রাজপ্রাসাদের সোপানশ্রেণীর উপরে নেপোলিয়ন, প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে প্রাচীন রক্ষী ফৌজের রণপ্রবীণ সৈনিকগণ—তাঁর সঙ্গে যারা শত শত যুদ্ধ জয় করেছে।

নেপোলিয়ন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলেন, সৈনিকরা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সমস্বরে বলে উঠল, "সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন!"

নেপোলিয়ন সৈন্যদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "আমার প্রাচীন রক্ষী বাহিনীর সৈনিকগণ! আজ বিশ বৎসর ধরে দেখছি, সর্বদাই তোমরা বিচরণ করেছ যশ ও গৌরবের পথে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তোমরা হয়েছ নির্ভীকতা ও বিশ্বস্ততার আদর্শ—আমার সৌভাগ্যের দিনেও তোমরা যা ছিলে।...... ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা হয়েছিল। সেইজন্যেই দেশের মুখ চেয়ে আমি নিজের সমস্ত স্বার্থকে বলি দিলুম। আমি বিদায় নিচ্ছি।......বন্ধুগণ, তোমরা ফ্রান্সের সেবা কর। তোমাদের সঙ্গে রইল আমার শুভ-ইচ্ছা। আমার অদৃষ্টের জন্যে অশ্রু ফেল না। তোমাদের যশোগৌরব বাড়াবার জন্যেই আমি বেঁচে রইলুম। আমরা সকলে মিলে যে মহান্ কীর্তি স্থাপনা করেছি, তারই কাহিনী রচনা করব আমি। সন্তানগণ, বিদায়! তোমাদের সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলে আমি খুশি হতুম। অন্তত তোমাদের পতাকা দাও—আমি চুম্বন করব।"

পতাকাবাহী পতাকা নামালে। নেপোলিয়ন তাকে আলিঙ্গন ও পতাকাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, "সঙ্গিগণ, বিদায়!"

তিনি দ্রুতপদে শকটের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। আবার উচ্চরব উঠল—"সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন!" শকট চলে গেল।

যুদ্ধকঠিন প্রাচীন সৈনিকরা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিশুর মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। যেন তারা আজ পিতৃহারা!

দৃশ্যপট বদলে গেল।......পল্লীপথ দিয়ে নির্বাসিতের শকট ছুটছে। এখান দিয়ে যেতে যেতে নেপোলিয়ন আর এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এখানে সৈনিকদের অশ্রুজল নেই, শিক্ষিত নাগরিকদের মৌখিক সভ্যতার মুখোশও নেই। এখানে পথের দুধারে গ্রাম্য ইতরের জনতা! উলঙ্গ হৃদয়! যাদের ভাই-ছেলে-বাপ-স্বামী যুদ্ধ-ক্ষেত্রের রক্ত-সাগরে অতলে তলিয়ে গেছে, তারা অপেক্ষা করছে আজ নেপোলিয়নকে অভ্যর্থনা করতে! নেপোলিয়নের গাড়ি দেখা যায় আর গগনভেদী চীৎকার ওঠে—"অত্যাচারীকে উচ্ছন্নে দাও!" "হত্যাকারীকে হত্যা কর!" নর-নারীরা পাগলের মতন গাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ইঁট ছোঁড়ে, গালাগালি দেয় অকথ্য ভাষায়!

ফ্রান্সের মানসপুত্র নেপোলিয়ন! আজ তাঁকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হল! কি উত্থান! কি পতন!

৯

ভিসুভিয়াসের জাগরণ

এল্বা! ছোট্ট একটি পাহাড়ে-দ্বীপ। লোকসংখ্যা আঙুলে গুণে বলা যায়।

কর্সিকাও ছোট দ্বীপ। কিন্তু এল্‌বার চেয়ে চল্লিশ গুণ বড়, তার লোকসংখ্যাও দশগুণ বেশি।

'এর চেয়ে ওরা যদি আমাকে কর্সিকায় পাঠিয়ে দিত!' নেপোলিয়ন মনে-মনে নিশ্চয়ই এই কথা ভেবেছিলেন।

এখনো তিনি সম্রাট্, আর এই এল্‌বা তাঁর সাম্রাজ্য—এই উই-ঢিপি!

তবু বাইরে তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। অস্ট্রিয়া ও ইংলন্ডের প্রতিনিধি তাঁর উপরে নজর রাখবার জন্যে এল্‌বাতেই বাসা বেঁধেছিলেন—তাঁরা দেখলেন তাঁর হাসিখুশি-মাখা মুখ! আহারে-বিহারে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জন্যে নেপোলিয়ন তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ করতেও ভুললেন না!

এই একবিন্দু 'সাম্রাজ্য'কে নিজের নামের যোগ্য করে তোলবার জন্যে তিনি বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এল্‌বার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হলেন।

অস্ট্রিয়া ও ইংলন্ডের প্রতিনিধিরা ভাবলেন, কি অস্বাভাবিক মানুষ এই নেপোলিয়ন! একখণ্ড জমি পেয়ে অমন বিরাট সাম্রাজ্যের কথা ভুলে গেলেন!

কিন্তু নেপোলিয়ন ভোলেন নি। তাঁর হৃদয় এখন ভিসুভিয়াসের মতন। বাইরে পরম প্রশান্ত, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে সর্বগ্রাসী অগ্নি-উদ্‌গীরণ করতে পারে।

মা লেটিজিয়া এলেন। সম্পদের দিনে লেটিজিয়া সহজে ছেলের কাছে আসতে রাজি হতেন না, কিন্তু বিপদের দিনে মা এসে বুক দিয়ে পড়লেন। আজ ছেলের কাছে থাকতে পেয়ে মায়ের মুখে হাসি ধরে না।

নেপোলিয়নের সবচেয়ে প্রিয় বোন সুন্দরী পলিনও এলেন। পলিন প্রজাপতির মতন চঞ্চল, পলিন শরীরিণী আনন্দঝরণা! তাকে পেয়ে নেপোলিয়নের গোপন দুঃখ অনেকটা হাল্‌কা হয়ে পড়ল।

আর এক বোন ক্যারোলিন—নেপল্‌স-এর বিশ্বাসঘাতক রাজা মুরাটের স্ত্রী। মায়ের হুকুমে এ দ্বীপে তাঁর প্রবেশ নিষেধ! আর এলেন না ভাইয়েরা—যাঁদের জন্যে নেপোলিয়ন এত করেছেন!......

ফ্রান্সের নতুন রাজা অষ্টাদশ লুই। তিনি 'গিলোটিনে'-মৃত ষোড়শ লুইয়ের ছোট ভাই। যে বুর্বন-বংশের জন্যে ফরাসী-বিপ্লবের রক্তগঙ্গার উৎপত্তি, সেই ঘৃণ্য বংশের আবার এক রাজাকে ঘাড়ে করে ফরাসী জনসাধারণ ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগল যেন তুষানলে! তার উপরে এ রাজা ফ্রান্সের সিংহাসন দখল করেছেন বিদেশী শত্রুদের সাহায্যে। প্রজারা তাঁকে ভালোবাসবে কেন?

পুরাতন বংশের সঙ্গে এল আবার পুরাতন ব্যভিচার। রাজা নিজে লোক মন্দ নন, কিন্তু কাজ করেন স্বার্থান্ধ সাঙ্গোপাঙ্গোদের পরামর্শে। যে-সব রীতি-নীতিকে

তাড়াবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ফরাসী বুকের রক্ত ঢেলেছে, আবার হল সেই-সব রীতি-নীতির পুনরাবির্ভাব! আবার সাধারণ লোকেদের মাথার উপরে উঠে দাঁড়াল অভিজাতরা, আবার আরম্ভ হল পুরোহিতদের অত্যাচার! পথে-পথে দু-একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হল।

লোকে আবার চুপি-চুপি বলতে লাগল, "নেপোলিয়ন ছিলেন রাজার মতন রাজা!"

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের চরের অভাব ছিল না। সব খবর যথাস্থানে গিয়ে হাজির হল।

নির্বাসনের পর দশমাস কেটে গিয়েছে।

মা লেটিজিয়া একদিন গিয়ে দেখলেন, নেপোলিয়ন একটি ডুমুর গাছের তলায় একলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—"মা, তোমাকে একটা কথা বলব, আর কারুকে বোলো না। পলিনকেও না।"

মা চুপ।

—"কাল সন্ধ্যার সময়ে আমি চলে যাব।"

—"কোথায়, বাবা?"

—"প্যারিতে।"—অল্পক্ষণের নীরবতা।—"আমি তোমার পরামর্শ চাই।"

মায়ের বুক যেন পাথর হয়ে গেল। কিন্তু এ মা হচ্ছেন নেপোলিয়নের মা! যেমন তাঁর গর্ব, তেমনি বুদ্ধি! তাঁর ছেলে যা ধরেছে তা করবেই, বাধা দেওয়া বাহুল্য।

মা বললেন, "বাবা, তোমার নিয়তিকে অনুসরণ কর। বিষ খেয়ে বা অথর্ব বুড়ো হয়ে তুমি মরবে, নিশ্চয়ই ভগবানের সে-ইচ্ছা নেই। হয়তো তোমার মৃত্যু হবে তরবারি হাতে করেই। আমাদের ভরসা, মা মেরী।"

* * * *

নেপোলিয়ন আবার ফ্রান্সে! সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়ন!

দিকে দিকে ছুটে গেল এই সুসংবাদ, হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ!

নেপোলিয়ন আসছেন রাজধানীতে! যে-পথ দিয়ে আসছেন, দু'ধারে তার কাতারে কাতারে লোক ভেঙে পড়ছে আর ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠছে—"সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন!"

কিন্তু ইতর জনতার জয়ধ্বনি নিয়ে সম্রাট্ তখন মাথা ঘামাচ্ছেন না—এল্‌বার পথে তাদের জয়ধ্বনির গুপ্তকথা তিনি জেনেছেন।

সম্রাট্ খালি ভাবছেন, আমাকে দেখে সৈন্যরা কি বলবে? কি করবে?

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না, পথিমধ্যেই রাজার সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হল। সৈন্যদের নেতারা প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, নেপোলিয়নকে তারা বধ করবেই!

রাজসৈন্যেরা নেপোলিয়নের সামনে এসে উপস্থিত। হাতে তাদের বন্দুক, মুখ তাদের মৌন, ভাব তাদের পাথরের পুতুলের মতন।

নেপোলিয়ন একাকী পায়ে-পায়ে এগিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অবিচলিত দৃঢ়স্বরে বললেন, "সৈন্যগণ, তোমরা কি আমাকে চেন না! তোমাদের দলে এমন কেউ যদি থাকে, যে তার সম্রাট্‌কে বধ করতে চায়, তাহলে সে এগিয়ে আসুক্, আমাকে বধ করুক্। আমি এখানে হাজির।" বলেই তিনি জামা খুলে নিজের বুক অনাবৃত করে ফেললেন।

অখণ্ড স্তব্ধতা, ভয়াবহ! এখনি কি ঘটবে?

হঠাৎ বাঁধ-ভাঙা ধ্বনি বন্যার মতন শোনা গেল, "সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন!" তারপরেই বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাস, "রাজসৈন্য হল নেপোলিয়নের সৈন্য!"

সর্বত্রই এই দৃশ্যের পুনরভিনয়! নতুন রাজা সদলবলে রাজ্য ছেড়ে দৌড় মারলেন সমুদ্রের দিকে এবং সেখান থেকে ইংলন্ডে। নেপোলিয়ন আবার ফ্রান্সের সর্বেসর্বা! এমন পুনরুত্থানের আশ্চর্য কাহিনী উপন্যাসেও আর কখনো কল্পিত হয়নি (১৮১৫ খৃ.)!

ফরাসীরা নেপোলিয়নকে গ্রহণ করলে বটে, কিন্তু সমগ্র য়ুরোপ হয়ে উঠল খড়্গহস্ত! তারা তাঁকে মানবজাতির শত্রু বলে প্রচার করলে। সারা য়ুরোপে 'সাজ সাজ' রব উঠল।

সিংহাসনে ভালো করে বসতে না বসতেই নেপোলিয়ন খবর পেলেন, তাঁকে পদদলিত করবার জন্যে চারিদিক থেকে সমগ্র য়ুরোপের দশ লক্ষ এগারো হাজার সৈন্য ছুটে আসছে! তাদের বাধা দেবার জন্যে তিনিও তাড়াতাড়ি সৈন্যসংগ্রহ করতে লাগলেন; কিন্তু সময়াভাবের জন্যে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজারের বেশি লোক জোগাড় করতে পারলেন না। তবু তিনি অটল। স্থির করলেন, শত্রুরা এক সঙ্গে সম্মিলিত হবার আগেই একে একে তাদের বাহিনী ধ্বংস করবেন। এটা তাঁর বহু-পরীক্ষিত পুরাতন যুদ্ধরীতি।

সবচেয়ে কাছে আছে ইংরেজ ও প্রুশিয়ানরা। বেলজিয়মে ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন কতক ইংরেজ, কতক জার্মান, কতক বেলজিয়ান ও কতক ওলন্দাজ সৈন্য নিয়ে প্রুশিয়ান সেনাপতি ব্লুচারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

নেপোলিয়ন প্যারিস থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটনের সঙ্গে মেলবার আগেই প্রুশিয়ানদের উপরে গিয়ে পড়লেন বেলজিয়মের চার্লেরই নগরের কাছে।

প্রুশিয়ানরা লিগ্‌নি শহরের দিকে পশ্চাৎপদ হল। নেপোলিয়ন তাদের পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে আবার ব্লুচারকে আক্রমণ করলেন। সারাদিন ধরে চলল কামানের বজ্রগর্জন ও অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার। ফরাসী ও জার্মানরা হচ্ছে পরস্পরের চিরশত্রু, সুতরাং যুদ্ধের ভীষণতা উঠল চরমে! রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল বিশ হাজার জার্মান ও পনের হাজার ফরাসীর মৃতদেহ। তারপর ব্লুচার আর সহ্য করতে না-পেরে সসৈন্যে পলায়ন করলেন। প্রথম যুদ্ধে জয়ী নেপোলিয়ন (১৫ জুন, ১৮১৫ খৃ.)।

আবার ব্লুচার পালালেন—কিন্তু নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন তাঁকে একেবারে সসৈন্যে ধ্বংস করতে। ঐতিহাসিকরা বলেন, ফরাসীদের বামপার্শ্বের সৈন্যদল যদি নেপোলিয়নের আদেশ পালন করতে পারত, তাহলে লিগনি-ক্ষেত্রেই হত ব্লুচারের পতন এবং ওয়েলিংটন একলা কখনোই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করতেন না। ফলে ওয়াটার্লু যুদ্ধের ইতিহাস লেখবারও দরকার হত না।

ব্লুচারও মরতে মরতে কোনগতিকে বেঁচে গিয়েছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদের পুরোভাগে থেকে তিনি ফরাসীদের আক্রমণ করতে আসছিলেন; হঠাৎ তাঁর ঘোড়া গুলি খেয়ে তাঁকে নিয়ে ভূতলশায়ী হয় এবং তাঁর উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় জার্মান ও ফরাসীরা—কিন্তু যুদ্ধের গোলমালে কোন পক্ষই তাঁকে চিনতে পারে নি!

ব্লুচার পালিয়ে ওয়াটার্লুর পথ ধরলেন এবং নেপোলিয়নও তাঁর পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে পাঠালেন সসৈন্যে সেনাপতি গ্রাউচিকে।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ হচ্ছে একটি বিচিত্র নাটকীয় দৃশ্যের মত। পরের পরিচ্ছেদে তাই ঐ যুদ্ধের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হল।

১০

ওয়াটার্লু

(১৮ জুন, ১৮১৫)

ওয়াটার্লু হচ্ছে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরেই তাঁর মহা পতন। অস্টারলিট্‌জের পরিপূর্ণ সূর্য ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে এসে শেষ কিরণ বিকিরণ করে অস্তমিত হয়।

কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেছেন, ওয়াটার্লু যুদ্ধের সময়ে নেপোলিয়নের যুদ্ধ-

প্রতিভা দুর্বল হয় এসেছিল। কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখলে, এ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়।

কারণ, বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন, নেপোলিয়নের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁৎ ও অপূর্ব। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয় নি। দৈবের মহিমায় তাঁর 'প্ল্যান্' ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

ওয়াটার্লু যুদ্ধে জয়ী হয়ে ডিউক অফ ওয়েলিংটন অমর নাম কিনেছেন। কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীর সেনাপতি ছিলেন না। আজ পর্যন্ত ইংলন্ড এমন কোন রণবীর প্রসব করে নি, চেঙ্গীজ্, আলেকজান্ডার, সিজার, হানিবল, তৈমুর, নাদির বা নেপোলিয়নের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা চলে। ওয়াটার্লু যুদ্ধে ওয়েলিংটন উল্লেখযোগ্য কোন রণকৌশলই দেখাতে পারেন নি। তাঁর সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন দস্তুরমত নাছোড়বান্দা। এই যুদ্ধে তাঁর চেয়ে বেশি সুখ্যাতি করা যায় ইংরাজ সৈন্যদের—তাদের অসাধারণ সাহস ও সহ্য-ক্ষমতার জন্যে।

এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে, চৌত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর সেনাপতি গ্রাউচির অনুপস্থিতি ও জার্মান সেনাপতি ব্লুচারের যথাসময়ে আবির্ভাব। এমন কি গ্রাউচির অভাবও পূরণ হতে পারত, ব্লুচার যদি না আসতেন। ব্লুচার না এলে ইংরেজদের রক্ষা পাবার কোন উপায়ই ছিল না। ব্লুচারও ভালো সেনাপতি নন। নেপোলিয়নের সামনে কোন দিনই তিনি দাঁড়াতে পারেন নি। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে তাঁর একটা মস্ত গুণ ছিল এই যে, যতবারই তিনি হেরেছেন, ততবারই পালিয়ে গিয়ে আবার 'যুদ্ধং দেহি' বলে ফিরে এসেছেন। এই ব্লুচারই হয়েছিলেন নেপোলিয়নের কাল।

পলাতক ব্লুচারের পিছনে চোত্রিশ হাজার সৈন্যশুদ্ধ সেনাপতি গ্রাউচিকে পাঠিয়ে, নেপোলিয়ন সসৈন্যে এলেন ওয়েলিংটনকে ধ্বংস করতে। ওয়েলিংটন তখন ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ করেছেন। তাঁর অধীনে ছিল সত্তর হাজার ইংরেজ ও নানাজাতীয় সৈন্য।

এতক্ষণ যে-সব লড়াই হচ্ছিল, তাদের ওয়াটার্লু যুদ্ধেরই প্রস্তাবনা বলে গ্রহণ করা যায়।

ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের অধীনে সৈন্য ছিল বাহাত্তর হাজার—অর্থাৎ প্রায় ওয়েলিংটনেরই সমান। কিন্তু ফরাসীদের কামান ছিল ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি।

ব্লুচারের সঙ্গে ওয়েলিংটনের আগেই বোঝা-পড়া হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের একজন ফরাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্যজন আসবেন সাহায্য করতে। এই

আশায় বুক বেঁধে ওয়েলিংটন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলেন। কিন্তু ভিক্টর হুগো দেখিয়েছেন, যুদ্ধের কিছুই তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর 'বুলেটিন'গুলো পড়লে মনে হয়, তিনি যেন ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়েছিলেন! তিনি কেবল এইটুকু স্থির করেছিলেন, যতক্ষণ-না ব্লুচার আসবেন ততক্ষণ যেমন করে হোক্ আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু দৈব সহায় না হলে তিনি যে আত্মরক্ষাও করতে পারতেন না, হুগো সেটাও দেখিয়েছেন।

ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে ইংরেজদের উপরে ফরাসীরা পাঁচবার আক্রমণ করেছিল। (১) ইংরেজদের বাম পার্শ্বের উপরে আক্রমণ। (২) ইংরেজদের দক্ষিণ পার্শ্বের উপরে আক্রমণ। (৩) ফরাসী অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রবল আক্রমণ—ইংরেজরা যা সহ্য করতে পেরেছিল। (৪) মার্শাল নে'র সফল আক্রমণ—যা ফরাসীদের জয়লাভের সম্ভাবনা আনে। (৫) ফরাসী রক্ষী সৈন্যের আক্রমণ—এইখানেই ইংরেজদের পতন হত, কিন্তু ঠিক এই সময়েই ব্লুচারের অধীনস্থ প্রুশিয়ানদের আবির্ভাবে ও গ্রাউচির অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের গতি ফিরে যায়।

অমর ফরাসী লেখক ভিক্টর হুগো ওয়াটার্লু যুদ্ধের যে অপূর্ব শব্দ-ছবি এঁকেছেন, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে তা অতুলনীয় হয়ে আছে। আমরা এখানে তার কয়েকটি অংশ উদ্ধার করলুম :

১৮১৫ খৃস্টাব্দের সতেরোই এবং আঠারোই তারিখের মাঝখানে যদি বৃষ্টি না হত, তাহলে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ ভিন্ন আকার ধারণ করত। মাত্র কয়েক ফোঁটা জলের জন্যে হল নেপোলিয়নের পতন। ওয়াটার্লুকে অস্টারলিট্জের উপসংহারে পরিণত করবার জন্যে বিধাতার দরকার হল এক পশলা বৃষ্টি! বেলা সাড়ে এগারোটার আগে ওয়াটার্লু যুদ্ধ শুরু করা সম্ভবপর হল না। কেন? বৃষ্টিতে মাটি ভিজে ছিল বলে! এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন তাঁর কামান-সংখ্যার উপরে অত্যন্ত নির্ভর করে ছিলেন। ওয়েলিংটনের মাত্র ১৫৯টা কামান ছিল এবং তিনি ছিলেন ২৪০ কামানের অধিকারী। মাটি খানিকটা না শুকোলে কামান ব্যবহার করা চলে না।

মাটি যদি শুক্‌নো থাক্‌ত, ওয়াটার্লু যুদ্ধ আরম্ভ হত ভোর ছ'টার সময়ে এবং নেপোলিয়ন জয়ী হয়ে যুদ্ধ শেষ করে ফেলতেন বেলা দুটোর সময়—অর্থাৎ প্রুশিয়ানদের আগমনের তিন ঘণ্টা কাল আগে!

ইংরেজরা ছিল উচ্চভূমির উপরে, ফরাসীরা নিম্নভূমিতে। এজন্যে ইংরেজদের খুব সুবিধা হয়েছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হল বিষম তেজে। এতটা নেপোলিয়নও আশা করতে পারেন নি। ফরাসীদের বাম পার্শ্ব আক্রমণ করলে ইংরেজরা, নেপোলিয়ন আক্রমণ

করলেন ইংরেজদের মধ্যভাগ। সেনাপতি নে ফরাসীদের দক্ষিণ পার্শ্ব নিয়ে ইংরেজদের বাম পার্শ্বকে আক্রমণ করলেন। প্রথম আক্রমণ সফল হল। ফরাসীরা কয়েকটা স্থান দখল করলে। তারপর যুদ্ধের গতি ফিরতে লাগল একবার এদিকে, একবার ওদিকে।

অপরাহ্ণ-কালে যুদ্ধের অবস্থা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এল। বেলা প্রায় চারটের সময়ে ইংরেজদের অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। ইংরেজদের পক্ষে হল্যান্ড-বেলজিয়মের সৈন্যচালনা করছিলেন প্রিন্স অফ অরেঞ্জ; দক্ষিণ পার্শ্বের নায়ক ছিলেন হিল; বামপার্শ্বের নায়ক পিক্টন।

প্রিন্স অফ অরেঞ্জ নিজের সৈন্যদের ডেকে মরিয়ার মতন চ্যাঁচাতে লাগলেন, "পালিও না—পিছনে পালিও না!"

হিল এমন ভেঙে পড়লেন যে, ওয়েলিংটনের গায়ে না ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলেন না।

পিক্টনের মৃতদেহ রণশয্যাশায়ী!

ওয়েলিংটনের মূলস্থান ছিল দুটি—হোউগোমন্ট ও লা-হে-সেইন্ট। হোউগোমন্ট তখনও ফরাসীদের হস্তগত হয় নি বটে, কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলছিল। লা-হে-সেইন্ট্ ইংরেজদের হাতছাড়া হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে যে তিন হাজার জার্মান সৈন্য লড়াই করছিল, তাদের মধ্যে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে মাত্র বিয়াল্লিশ জন। পাঁচজন ছাড়া নায়কদের সবাই মৃত বা বন্দী। ইংরেজ রক্ষী সৈন্যের এক সার্জেন্ট, সে ছিল বিলাতের 'চ্যাম্পিয়ন' মুষ্টি-যোদ্ধা। সবাই জানত, কেউ তার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু ছোট্ট এক ফরাসী ছোক্‌রা—সে দামামা বাজাত— সে-ই বিপুলবপু মুষ্টিযোদ্ধাকে বধ করলে! বহু ইংরেজ পতাকা ফরাসীদের হস্তগত। বিখ্যাত স্কট্‌স্ গ্রে ফৌজ বিলুপ্ত। নায়ক পন্সন্‌বির অশ্বারোহী দলকে ফরাসীরা কুচি-কুচি করে কেটে ফেলেছে—পন্সন্‌বি দেহের সাত জায়গায় আহত হয়ে মাটির উপরে পড়ে। পাঁচ ও ছয় নম্বর ফৌজও (ডিভিসন) আর নেই। মেটার, মার্শাল ও গর্ডন নায়করা মৃত।

অটুট আছে কেবল ইংরেজদের মধ্যভাগ। ওয়েলিংটন চারিদিক থেকে সৈনিক ও সেনানী আনিয়ে মধ্যভাগকে দৃঢ়তর করে তুলতে লাগলেন। এখানে ঝোপঝাপের ভিতরে তিনি এমন সুকৌশলে কামান ও বন্দুকধারী সৈন্য লুকিয়ে রাখলেন যে, ফরাসীরা তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারলে না।

চিন্তিত, কিন্তু প্রশান্ত মুখে ওয়েলিংটন ঘোড়ার উপরে বসে আছেন সারাদিন। চারিদিকে হচ্ছে বুলেট বৃষ্টি। তাঁর এ-ডি-কং গর্ডন তাঁর পাশেই মারা পড়লেন।

সামনেই একটা গোলা পড়ে ফেটে গেল। লর্ড হিল বললেন, "মাই লর্ড,

আপনি যদি নিহত হন, তাহলে আমাদের কর্তব্য কি? আপনার কোন্ হুকুম আমরা তামিল করব?"

ওয়েলিংটন সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "আমি যা করছি তাই করবেন। যতক্ষণ একজনেরও জীবন থাকবে, এ জায়গাটা রক্ষা করবেন।"

গতিক আরো খারাপ হয়ে এল।

ওয়েলিংটন চীৎকার করে বললেন, "শোনো তোমরা! আমরা কি পালাবার কথা স্বপ্নেও মনে আনতে পারি? তাহলে ইংলন্ডের লোক আমাদের কি বলবে?"

বেলা চারটের সময়ে ইংরেজদের পংক্তি ভেঙে গেল। ওয়েলিংটনও পিছু হটে গেলেন।

নেপোলিয়ন বলে উঠলেন, "এইবাবে ওদের পলায়ন শুরু হল।" এতক্ষণ পরে তাঁর মুখে আনন্দের হাসি ফুটল। রাজধানীতে তখনি তিনি খবর পাঠিয়ে দিলেন, যুদ্ধে তাঁর জিৎ হয়েছে।

এইবারে ইংরেজদের ধ্বংস করবার সময় এসেছে! নেপোলিয়ন তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদের আহ্বান করলেন। আধ মাইল জায়গা জুড়ে তারা এগিয়ে এল। মস্ত মস্ত ঘোড়ার উপরে প্রকাণ্ড সব সৈনিক! তরবারি খুলে নে তাদের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারা অগ্রসর হল। সে এক দারুণ দৃশ্য!

ছুটেছে অশ্বারোহীর দল, তরবারি সব ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত, পতাকা ও ভেরীগুলোও শূন্যে উত্থিত,—সমতালে সম ভঙ্গিতে অগ্রসর হচ্ছে যেন একটি মাত্র বিরাট জীব! এক উপত্যকার গভীর ও ভয়াবহ গহ্বরে ঘোড়াশুদ্ধ লাফিয়ে পড়ে পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার ভিতরে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারপর উপত্যকার অপর পারে গিয়ে ছায়ার ভিতর থেকে আবার তারা আবির্ভূত হল! তখনো তারা বিশৃঙ্খল নয়—মাথার উপর দিয়ে ছুটছে গোলাগুলির ঝড়, তবু তারা আগেকার মতই শ্রেণীবদ্ধ! দ্রুত কদমে ছুটে চলেছে গম্ভীর, নির্বিকার ভৈরব অশ্বারোহীর দল! কামান-বন্দুকের ঘন ঘন গর্জনের মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে বিরাট অশ্বপদ-শব্দ! পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সেই তীব্র গতির ঝটিকা!

লুকানো কামান-সারের পিছনে দাঁড়িয়ে ইংরেজ পদাতিকরা অপেক্ষা করছে, যারা আসছে তাদের দিকে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করে,—শান্ত, বোবা, স্থির! তারাও অশ্বারোহীদের দেখতে পাচ্ছে না, অশ্বারোহীরাও দেখতে পাচ্ছে না তাদের! তারা শুনছে কেবল নরবন্যা-প্রবাহের ধ্বনি, তিন হাজার ঘোড়ার খুরের শব্দ! আর শোনা যাচ্ছে অসি-ঝঞ্ঝনা আর বন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের মতন কি একটা প্রচণ্ড ধ্বনি! তারপর হল এক গম্ভীর স্তব্ধতার সঞ্চার, তারপর জাগ্‌ল তরবারির তাণ্ডব, সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, মুখর ভেরী, পতাকার পর পতাকা এবং তিন হাজার সম্মিলিত

কণ্ঠের উন্মত্ত জয়নাদ—"সম্রাট্ দীর্ঘায়ু হোন!" এসে পড়ল যেন এক মূর্তিমান ভূমিকম্প!

আচম্বিতে এক ট্রাজেডি! ফরাসী ঘোড়সওয়ারের দক্ষিণ পার্শ্ব হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ইংরেজদের ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে ঝড়ের তোড়ে অশ্বারোহীরা সভয়ে দেখলে, সামনেই এক সুদীর্ঘ খাত! এটা ছিল একেবারেই অভাবিত! খাতটি চওড়ায় তেরো ফুট! কিন্তু তখন আর সাবধান হবার কোন উপায়ই নেই! ধাবমান দ্বিতীয় সারের ধাক্কায় প্রথম সার এবং তৃতীয় সারের ধাক্কায় দ্বিতীয় সারের ঘোড়ারা সওয়ারদের নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল সেই ভয়াবহ খাতের ভিতরে গিয়ে! মুক্তিলাভ অসম্ভব! নীচে পড়ে ঘোড়াগুলো চার পা তুলে ছটফট করতে ও গড়াগড়ি দিতে লাগল—যেন জীবন্ত পেষণ-যন্ত্রে ধরা পড়ে সওয়ারদের হাড়গোড়গুলো গুঁড়ো হয়ে গেল—সমস্ত খাতটাই হয়ে উঠল রক্তাক্ত! যে উত্তেজনায় ফরাসীরা ছুটে আসছিল ইংরেজদের হত্যা করতে, সেই উত্তেজনার ঝোঁকেই তারা করলে আত্মহত্যা! যতক্ষণ-না সেই নির্দয় খাত অশ্বদেহে ও নরদেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ মিটবে না তার ক্ষুধা!......তাই হল। খাত কানায় কানায় ভরে উঠল—জলে নয়, জীবন্ত জীবের দেহে! তখন তাদের উপর দিয়ে, তখনো-জ্যান্ত দেহগুলো মাড়িয়ে ধেয়ে চলল বাকি অশ্বারোহীর দল! একটা সমগ্র ব্রিগেডের অধিকাংশ সৈন্যকে গ্রাস করে ফেললে সেই ভীষণ খাত!

এদিকে এই মারাত্মক অভিনয় চলছে, ওদিকে ইংরেজদের লুকানো কামানগুলো আরম্ভ করলে অগ্নিবর্ষণ। কিন্তু অশ্বারোহীরা থামল না, খাতের ক্ষুধার্ত উদর তাদের অনেককে গ্রাস করেছে বটে, কিন্তু তবু তারা ভগ্নোৎসাহ হয় নি। পূর্ণগতিতে ইংরেজ ফৌজের দিকে তারা ছুটিয়ে দিলে ঘোড়া! তারা ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলে, তরবারি দাঁতে কামড়ে ধরলে এবং প্রত্যেকেই দু-হাতে নিলে দুটো পিস্তল! এইভাবে করলে তারা আক্রমণ!

চতুষ্কোণ ব্যূহের মধ্যে ফরাসী সৈন্যরা পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে রইল। চারিদিক থেকে তারা আক্রান্ত হল। ভয়াবহ! সে যেন ক্রুদ্ধ ঘূর্ণাবর্তের আক্রমণ! ইংরেজদের প্রথম সার মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুকের বেওনেট তুলে অশ্বারোহীদের করলে সাংঘাতিক অভ্যর্থনা! দ্বিতীয় সার দণ্ডায়মান হয়ে বন্দুক ছুঁড়লে। দ্বিতীয় সারের পিছন থেকে গোলন্দাজরা কামান দাগতে লাগল। কামানের গোলার পথ খুলে দেবার জন্যে চতুষ্কোণ ব্যূহের সমুখটা ফাঁক হয়ে একবার দুদিকে সরে গেল, তারপর পথ আবার বন্ধ!

অশ্বারোহীরাও আনলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে মৃত্যু—ধ্বংসের বিরুদ্ধে ধ্বংস! তাদের ঘোড়াগুলো লাফ মেরে সেই চতুষ্কোণ ব্যূহের জীবন্ত প্রাচীর ডিঙিয়ে বেওনেটের

উপর দিয়ে ভিতরে এসে পড়ল! চতুষ্কোণ ব্যূহগুলো যেন ভল্‌কানো, আক্রান্ত হয়েছে মেঘের দ্বারা; যেন আগ্নেয়োদ্গার লড়ছে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে। প্রথম ধাক্কাতেই ব্যূহের চতুষ্কোণ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। সেখানে ছিল হাইল্যান্ডাররা। চতুর্দিকে যখন মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা, সেই সময়ে ফৌজের ব্যাগপাইপ বাদক যেন গভীর বিস্মৃতির মধ্যে একটা দামামার উপরে বসে যুদ্ধ সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করতে লাগল—তার দুই চোখে নৃত্য করছিল যেন স্কটল্যান্ডের শ্যামল বন ও নীল হ্রদের প্রতিচ্ছায়া! তার হাতের তলায় থেকে ব্যাগপাইপের রাগিণী শোনাচ্ছিল যেন সুদূর পর্বতের ভাষা! এই গান শুনতে শুনতে হাইল্যান্ডাররা অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করলে। একজন অশ্বারোহী এসে বাদকের হাত তরবারি চালিয়ে কেটে দুখানা করে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের অবসান!

মৃত্যু-খাত অশ্বারোহীদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে বটে এবং ইংরেজরাও সংখ্যায় তাদের চেয়ে ঢের বেশি! তবু তারা এক-একজন দশজন হয়ে লড়তে লাগল। ইংরেজ-পক্ষের হ্যানোভার-দেশীয় সৈন্যদের দল ভেঙে গেল। তাই দেখে ওয়েলিংটন তখনি সমারসেট্ সাদী-সৈন্যদের ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তে নেপোলিয়নও যদি তাঁর পদাতিকদের স্মরণ করতেন, তাহলে জয়লাভ করতেন তিনিই। তাঁর এই ভুল হল মারাত্মক ভুল! ফরাসী অশ্বারোহীরা দেখলে, তাদের সামনে রয়েছে ইংরেজদের চতুষ্ক-ব্যূহ এবং পিছনে এসে দাঁড়াল সমারসেট ড্রাগনের দল—সংখ্যায় ১,৪০০! সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে আক্রান্ত হয়েও তারা লড়তে লাগল অদম্য উৎসাহে! সে যেন সশস্ত্র বিদ্যুতের সাইক্লোন্! মুহূর্ত-মধ্যে দেখা গেল ১,৪০০ শত্রু-সাদীদের মধ্যে বেঁচে আছে ৮০০ জন! কিন্তু চতুষ্ক-ব্যূহ তখনো অটল! উপরি-উপরি বারো বার আক্রমণ হল! চার-চারবার সেনাপতি নে'র ঘোড়া মারা পড়ল। ফরাসী অশ্বারোহীদের অর্ধেক মৃত। এই সংঘর্ষ চলল দুই ঘণ্টা ধরে।

ইংরেজ বাহিনীর তখন অত্যন্ত দুর্দশা। পথিমধ্যে মৃত্যু-খাতের দুর্ঘটনা না ঘটলে ফরাসী অশ্বারোহীরা এতক্ষণে ইংরেজদের মধ্যভাগ নিশ্চয়ই ভেঙে দিতে পারত। কিন্তু তবু তারা তেরটি চতুষ্ক-ব্যূহের মধ্যে সাতটিকে ধ্বংস করে ফেলেছে এবং ছয়টি পতাকা দখল করে নেপোলিয়নের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে!

ওয়েলিংটনের অবস্থা টলোমলো! ইংরেজদের রক্তে ভেসে যাচ্ছে রণক্ষেত্র। চরমকাল নিকটস্থ!

বাম পার্শ্ব থেকে ইংরেজ সেনাপতি কেম্প্‌ট্ আরো সৈন্য চেয়ে পাঠালেন।

ওয়েলিংটন জানালেন, "আর সৈন্য নেই। কেম্প্‌ট্‌কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে বল।"

ফরাসীদেরও যাই-যাই অবস্থা! নে পদাতিকদের সাহায্য চাইলেন।

নেপোলিয়ন বললেন, "পদাতিক? কোথায় পাব? আমি কি পদাতিক তৈরি করব?"

কিন্তু ইংরেজদের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয়। দলে দলে সৈন্য মারা পড়েছে। বড় বড় জেনারেলরা মৃত—তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে কাজ চালাচ্ছে ক্যাপ্টেন বা লেফ্‌টেনান্ট্‌রা। হ্যানোভার হুসারের দল প্রাণপণে পলায়ন করছে! অন্য যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেও ঐ দৃশ্য! পলাতকের পর পলাতকের দল ছুটেছে!

ওয়েলিংটনের মুখ প্রশান্ত, কিন্তু তাঁর ঠোঁট সঙ্কুচিত। বেলা পাঁচটার সময়ে তিনি ঘড়ি বার করে বললেন, "হয় ব্লুচার, নয় রাত্রি আসুক্।"

ঠিক এই মুহূর্তেই বহুদূরে দেখা গেল জ্বলন্ত বেওনেটের দীর্ঘ রেখা! এইখানেই হল এই বৃহৎ নাটকের দৃশ্য-পরিবর্তন!

নেপোলিয়ন আশা করেছিলেন চৌত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর সেনাপতি গ্রাউচি এইবারে এসে উপস্থিত হবেন। কিন্তু তাঁর বদলে এলেন প্রুশিয়ান সেনাপতি ব্লুচার! জীবনের বদলে মৃত্যু! ব্লুচার আর একঘণ্টা পরে এলে রণক্ষেত্রে ইংরেজদের দেখা পেতেন না, সেখানে শুনতেন কেবল ফরাসীদের জয়ধ্বনি।

পাঁচটার সময়ে রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়ে ব্লুচার দেখলেন ওয়েলিংটনের অবস্থা বিষম সঙিন! নিজের সেনাপতিকে ডেকে তিনি বললেন, "বুলো, ফরাসীদের আক্রমণ কর—ইংরেজদের একটু হাঁপ ছাড়বার সময় দাও!"

আক্রমণ করলে প্রুশিয়ানরা—তাদের ছিয়াশিটা নতুন কামান অগ্নি উদগার করতে লাগল! নতুন পদাতিক-দল, নতুন অশ্বারোহী-দল! ফরাসীরা হটে আসতে লাগল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিশৃঙ্খল, শ্রান্ত ফরাসীরা আবার এক নতুন যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হল। সমগ্র ইংরেজ বাহিনী আবার আক্রমণ করতে অগ্রসর হল। সামনে ধ্বংস, পাশে ধ্বংস! ফরাসীদের এই চরম কালে নেপোলিয়ন আহ্বান করলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'ইম্পিরিয়াল গার্ড' দলকে।

গার্ডরা যখন শুনলে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছে, তখন তারা দৃপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"সম্রাট্ দীর্ঘায়ু হোন!"

সারাদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হঠাৎ এখন মেঘ সরে গেল। দিকচক্রবাল-রেখা রঞ্জিত হয়ে উঠল অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ মহিমায়! গার্ডরা এমনি আরক্ত সূর্য দেখেছিল একদিন অস্টারলিট্‌জের উদয়াচলে! বহু যুদ্ধে বারংবার পরীক্ষিত এই প্রাচীন ও দুর্ধর্ষ রক্ষী-সৈনিকরা সন্ধ্যা-রাগরক্ত আকাশের দিকে তাদের ঈগল-চিহ্নিত পতাকা আন্দোলিত করে চোখে-মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত জাগিয়ে তালে তালে পা ফেলে অগ্রসর হল, তখন প্রত্যেক শত্রুর হৃদয় অভিভূত হল ফ্রান্সের

প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়। তাদের মনে হল যেন দলে দলে শরীরী বিজয় রণাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে! এখন যারা জয়ী, তারাও পরাজিতের মতন সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে পড়তে লাগল পায়ে পায়ে!

ওয়েলিংটন প্রমাদ গুণে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এগিয়ে এস রক্ষিগণ! আক্রমণ কর!"

ঝোপের ভিতরে আত্মপ্রচ্ছন্ন করে ইংরেজদের লাল পল্টন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, এইবারে তারা এগিয়ে এল—বিষম গুলিবৃষ্টিতে ফরাসীদের ত্রিবর্ণ পতাকা শতচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দুই পক্ষই ঝাঁপিয়ে পড়ল পরস্পরের উপরে—আরম্ভ হল প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড! ইম্পিরিয়াল গার্ডের সৈনিকরা অন্ধকারে অনুভব করলে, তাদের চারিদিক দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ফরাসী সৈন্যেরা! তাদের প্রাণে প্রাণে জাগল পরাজয়ের নিরাশা! সম্রাটের নামে জয়ধ্বনির পরিবর্তে শুনতে পেলে "পালাও পালাও" রব! কিন্তু এ-শব্দের বিভীষিকা উপলব্ধি করেও ইম্পিরিয়াল গার্ড অটল পদে অগ্রসহ হতে লাগল! পদে পদে মৃত্যু, তবু তারা এগিয়ে যাচ্ছে পদে পদে! কেউ ইতস্তত করলে না, কেউ কাপুরুষতা দেখালে না! আত্মহত্যা করবার ভয়েও জনপ্রাণী হল না পশ্চাৎপদ!

নে'র দেহের তলায় পঞ্চম ঘোড়া মারা পড়ল! মৃত্যুপণ করে তিনি ষষ্ঠ ঘোড়ায় চেপে আবার ঝাঁপ দিলেন রক্ত-সাগরে। তখন তাঁর দুই চক্ষু আসন্ন আত্মবিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, বোতাম-ছেঁড়া জামা ঝল্-ঝল্ করে ঝুলছে। তাঁর পোশাকের উপরে কোথাও তরবারির এবং কোথাও বুলেটের দাগ—কর্দমাক্ত, রক্তাক্ত, তবু অপূর্ব সেই বীর ভাঙা তরবারি তুলে ছুটে এসে বললেন, "তোমরা দেখ, ফরাসীদের সেনাপতি কেমন করে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেয়!" কিন্তু বৃথা! বৃথা! নে'র মৃত্যু হল না!

অসংখ্য শত্রু মুষ্টিমেয় ফরাসীদের উপরে অশ্রান্ত গোলাগুলি বৃষ্টি করছে দেখে নে চীৎকার করে উঠলেন, "এখানে কি আমার জন্যে কিছুই নেই? হায়! আমার ইচ্ছা ইংরেজদের সমস্ত বুলেট আমারই দেহে প্রবেশ করুক!" হা হতভাগ্য, ইংরেজ বুলেট নয়, তোমার জন্যে তোলা আছে ফরাসী বুলেট! (নেপোলিয়নের পতনের পর নতুন ফরাসী সম্রাটের হুকুমে মহাবীর নে'কে গুলি করে মেরে ফেলা হয়!)

গার্ডরা যখন প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে, অন্যান্য দিকে ফরাসী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আচম্বিতে! "পালাও পালাও' রবের সঙ্গে শোনা গেল "বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাসঘাতকতা!" সেনাদলের ধ্বংস হচ্ছে তুষার গলে যাওয়ার মতন। তখন সমস্তই ব্যর্থ হয়, ছিঁড়ে যায়, ভেঙে যায়, ভেসে যায়, গড়িয়ে যায়, ডুবে যায়,

ধাক্কা খায়, পালায়, পতিত হয়। নে তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ায় চড়ে টুপীহীন, গলাবন্ধহীন, অস্ত্রহীন অবস্থায় পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে ছুটলেন—কিন্তু সে যেন হল বন্যার মুখে বালির বাঁধ দেবার দুশ্চেষ্টার মতন! পলাতকরা সসম্ভ্রমে চীৎকার করে উঠল—"সেনাপতি নে দীর্ঘায়ু হোন!" কিন্তু তারপরেই বেগে পলায়ন করতে লাগল! আতঙ্কের সময়েই হয় বেশি হাঙ্গামা, অন্ধের মতন পালাতে গিয়ে বন্ধু করে বন্ধু হত্যা! ইম্পিরিয়াল গার্ডের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে নেপোলিয়ন স্বয়ং পলাতকদের বাধা দিতে গেলেন—কিন্তু বৃথা! তিনি তাদের মিনতি করতে, ভয় দেখাতে, উৎসাহ দিতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু বৃথা! সকালে যারা চেঁচিয়েছিল "সম্রাট্ দীর্ঘায়ু হোন" বলে, এখন তারা যেন তাঁকে চিনতেই পারলে না!

একেবারে তাজা প্রুশিয়ান অশ্বারোহীর দল মৃত্যুর খেলা শুরু করলে। কামান নিয়ে ফরাসী গোলন্দাজরা পালাতে লাগল, অনেকে গোলার বাক্স-গাড়ির ঘোড়া খুলে নিলে—তাড়াতাড়ি পালাবার জন্যে। চারিদিকে ভিড়ের ঠেলাঠেলি—জীবন্ত ও মৃতদেহকে পদদলিত করে। রাস্তা, মেঠো-পথ, সাঁকো, ময়দান, পাহাড়, উপত্যকা, অরণ্য আচ্ছন্ন করে চল্লিশ হাজার পলাতক পালিয়ে যাচ্ছে! যারা ছিল সিংহ, তারা হল হরিণ!

সেনানী লোজে বহু চেষ্টায় তিনশত লোককে ফিরিয়ে দাঁড় করালেন। কিন্তু প্রুশিয়ানদের প্রথম ঝাঁক গুলি ছুটে আসবামাত্র তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবার পালাতে লাগল—লোজে হলেন বন্দী! ব্লুচার নিষ্ঠুর ভাষায় হুকুম দিলেন, "ফরাসীদের একেবারে ধ্বংস করে ফ্যালো!" প্রুশিয়ানরা প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করলে!

দুজন ফরাসী সেনানী একটি ছন্নছাড়া লোককে দীর্ঘ কোটের প্রান্ত ধরে টেনে ফেরাবার চেষ্টা করছেন! পলাতকদের বন্য ঠেলায় তিনি এত পিছনে হটে আসতে বাধ্য হয়েছেন, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। কিন্তু এখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে লাগাম ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মতন আবার ওয়াটার্লু ক্ষেত্রের দিকে ফিরে যেতে চান। ইনি হচ্ছেন নেপোলিয়ন, স্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেছে!

কিন্তু তখনো ইম্পিরিয়াল গার্ডের বিভিন্ন দল বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। চতুর্দিকব্যাপী আতঙ্কের বিপুল বন্যার মাঝে মাঝে তাদের দেখাচ্ছে অটল শৈলের মতন। রাত্রি আসন্ন, মৃত্যুও আসন্ন, এই দুই আসন্ন অন্ধকার কখন তাদের আবৃত করে ফেলবে, তারা তারই প্রতীক্ষায় আছে। কোন দলের সঙ্গে কোন দলেরই যোগ নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই মৃত্যুর জন্যে বদ্ধপরিকর!

সন্ধ্যার পর এক জায়গায় এমনি একটি দলকে দেখা গেল। তাদের চারিদিকে

অসংখ্য শত্রু এবং ঝরে পড়ছে গোলাগুলির ভীষণ ধারা! কিন্তু তবু তারা লড়ছে! এ-দলের নায়ক হচ্ছেন একজন অজানা সেনানী, নাম তাঁর ক্যাম্‌ব্রোন। যখন দলের লোক মুষ্টিমেয়, যখন তাদের পতাকা পরিণত ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুক্‌রোয়, যখন তাদের গুলিশূন্য বন্দুক যষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, যখন মৃতের স্তূপ জীবন্তদের চেয়ে বৃহৎ, তখন আক্রমণকারী বিজয়ী শত্রুসৈন্যরাও মানুষদের এমন মহান্‌ভাবে মরতে দেখে পবিত্র এক ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল—তারা গোলাগুলি ছোঁড়া বন্ধ করলে! কিছুক্ষণ সব শান্ত। তারপর আবার কামান-বন্দুকের গভীর গর্জনে কেঁপে উঠল চারিদিকের পাহাড়েরা! উঠন্ত চাঁদের আলোয় রাশীকৃত ধোঁয়া যখন মিলিয়ে গেল, তখন সেখানে আর একজনও মানুষ দাঁড়িয়ে নেই। গার্ডের দল নিঃশেষ! তাদের বুকের ভিতরে চিরনিদ্রিত হল কত যুদ্ধের গৌরবময় স্মৃতি!

ওয়াটার্লু হচ্ছে একটি প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ, কিন্তু তার বিজয়ী হচ্ছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সেনাপতি। সেনাপতি ওয়েলিংটনের চেয়ে উল্লেখ্য হচ্ছে ইংলন্ডের সৈন্যদল! কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈবের খেলা! যুদ্ধের পূর্বরাত্রে সেই অসাময়িক বৃষ্টি, সেই অভাবিত মৃত্যু-খাত, কামান-ধ্বনি শোনবার পরেও ফরাসী নায়ক গ্রাউচির সেই অনুপস্থিতি, যথাসময়ে ব্লুচারের সেই আবির্ভাব—এই-সব দৈব-দুর্ঘটনা বিচিত্রভাবে নিয়মিত হয়েছে!

১১

সূর্যাস্ত

এল্‌বা থেকে ফিরে এসে নেপোলিয়নের একশো দিনের রাজত্ব শেষ হল। নেপোলিয়ন আবার বাধ্য হলেন সিংহাসন ত্যাগ করতে (২৩ জুন, ১৮১৫ খৃ.)।

কিন্তু মিত্রপক্ষ এবারে আর তাঁর সঙ্গে কোনরকম সদয় ব্যবহার করতে রাজি হলেন না। এজন্যে মিত্রপক্ষের দোষ নেই। য়ুরোপের রাজারা তাঁর কাছে বহুবার নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁর অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা য়ুরোপকে বারে বারে করে তুলেছে রক্তপিচ্ছিল। রাজাদের কাছে তিনি ছিলেন বাস্তব দুঃস্বপ্নের মতন। গতবারে তাঁকে স্বাধীন ভাবে এল্‌বা দ্বীপে বাস করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি আবার এসে সব ওলটপালট করে দিলেন।

নেপোলিয়ন বললেন, আমাকে আমেরিকায় যেতে দাও।

য়ুরোপ বললে, না। তুমি আবার ফিরে আসতে পারো।

নেপোলিয়ন ইংলন্ডগামী জাহাজে চড়ে বললেন, আমি ইংরেজদের আতিথ্য স্বীকার করলুম।

ইংলন্ড বললে, না, তুমি যুদ্ধে বন্দী। তোমার নিজের মতামতের মূল্য নেই। তোমাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দীর মতন থাকতে হবে। আজ থেকে তুমি আর সম্রাট্ নও, জেনারেল বোনাপার্ট মাত্র।

ছেলেবেলায় 'কপি-বুকে'র শেষ পাতায় তিনি লিখে রেখেছিলেন—"সেন্ট হেলেনা, আটলান্টিক মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইংরেজদের উপনিবেশ।"

আজ সেইখানেই তাঁকে যেতে হল, জীবনের শেষ-অঙ্কের উপরে যবনিকাপাত করতে (১৭ অক্টোবর, ১৮১৫ খৃ.)।

দ্বীপ-কারাগারের পর্বত। নেপোলিয়ন বসে আছেন একখানি পাথরের উপরে। সুমুখ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অশান্ত মহাসাগর।......মানুষ-নেপোলিয়নকে সমুদ্রের সামনে দেখাচ্ছে কত ছোট! কিন্তু মানুষ-নেপোলিয়নের হৃদয়-সাগরে যে অনন্তের প্রকাশ, আটলান্টিক কি তার চেয়েও বৃহৎ?

স্বাধীন হলে মানুষ-নেপোলিয়ন যে আরো কত বড় হতে পারতেন, তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু তিনি যতটা বৃহৎ হতে পেরেছেন, তাও ছিল কল্পনার অতীত। জার্মান কবি গ্যেটে বলেছেন :

"যাহা কিছু তুচ্ছ হেথা, দৃষ্টি হতে যায় যে মিলায়ে,
গণনীয় হয় শুধু মহাদেশ, বিপুল সাগর!"

মানুষ হলেও নেপোলিয়নের সঙ্গে মহাদেশ বা মহাসাগরেরই তুলনা করা চলে।

সেন্ট হেলেনায় বড় কষ্টে যে নেপোলিয়নের দিন কাটতে লাগল, সে কথা বলাই বাহুল্য। তিনি ছিলেন মুক্ত পৃথিবীর স্বাধীন জীব। দুই মহাদেশ—য়ুরোপ ও আফ্রিকা ছিল তাঁর বিচরণ-ক্ষেত্র, কর্মের প্রচণ্ড স্রোতে অশ্রান্ত ভাবে সাঁতার দেওয়াই তাঁর একমাত্র আনন্দ ছিল। শিলাময় ক্ষুদ্র সেন্ট হেলেনার সংকীর্ণতার মধ্যে অলসভাবে বসে বসে কেবল অতীত-গৌরবের স্বপ্ন দেখা তাঁর সহ্য হবে কেন? তার উপরে এ দ্বীপটি ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তাঁকে এখানে বন্দী রেখে ইংরেজরা মানবতার পরিচয় দেন নি। দেখতে দেখতে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল।

প্রথম প্রথম তিনি বাড়ির বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসতেন। কিন্তু সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত ইংরেজ সেপাই—পাছে তিনি আবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান।

এই নির্দয় বাড়াবাড়ি দেখে তিনি যার-পর-নাই অপমান জ্ঞান করলেন এবং

বাইরে বেড়ানো একেবারেই ছেড়ে দিলেন। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাটাতে লাগলেন দিন-রাত। ফলে স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হল। এমন-কি অঙ্গ-সঞ্চালনের অভাবে তাঁর দুই পা ফুলে উঠল।

দ্বীপের গভর্নর স্যর হাডসন লো যে তাঁর উপরে অত্যাচার ও তাঁকে অপমান করে আনন্দলাভ করতেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অকারণেই তিনি বন্দীকে অন্বেষণ করতে আসতেন। একদিন নেপোলিয়ন কফির পেয়ালা হাতে করেছেন, এমন সময়ে লো এসে হাজির। তিনি বিদায় হলে পর নেপোলিয়ন বললেন, "কফির পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দাও। ঐ নোংরা লোকটা এর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।"

নেপোলিয়নের মুখের উপরে তাঁকে 'জেনারেল' বলে ডেকে গভর্নর তাঁকে আহত করবার চেষ্টা করতেন। সম্রাট্ নেপোলিয়নের পক্ষে এ সম্বোধন ছিল অসহনীয়!

একদিন লো এসে অভিযোগ করলেন, "আপনার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। খরচ কমাবার চেষ্টা করুন।"

নেপোলিয়নের দুই চক্ষে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা। মহাক্রোধে বললেন, "এ-সব বিষয় নিয়ে তুমি কোন্ সাহসে আমার সঙ্গে কথা কইতে আসো? তুমি সামান্য জেল-দারোগা ছাড়া আর কিছুই নও!"

গভর্নর বিনাবাক্যব্যয়ে সরে পড়লেন।

তারপর থেকে গভর্নর আর কোনদিন নেপোলিয়নের দেখা পান নি। তিনি এলেই শুনতেন, 'দেখা হবে না।' তবু একদিন তিনি জোর করে দেখা করবার চেষ্টা করলেন।

ঘরের ভিতর থেকে চাকরকে সম্বোধন করে নেপোলিয়ন চেঁচিয়ে বললেন, "ওকে বলে দাও ঘাতকের কুঠার আনতে। ও লোকটাকে এ ঘরে ঢুকতে হবে আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে। শীঘ্র আমার পিস্তল নিয়ে এস!"

গভর্নর আর ভিতরে ঢুকতে ভরসা করলেন না। তারপর তিনি আর একদিন মাত্র বন্দীর দেখা পেয়েছিলেন—নেপোলিয়ন যখন মৃত।

সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের সঙ্গে কয়েকজন ফরাসী সঙ্গী ছিলেন, একজন সস্ত্রীক। তাঁদের নিয়েই অতীত ও বর্তমানের গল্প করে তাঁর দিন কোনরকমে কাটত। কিন্তু এ-ভাবে দিন-কাটানো যে অত্যন্ত কষ্টকর, এটা তাঁর হাব-ভাব-ব্যবহারে বোঝা যেত সর্বদাই। নির্বাসিত জীবনে প্রতিদিন খুব বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে তিনি ঘরের বাইরে আসতেন—জাগ্রত অবস্থায় দিনের দীর্ঘতা কমে যাবে বলে। কোন কোন দিন রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময়ে বলতেন, "আঃ, জীবনের আর-একটা দিন কমে গেল!"

এল্‌বা-যাত্রার সময়ে ইম্পিরিয়াল গার্ডদের কাছে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন, তাদের কীর্তিকাহিনী রচনা করবেন। কিন্তু এতদিন সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। সেন্ট হেলেনায় হাতে প্রচুর সময় পেয়ে নেপোলিয়ন নিজের জীবনস্মৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ঘরের ভিতর পায়চারি করতে করতে তিনি বলে যেতেন, অন্য কেউ লিখে নিত। কিছুমাত্র বিশ্রাম না নিয়ে পুরো চৌদ্দ ঘণ্টা তিনি নানা বর্ণনা করে যাচ্ছেন, যে লিখছে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ছে এবং তার স্থানগ্রহণ করছে নতুন কোন লোক, এই সামান্য পরিশ্রমে শ্রান্তি দেখে নেপোলিয়নের মুখে ফুটে ওঠে অবজ্ঞার হাসি!

কোন কোন দিন অতীতের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "আমার মরা উচিত ছিল মস্কো শহরে গিয়ে। তখনো পর্যন্ত আমার যশোগৌরব ম্লান হয় নি!......ভগবান তখন যদি একটি বুলেট পাঠিয়ে দিতেন! তাহলে ফ্রান্সের সিংহাসনে বিরাজ করত আমার বংশই; আলেকজান্ডার আর সিজারের সঙ্গে ইতিহাস আমার তুলনা করত। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, এখন আমি প্রায় কিছুই নই।"

আর একদিন বলেন, "বোরোডিনো যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে আমার মৃত্যু হত আলেকজান্ডারের মতন। ওয়াটার্লুতে মরাও ছিল ভালো। বোধহয় ড্রেস্‌ডেনের যুদ্ধে মরলে ভালো হত আরো। না, না, ওয়াটার্লুর মৃত্যুই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। লোকের ভালোবাসা পেতুম, তারা আমার জন্যে কাঁদত।"

এমনি ভাবে ভেবে ভেবে দিন যায়। দেহের ভিতরে ব্যাধির অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। তিনি বলেন, "আমার পেটের ভিতরটা জ্বলছে যেন আগুনের মতন।" কখনো কখনো দারুণ যন্ত্রণায় মেঝের উপরে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকেন।

তাঁর জীবনের শেষ বৎসর এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রথম সাত মাস ধরে তিনি নিজের বাড়ি-সংলগ্ন জমির উপরে করলেন চমৎকার বাগান রচনা। যাঁরা সে বাগান দেখলেন, বললেন—"বিস্ময়কর কীর্তি!" এটি হচ্ছে নেপোলিয়নের নিজের হাতের শেষ-দান। যুদ্ধ নয়, রাজনীতি নয়, শেষের কবিতা!

জন্মদিন। নেপোলিয়ন সকলকে খাওয়ালেন, শিশুদের উপহার দিলেন। বললেন, "এই আমার শেষ জন্মদিন।"

শরৎকাল। চার বৎসর পরে নেপোলিয়ন প্রথম বাড়ির বাইরে গেলেন। ঘোড়ায় চড়ে অনেকটা পথ বেড়িয়ে এলেন। এই তাঁর শেষ ভ্রমণ।

ভক্তরা গোপনে তাঁকে দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইলেন। এমন প্রস্তাব দুই দুই বার হয়। নেপোলিয়ন নারাজ হয়ে বললেন,

"নিয়তির লিখন হচ্ছে, আমি এইখানেই মরব। আমেরিকায় গেলে হয় আমাকে হত্যা করা হবে, নয় লোকে আমাকে ভুলে যাবে। আমি আত্মোৎসর্গ না করলে ফ্রান্সের সিংহাসনে আমার বংশের প্রতিষ্ঠা হবে না। তাই আমি থাকতে চাই সেন্ট হেলেনায়।"

রোগের লক্ষণ অধিকতর প্রকট। নেপোলিয়ন দুঃখিত স্বরে বলেন, "বিছানা আজ আমার এত প্রিয় হয়ে উঠেছে যে, এর বদলে আমি আর সিংহাসনও গ্রহণ করব না। আমি কী করুণাপাত্র জীব হয়ে উঠেছি! আমি—যার কখনো ঘুমোবার প্রায় দরকারই হত না—এখন কিনা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েই দিনের পর দিন কাটাই! আগে আমি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে বলে যেতুম, আর তা লিখে নেবার জন্যে আবশ্যক হত একসঙ্গে চার-চারজন সেক্রেটারির! সেদিন গিয়েছে, যেদিন আমি ছিলুম নেপোলিয়ন।"

নেপোলিয়নের এই উক্তির মধ্যে নেই অত্যুক্তি। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর তিনি জীবনে একদিনের জন্যেও ছুটি নেন নি। কাজ, কাজ, কাজ! তিনি স্ফূর্তিলাভ করতেন কর্মস্রোতে ঝম্প দিয়েই। এত-বড় কর্মবীর পৃথিবীতে আর কখনো জন্মেছেন কিনা সন্দেহ!

মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে তাঁর অবশিষ্ট শক্তির শেষ-বিকাশ দেখা গেল। একাসনে একটানা পুরো পাঁচঘণ্টা ধরে বসে তিনি নিজের উইল রচনা করলেন। সে উইল এক অপূর্ব জিনিস এবং প্রমাণিত করে যে, শেষ-পর্যন্ত তাঁর মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

নেপোলিয়নের নিজের মত হচ্ছে, "আমার মৃত্যুর কারণ, এই অস্বাস্থ্যকর দ্বীপ। তার উপরে এক বৎসরকাল আমাকে চিকিৎসকের সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল।......ইংরেজ রাজমন্ত্রীদের চক্রান্তে ঐ নগণ্য পাহারাওয়ালা হাড্‌সন লো আমাকে তিলে তিলে হত্যা করবার চেষ্টা করছে।......ইংলন্ডেরও ধ্বংস হবে ভিনিসের গর্বিত প্রজাতন্ত্রের মতন। আমার মৃত্যুর জন্যে যা-কিছু লজ্জা আর নৃশংসতা, ইংলন্ডের রাজপরিবারকে আমি দান করে গেলুম।"

বন্দী-দশায় যে কয়েকজন সহচর বা অনুচর নেপোলিয়নের সেবা-পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা লাভ করবে স্বদেশ প্রত্যাগমনের মিষ্ট শান্তি। তোমরা আবার দেখতে পাবে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুগণকে। আর আমি? স্বর্গধামে গিয়ে আবার দেখতে পাব আমার নির্ভীক যোদ্ধাবৃন্দকে।"—বলতে বলতে কণ্ঠস্বর উচ্চতর হয়ে উঠল—"হ্যাঁ, ক্লেবার, দেসেক্স, বিসিয়ার্স্, দুরক্, নে, মুরাট, মেসেনা, বার্দিয়ার,—তারা সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে; আমরা সবাই মিলে যে কীর্তি স্থাপন করেছি, তারা সেই গল্পই

করবে। আমিও তাদের কাছে বলব আমার শেষজীবন-কাহিনী। যখন তারা আমাকে দেখবে, তারা আবার সেই পুরনো উৎসাহে, যশোগৌরবের জন্যে সেই পুরনো আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। মহাবীর স্কিপিয়ো, হানিবল, সিজার আর ফ্রেডারিকের সঙ্গে আমরা আমাদের যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা কইব! সে কী আনন্দ!"

মৃত্যুর দিনকয় আগে তিনি এই পত্রখানি নিজেই রচনা করলেন এবং বললেন, তাঁর মৃত্যুর পরে পত্রখানি যেন যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় :

"মিঃ গভর্নর,

গত— তারিখে, দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগে সম্রাট নেপোলিয়ন পরলোকগমন করেছেন। মহাশয়কে এই সংবাদ জানানো হল। আপনাদের গভর্মেন্ট তাঁর দেহকে য়ুরোপে পাঠাবার কি ব্যবস্থা করেছেন, অনুগ্রহ করে তা জানাবেন।"

যথাসময়ে সবদিক গুছিয়ে-গাছিয়ে তিনি আসন্ন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

মৃত্যুর পদশব্দ শুনতে পেয়ে আর এক বিষয়ের জন্যে সকলকে সাবধান করলেন : "যখন আমি জ্ঞান হারাব, তখন তোমরা কিছুতেই কোন ইংরেজ ডাক্তারকে আমার ছায়া মাড়াতে দিও না।"

তিনি জ্ঞান হারালেন—জ্ঞানোদয়ের পর এই প্রথম এবং শেষ বার!

ঘোর বিকার! মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপ বকছেন : "দেসেক্স! মেসেনা! আমরাই বিজয়লাভ করব! জলদি! অগ্রসর হও! ওরা আমাদের পাল্লায় এসে পড়েছে......"

ভয়াবহ শেষ রাত্রি। ভোরের কিছু আগে তাঁর মুখে শোনা গেল, "ফ্রান্স!...... সৈন্যদল!...... জোসেফাইন!"

পৃথিবীতে এই তাঁর শেষ উক্তি।

সারাদিন চুপ করে শান্তভাবে শুয়ে রইলেন—অন্তিম শ্বাস আরম্ভ হয়েছে! অস্টারলিট্‌জের যুদ্ধক্ষেত্রে যে খাট ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর শেষ-শয্যা বিছানো হয়েছে সেই খাটেই।

বাড়ির বাইরে আকাশ ফুঁড়ে পড়ছে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি—ঝোড়ো বাতাসে ছট্‌ফট্ করছে কুয়াশা।

বৈকাল পাঁচটা। ঝড়-বৃষ্টির হুঙ্কার বেড়ে উঠল—বাগানের দুটো গাছ শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে পড়ল!

মৃত্যু-আক্রান্ত নেপোলিয়ন! দেহের কোথাও যাতনার কোন চিহ্ন নেই। দুই চক্ষু বিস্ফারিত—শূন্য দৃষ্টি। কণ্ঠে ঘড়্-ঘড়্ শব্দ।

সমুদ্রে মগ্ন হল সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল নেপোলিয়নের হৃৎপিণ্ড! (৫ মে, ১৮২১ খৃ.)।

✱ ✱ ✱ ✱

শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে জানা গেল, নেপোলিয়নের মৃত্যুর কারণ উদরের ক্যান্সার।

মৃত্যু এসে নেপোলিয়নকে দিয়ে গিয়েছে তরুণ সৌন্দর্য! সিংহাসনে আরোহণ করবার পর থেকেই তাঁর মুখ ও দেহ অত্যন্ত স্থূল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন তাঁকে দেখাচ্ছে এক সুন্দর যুবকের মতন!

ইংরেজরা বললেন, মৃতদেহ য়ুরোপে পাঠানো হতে পারে না।

মরা নেপোলিয়নও বিপদজনক! দেহ দেখে ফরাসীরা যদি শোকে ও ক্রোধে ক্ষেপে উঠে আবার অস্ত্র ধারণ করে!

পাহাড়ের এক নির্জন উপত্যকা। সেইখানেই মহাবীরের শেষ শয়ন পাতা হল। সমাধির উপরে নত হয়ে ছায়া ছড়িয়ে দিলে দুটি উইলো গাছ। যুদ্ধক্ষেত্রে বারংবার যিনি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁর জন্যে গীতি-কবিতার সুরসৃষ্টি করতে লাগল ছোট একটি নির্ঝর।

ইংলন্ড মৃতের জন্যে একটি সম্মানের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সমাধিকে সর্বদাই পাহারা দিয়েছিল একজন করে সৈনিক। একে একে কেটে গেল উনিশ বৎসর। তারপরে আর পাহারার দরকার হল না, কারণ ফ্রান্স দাবি করলে মৃতদেহ ফিরে পাবার জন্যে। নেপোলিয়ন আবার প্রত্যাগমন করলেন বিজয়ীর মতন।

সম্রাটের মৃত্যুর পরেও ফ্রান্সের নতুন বুর্বন রাজা নেপোলিয়নের নাম শুনলেই ভয়ে চম্‌কে উঠতেন। রাজধানীতে নেপোলিয়নের এক অশ্বারোহী মূর্তি ছিল, রাজার হুকুমে তা স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ফরাসীরা আবার বুর্বন রাজাকে তাড়িয়ে দিলে। ভিন্ন বংশের নতুন রাজা সিংহাসনে বসে জনসাধারণের অনুরোধে নেপোলিয়নের প্রস্তর-মূর্তি আবার ফিরিয়ে আনলেন—পনের বৎসর পর।

ছোট ছেলে জেরোম এসে মা লেটিজিয়াকে এই খবর দিলেন।

জরায় ও রোগে মা তখন বিছানা আশ্রয় করেছেন। চলতে পারেন না, চোখ অন্ধ। কিন্তু খবর শুনেই মায়ের দেহে এল নতুন শক্তি।

বহুকাল পরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বৈঠকখানায় নেমে এলেন।

নেপোলিয়নের একটি প্রস্তরমূর্তির দিকে অন্ধ চোখদুটি ফিরিয়ে মা লেটিজিয়া বললেন, "সম্রাট্ আবার প্যারিতে এসেছেন!"

—ঃ শেষ ঃ—

ফিরোজা-মুকুট রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছন্নছাড়া পথিক

জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। রাস্তার দিকে মুখ বাড়িয়ে বললুম, ''জয়ন্ত, পথ দিয়ে একটা পাগল যাচ্ছে। ওর আত্মীয়-স্বজন কি-রকম লোক জানি না, এমন মানুষকেও একলা পথে বেরুতে দেয়!''

জয়ন্ত উঠে এসে পিছন থেকে আমার কাঁধের উপরে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

বর্ষাকাল। উপর-উপরি কয়েকদিন ধরে প্রবল ধারাপাতের পর কাল থেকে বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনো মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। হু-হু করে বইছে কন্‌কনে হাওয়া। রাজপথের উপরে পুরু কর্দমের প্রলেপ। দিনের বেলাতেই সাঁঝের ছায়ার ইঙ্গিত। যে কোন মুহূর্তে আবার বৃষ্টির পালা শুরু হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে রাজপথ জনশূন্য। দেখা যাচ্ছে কেবল পাগলের মত দেখতে একটিমাত্র মানুষকে।

লোকটির বয়স হবে বোধ হয় বছর পঞ্চাশ। হোমরা-চোমরা লম্বাচওড়া চেহারা, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনে জাগায় সম্ভ্রম। সাজপোষাকও জমকালো। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে তার চালচলন মোটেই খাপ খাচ্ছিল না। সে বেগে ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। থেকে থেকে দুই হাত ছুঁড়ছে এবং মুখভঙ্গি করছে।

আমি বললুম, ''ব্যাপার কি বল দেখি? ও ঘন ঘন মুখ তুলে বাড়িগুলোর নম্বর দেখছে কেন?''

জয়ন্ত বললে, ''আমার বিশ্বাস ও আমাদেরই বাড়ি খুঁজছে।''

—''আমাদের বাড়ি?''

—''হ্যাঁ। বোধ হয় ও কোন বিপদে পড়েছে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছে। ঐ দেখ, যা ভেবেছি তাই।''

মূর্তিটা আমাদের বাড়ির সামনে এসেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে খুব জোরে জোরে কড়ানাড়া দিতে লাগল।

আমাদের বেয়ারা মধু যখন তাকে উপরে নিয়ে এল, তখনও সে হাঁপাতে হাঁপাতে বিকৃত মুখভঙ্গি করতে লাগল বটে, কিন্তু তার স্তম্ভিত চোখদুটির ভিতরে এমন মর্মভেদী যাতনা ও নিরাশার ভাব দেখলুম যে, আমরা আর হাসতে পারলুম না, মন ভরে উঠল সকরুণ সমবেদনায়।

খানিকক্ষণ সে কোন কথাই কইতে পারলে না, পাগলের মত দুই হাতে মাথার চুল ধরে টানাটানি করতে লাগল, তারপর হঠাৎ দেওয়ালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এত জোরে মাথা ঠুকলে যে, আমরা দুজনেই তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ঘরের মাঝখানে টেনে আনলুম।

জয়ন্ত তাকে একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে বসিয়ে, নিজেও তার পাশে আসন গ্রহণ করলে। তারপর শান্ত, মিষ্ট স্বরে বললে, "আপনি আমাদের কাছে নিজের বিপদের কথা বলতে এসেছেন, তাই নয় কি? বেশ আগে একটু বিশ্রাম করুন, তারপর আমরা আপনার কথা শুনব।"

লোকটি প্রথমে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে বললে, "আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে পাগল বলে মনে করেছেন?"

জয়ন্ত বললে, "বিপদে পড়লে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আপনার বিপদটা কি, শুনতে পাই না?"

—"ভগবান জানেন আমার বিপদ কি ভয়ানক! বিনা মেঘে এমন বজ্রপাত কল্পনাতে আনা যায় না। আমার মানসম্ভ্রম সব যেতে বসেছে, তার উপরে সংসারেও দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত। ঘরে বাইরে আচমকা দুর্ভাগ্যের আক্রমণে আমি যে সত্য সত্যই পাগল হয়ে যাই নি, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য! কেবল আমি নই মশাই, আমার দুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করতে হবে আর একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তিকেও।"

জয়ন্ত বললে, "আপনার মনের কথা ধীরে-সুস্থে খুলে বলুন। দেখি, আপনার কোন উপায় করতে পারি কিনা!"

—"আমার নাম মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী। মহাজনী ব্যবসায়ে আমার কিছু নাম আছে।"

এ নাম দেশের কে না জানে? বিখ্যাত তাঁর ব্যাঙ্ক—দেশ-বিদেশে তার শাখা। তার চেয়ে বড় প্রাইভেট ব্যাঙ্ক এদেশে আর নেই। মহিমবাবুর মত ধনকুবের এমন কি বিপদে পড়েছেন, যার জন্যে তাঁকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আমাদের কাছে ছুটে আসতে হয়েছে? আমাদের মন ভরে উঠল বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে।

এতক্ষণ পরে যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ হয়ে মহিমবাবু বললেন, "মশাই, আমার মামলা এখন পুলিসের হাতে গিয়েছে। পুলিস কি করবে না করবে জানি না, কিন্তু আপনার উপরে বিশ্বাস আমার অটল। পথের মাঝখানে আমার মোটরও আবার কল বিগড়ে বাদ সাধলে। তাই আমি পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে এসেছি। এইবার শুনুন আমার বিপদের কথা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবুর কাহিনী

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ব্যাঙ্ক কেবল টাকা জমা রাখে না, লেন-দেনের কারবারও চালায়। অনেক বড় বড় পরিবার আমাদের কাছে গহনা, মূল্যবান জিনিসপত্র বা জমি বন্ধক রাখেন, বিনিময়ে আমরাও টাকা ধার দিই।

কাল সকালে এমন এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, যাঁকে দেখে আমি অভাবিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। কেবল বাংলাদেশের নয়, গোটা ভারতবর্ষের লোক তাঁর নাম জানে। এমন কি য়ুরোপ-আমেরিকাতেও তাঁর নাম অপরিচিত নয়। তাঁর অন্য কোন পরিচয় আমি দিতে পারব না, কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, তিনি একজন মহামান্য মহারাজা।

আমার বাড়িতে তাঁর পদার্পণে আমি সম্মানিত হয়েছি—তাঁকে এই রকম কোন অভিনন্দন দিতে উদ্যত হলুম, কিন্তু তার আগেই তিনি একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসলেন। বললেন, "মহিমবাবু, শুনেছি আপনারা টাকা ধার দেন?"

বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি ভালো সিকিউরিটি থাকে।"

—"আজকেই আমার ত্রিশ লক্ষ টাকার নিতান্ত দরকার। আমার কাছে অবশ্য এই টাকার পরিমাণ তুচ্ছ, আমি অনায়াসেই বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এই টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি, কিন্তু আমি কারুর কাছে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই।"

—"কতদিনের জন্যে আপনি টাকা চান?"

—"এক হপ্তার জন্যে। এক সপ্তাহ পরে সমস্ত টাকা নিশ্চয়ই আমি সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেব।"

—"কিন্তু আমি মহাজন। কিসের বিনিময়ে আমি ত্রিশ লক্ষ টাকা দেব, সেটাও আমার জানা দরকার।"

—"নিশ্চয়ই, সেজন্যেও আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।"

মহারাজা সঙ্গে করে এনেছিলেন একটি চৌকো মরক্কো কেশ। তিনি তার ডালা খুলে আমাকে দেখালেন।

ভিতরে নরম মখমলের বিছানায় বসানো আছে এক অপূর্ব ও বিচিত্র রত্নমুকুট। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি এবং তার উপরে আছে মস্ত মস্ত ফিকে-নীল চল্লিশখানা ফিরোজা। তার সোনার কাজও অসাধারণ। এই রত্নমুকুটের কথা আমিও শুনেছি, মহারাজের নামের মত তার খ্যাতিও ফেরে লোকের মুখে মুখে।

মহারাজা বললেন, "আমি যে টাকা চাই, তার চেয়ে মুকুটের দাম দুইগুণ বেশি। এইটেই আমি আপনার কাছে বন্ধক রাখতে চাই।"

মুকুট হাতে করে আমি বসে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।

মহারাজা শুধোলেন, "এর মূল্য সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ আছে?"

—"বিন্দুমাত্র না। আমি ভাবছি—"

—"এমন অমূল্য জিনিস কেন আমি এখানে রেখে যেতে চাই? হ্যাঁ, আমিও রেখে যেতুম না, যদি এক সপ্তাহ পরে এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি না থাকত। এখন আপনার মত কি?"

—"আমি রাজি।"

—"কিন্তু দেখবেন, একথা নিয়ে যেন বাজারে আলোচনা না হয়। খুব সাবধানে মুকুটটি রাখবেন। এটি আমার পৈতৃক সম্পত্তি। এই দুর্লভ জিনিস হারালে আমার রাজ্যে ঢিঢিকার পড়ে যাবে। এতে যে ফিরোজাগুলি আছে, তার মত আর একখানি পাথর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।"

সেইদিনই মহারাজার টাকার ব্যবস্থা করে দিলুম। কিন্তু তারপরে পড়ে গেলুম দারুণ দুশ্চিন্তায়। বার বার মনে হতে লাগল, এত বড় ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে বড় ভালো কাজ করা হল না। এ লেন-দেনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না রাখাই উচিত ছিল। ফিরোজা-রত্নমুকুট যদি হারায়, তাহলে কেবল আমার সমস্ত সুনাম নষ্ট হবে না, সেই সঙ্গে হবে আমার সর্বনাশও।

মুকুটটিকে আমার আপিসে রাখাও যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। ব্যাঙ্কে তো আজকাল আকচার চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, কেউ যদি সন্ধান পায়, আমার উপরেও শনির দৃষ্টি পড়তে কতক্ষণ? মুকুট সঙ্গে নিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে আমার বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এলুম এবং যতক্ষণ না আমার উপরের ঘরের আলমারির ভিতরে সেটি রেখে দিলুম, ততক্ষণে নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না।

জয়ন্তবাবু, এইবারে আগে আমার সংসারের কথা কিছু শুনুন।

আমার চাকর-বাকরেরা শোয় বাড়ির বাইরে। ভিতরে থাকে তিনজন দাসী, তারা পুরোনো লোক, সকল সন্দেহের অতীত। আর একটি নতুন দাসী এসেছে, নাম তার ননীবালা, বয়স অল্প। আজ মাসকয় কাজ করছে। কিন্তু তারও আচরণ ভালো।

আমার নিজের পরিবার বড় নয়। আমি বিপত্নীক। আমার একটিমাত্র ছেলে, নাম সুবিমল। বয়সে যুবক। তার জন্যেই আমার যত দুর্ভাবনা। সে হচ্ছে বিলাসী, চঞ্চলমতি, আমোদপ্রিয়, অমিতব্যয়ী। সে আমার কারবারের উপযোগী নয়, তার হাতে বেশি টাকা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তার স্বভাবের জন্যে

লোকে দায়ী করে আমাকেই। বলে, আমিই আদর দিয়ে দিয়ে তার মাথা খেয়েছি। হয়তো কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। একে সে আমার একমাত্র সন্তান, তার উপরে অল্পবয়সেই মাতৃহারা। তার মুখ ম্রিয়মাণ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

সুবিমলের বন্ধুরা সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিষ্কর্মা ছেলে। সেও তাদের মত আমোদপ্রমোদ করতে আর দুহাতে টাকা ওড়াতে চায়। তাদের এক ক্লাব আছে, সেখানে তাসের জুয়া চলে। ক্লাবে আর ঘোড়দৌড়ের মাঠে সুবিমল যে কত টাকা নষ্ট করেছে তার কোন হিসাব নেই। আমি তাকে মোটা মাসোহারা দিই, তাতেও তার খরচ কুলোয় না। প্রতিমাসেই আমার কাছ থেকে সে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে।

মাঝে মাঝে তার সুবুদ্ধি হয়, ঐ সব বিপদ্জনক বন্ধুর সম্পর্ক ছাড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা তার সফল হয় না আর একজনের জন্যে। নাম তার কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ, আমরা কুমার বাহাদুর বলে ডাকি। সে রাজবংশের ছেলে, সুবিমলের চেয়ে বয়সে বড়। অনেক দেশে বেড়িয়েছে, অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছে, কথা কয় চমৎকার, দেখতেও পরমসুন্দর। সুবিমলের উপরে তার প্রবল প্রভাব, তার কথায় সে ওঠে বসে। কিন্তু তাঁর মতামত স্বাস্থ্যকর নয়, তার ভাবভঙ্গিও আমার ভালো লাগে না। সে আমার বাড়িতে যখন-তখন আসে। আমাদের অমলাও তাকে পছন্দ করে না। অমলার বয়স বেশি না হলেও লোকের চরিত্র বোঝে।

এইবারে অমলার পরিচয় দিই। সে আমার এক পরলোকগত বাল্যবন্ধুর মেয়ে, আমাদেরই স্বজাতি। তার বয়স যখন আট-নয় বৎসর, সেই সময়ে তার পিতা তাকে একান্ত অসহায় অবস্থায় রেখে হঠাৎ মারা পড়েন। আমাকেই অমলার ভার গ্রহণ করতে হয়। সেই থেকেই এ বাড়িতে সে আমার নিজের মেয়ের মত লালিতপালিত হয়েছে। আমার এই অন্ধকার বাড়িকে সে আলো করে আছে সোনালী রোদের মত। একটি শান্ত, নম্র, স্নেহময়ী তরুণী, সে না থাকলে অচল হয়ে পড়ে আমার জীবন।

অমলা আমার সব কথা রাখে, কেবল একটি ছাড়া। সুবিমল দুই দুই বার তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, তাকে সে সত্যসত্যই ভালোবাসে। কিন্তু অমলা রাজি হয় নি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, একমাত্র সেই-ই সুবিমলকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, একমাত্র অমলাই পারে জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে। কিন্তু এখন আমার সকল আশা বিফল হয়েছে—আর তা হবার নয়, হবার নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবুর কাহিনীর জের

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সুবিমল ও অমলার সঙ্গে গল্প করছিলুম। তাদের ফিরোজা-মুকুটের কথা বললুম। পানের ডিবে দিয়ে যাবার জন্যে সেই সময়ে ননীবালা একবার ঘরের ভিতরে এসেছিল।

সুবিমল ও অমলা দুইজনেই মুকুটটা দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে। কিন্তু আমি রাজি হলুম না।

সুবিমল শুধোলে, "মুকুটটা তুমি কোথায় রেখেছ?"

—"আমার শোবার ঘরের আলমারিতে।"

—"ভগবান করুন আজ রাত্রে বাড়িতে যেন চোর না আসে।"

—"আলমারি চাবি-বন্ধ।"

—"যে কোন পুরনো চাবি দিয়ে ও-আলমারি খোলা যায়। ছেলেবেলায় আমি নিজেই খুলেছি।"

—"কিন্তু ঘরের ভিতরে থাকব আমি।"

—"হ্যাঁ, ঘুমিয়ে।"

শয়ন করবার জন্যে উপরে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে এল সুবিমল। মুখ তার গম্ভীর। আমার শোবার ঘরে ঢুকে বললে, "বাবা, আমাকে দু হাজার টাকা দিতে পারবে?"

আমি বললুম, "অসম্ভব। তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছে।"

—"জানি বাবা, এজন্যে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু দু হাজার টাকা আমার নিতান্তই দরকার। টাকা না পেলে ক্লাবে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।"

—"তোমার পক্ষে সেটা হবে শাপে বর।"

—"কিন্তু সবাই বলবে আমি জুয়াচোর। সে অপমান আমি সইতে পারব না। যেমন করে পারি এ ঋণ আমাকে শোধ করতেই হবে।"

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "এই মাসেই আরো দুই বার তুমি আমার কাছ থেকে উপরি টাকা আদায় করেছ। আমার কাছ থেকে আর একটা কানাকড়িরও প্রত্যাশা কোরো না।"

সে আর কিছু বললে না, মাথা হেঁট করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সে রাত্রে আমি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলুম। নীচেকার সব দরজা

ভালো করে বন্ধ কিনা দেখবার জন্যে আবার একতালায় নামলুম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখি, অমলা ওদিককার একটা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

সে বললে, "কাকাবাবু, আপনি কি আজ রাত্রে ননীবালাকে বাইরে যাবার ছুটি দিয়েছিলেন?"

বললুম, "না।"

—"এইমাত্র সে বাইরে থেকে ফিরে এল। এ সব ভালো কথা নয়।"

—"বেশ, কাল সকালে আমি নিজেই তাকে সাবধান করে দেব। বাড়ির সব দরজা বন্ধ আছে তো?"

—"হ্যাঁ কাকাবাবু।"

আমার ঘুম খুব গাঢ় হয় না। বিশেষত কাল রাত্রে আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল বলে ভালো করে ঘুম হয় নি। গভীর রাত্রে হঠাৎ কি একটা শব্দে আমি জেগে উঠলুম। কান পেতে শুনতে লাগলুম। মনে হল, বাড়ির কোথায় কে যেন একটা দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর সভয়ে শুনলুম, পাশের ঘরে কে যেন সন্তর্পণে পা ফেলে চলে বেড়াচ্ছে। এইখানে বলে রাখা উচিত, ঘুমোবার আগে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার অভ্যাস আমার ছিল না।

তখনি খাট থেকে নেমে পড়লুম। দরজার পাল্লা একটু ফাঁক করে দেখলুম, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুবিমল, তার গায়ে গেঞ্জী, পায়ে জুতো নেই, আর হাতে রয়েছে সেই ফিরোজা-মুকুট। সে মুকুটটা সজোরে মুচড়ে বা নুইয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

এক লাফে পাশের ঘরে গিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "সুবিমল! চোর, দুরাত্মা!"

আমার চীৎকার শুনে সে চম্‌কে উঠল, তার হাত থেকে খসে মুকুটটা মাটির উপরে পড়ে গেল সশব্দে। তাড়াতাড়ি আমি সেটাকে তুলে নিয়ে দেখলুম, তিন খণ্ড ফিরোজা অদৃশ্য—তার একটা প্রান্ত ভাঙা।

বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুবিমল। আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "বদমাইস, তুই এটা ভেঙে ফেলেছিস্! আমার মানসম্ভ্রম ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছিস্! কোথায় গেল আর তিনখানা পাথর?"

সে বললে, "চুরি গেছে।"

তাকে ধাক্কা মেরে বললুম, "চুরি করেছিস্ তুই!"

—"না।"

—"তুই কেবল চোর নোস্, মিথ্যাবাদীও! আমি স্বচক্ষে দেখলুম আরো পাথর চুরি করবার জন্যে তুই মুকুটটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিস্!"

সে বললে, "বাবা, তুমি আমাকে যথেষ্ট গালাগাল দিয়েছ। এর পরে এ বিষয় নিয়ে আমি আর কোন কথাই বলব না। কাল সকালেই আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, নিজের পায়ে ভর্ দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব।"

—"হ্যাঁ, কাল সকালে তোকে এ বাড়ি থেকে যেতে হবে বটে, কিন্তু যেতে হবে পুলিসের সঙ্গে।"

এইবারে ক্রোধারক্ত মুখে সে বললে, "উত্তম। তবে তাই হোক।"

ইতিমধ্যে আমার চীৎকার শুনে গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে। সর্বপ্রথমে সেখানে ছুটে এল অমলা। সুবিমলের মুখ ও আমার হাতের মুকুট দেখে তার আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না, একটা আর্তনাদ করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সকালে পুলিস এল। সুবিমল বললে, "বাবা, তাহলে তুমি আমাকেই চোর সাব্যস্ত করলে?

—"তা ছাড়া আর উপায় নেই। আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না।"

—"তাহলে অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে আমাকে একবার বাড়ির বাইরে যেতে দাও।"

—"বুঝেছি, তুমি সরে পড়তে চাও? তা হয় না। কেবল এক শর্তে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি। পাথর তিন খানা যদি ফিরিয়ে দাও।"

সে বলতে বলতে চলে গেল, "তোমার ক্ষমা যে চায়, তাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমি ক্ষমাপ্রার্থী নই।"

সুবিমলকে আমি পুলিসের হাতে সমর্পণ করেছি। পুলিস কিন্তু তার কাপড়-চোপড় খুঁজেও এবং সারা বাড়ি খানাতল্লাস করেও পাথর তিনখানা উদ্ধার করতে পারে নি। সুবিমলও স্বীকার করে নি কোন কথা, একেবারেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

এই আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। ভগবান, আমি এখন কি করব? এক রাত্রেই আমি আমার সম্মান, আমার বন্ধকী রত্ন, আমার সন্তানকে হারালুম। আমি এখন কি করব?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমলা দেবী

জয়ন্ত খানিকক্ষণ বসে রইল স্তব্ধভাবে। তারপর শুধোলে, "মহিমবাবু, আপনার বাড়িতে কি বেশি লোকের আনাগোনা আছে?"

—"মাঝে মাঝে দু-একজন আত্মীয়-কুটুম্ব খবরাখবর নিতে আসেন। বাইরের লোকের মধ্যে নিয়মিত আনাগোনা করেন কুমার বাহাদুর।"

—"আপনি কি সামাজিকতা রক্ষার জন্যে নানা জায়গায় আসা-যাওয়া করেন?"

—"সুবিমল করে। আমি আর অমলা বাড়িতেই থাকি। সামাজিকতার জন্যে আমাদের মাথাব্যথা নেই।"

—"এ রকম তরুণীর কথা কম শোনা যায়। আপনার কথা শুনে বোঝা যায়, মুকুটের ব্যাপারের জন্যে অমলা দেবী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার চেয়েও।"

—"সুবিমলবাবু যে অপরাধী সে বিষয়ে আপনাদের কোন সন্দেহ নেই?"

—"কি করে থাকবে? আমি যে নিজের চোখে দেখছি!"

—"যে শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, সে সম্বন্ধে পুলিসের মত কি?"

—"তাদের মতে সুবিমল ঘর থেকে বেরিয়ে দুম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।"

—"বাজে কথা। চোর কখনো পাড়া জাগিয়ে চুরি করে না। শব্দ হয়েছে অন্য কারণে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

—"কারণটা কি?"

—"আমি তা জানি না। মহিমবাবু, মামলাটা আপনি সহজ মনে করছেন, কিন্তু আমার মতে এটা হচ্ছে জটিল মামলা। আপনি অনুমান করেছেন, আপনার ছেলে নিজের ঘরের দরজা সশব্দে ভেজিয়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন। তাহলে তিনি মুকুটটা কখন চুরি করলেন? আর এই অল্প সময়ের মধ্যে পাথর তিনখানা লুকিয়েই বা রাখলেন কোথায়? না মহিমবাবু, এই ঘটনার মধ্যে আছে অজানা কোন রহস্য।"

—"কি রহস্য?"

—"সেইটেই এখন আবিষ্কার করতে হবে। আপাতত আপনার ঠিকানা রেখে আপনি বাড়ি ফিরে যান। একটু পরেই আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হব।"

★ ★ ★

বড় রাস্তা থেকে একটু তফাতে মহিমবাবুর মস্ত বাড়ি। সামনে খানিকটা খোলা জমি। ডানদিকে একটি ছোট কাঁচা রাস্তা। বাড়ির দুটো ফটক—একটি বড়, একটি ছোট। বড় ফটকটি বাড়ির সামনের দিকে এবং দ্বিতীয়টিকে বলা চলে খিড়কির ফটক, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে ব্যবহার করতে হয় কাঁচা রাস্তাটি।

বড় ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন স্বয়ং মহিমবাবু।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, তুমি খানিকক্ষণ মহিমবাবুর সঙ্গে আলাপ কর, আমি আগে বাড়ির চারিদিকটা ঘুরে দেখে আসি।"

মহিমবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানায়। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন, কথাবার্তা বড় একটা হল না।

মিনিট কয়েক পরেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন একটি তরুণী। সুদর্শনা, সুগঠনা, কিন্তু তাঁর চোখের ভাব আর্ত, মুখ একেবারে পাণ্ডুর। দেহখানি দেখলেও বোধ হয়, দুঃখের ভার সইতে না পেরে এখনি তা ভেঙে পড়বে। আন্দাজে বুঝলুম, ইনিই হচ্ছেন অমলা দেবী।

অমলা আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না, একেবারে মহিমবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর একখানি হাত ধরে বললেন, "কাকাবাবু, সুবিমলদাকে তুমি ছেড়ে দিতে বলেছ তো?"

মহিমবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না মা, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখলে চলবে না।"

—"না কাকাবাবু। আমি বলছি তিনি নির্দোষ।"

—"তাহলে অপরাধী কে?"

—"আমি জানি না। কিন্তু সুবিমলদা পুলিসের হাতে, এ কথা যে কল্পনা করা যায় না কাকাবাবু!"

—"সুবিমলকে তুমি ভালোবাসো, তাই আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না। কেবল পুলিস নয়, আমি আর এক ভদ্রলোককেও মামলাটা তদারক করবার জন্যে নিয়ে এসেছি।"

আমার দিকে ফিরে অমলা শুধোলেন, "এই ভদ্রলোক?"

—"না, ওঁর বন্ধু। আমি তাঁকে কাঁচা রাস্তার ভিতরে ঢুকতে দেখেছি।

ভুরু কুঁচকে অমলা বললেন, "কাঁচা রাস্তায়? সেখানে পাবার কি আছে?...... ঐ যে, আর এক ভদ্রলোক আসছেন। কাকাবাবু, উনিই কি তিনি?"

—"হ্যাঁ মা।"

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে পাপোঁছের উপরে পা ঘষে জুতোর কাদা তুলে ফেলতে লাগল।

অমলা তার কাছে গিয়ে বললেন, "আমার সুবিমলদা নিশ্চয়ই এ কাজ করেন নি, কি বলেন?"

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "আপনার কথা সত্য হলে সুখী হব। আপনিই বুঝি অমলা দেবী? আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করব?"

—"নিশ্চয়ই!"

—"গেল রাত্রে আপনি কোন শব্দ শোনেন নি?"

—"কিছু না। কাকাবাবুর গলা শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম।'

—"কাল রাত্রে বাড়ির সব দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"আজ সকালেও কোন দরজা খোলা ছিল না?"

—"না।"

—"আপনাদের নতুন দাসী রাত্রে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ। কাকাবাবু আমাদের কাছে যখন মুকুটের কথা বলছিলেন, তখন সে ঘরের ভিতরে পানের ডিবে দিতে এসেছিল।

—"তাহলে আপনার সন্দেহ হচ্ছে, ননীবালা মুকুটের খবর বাইরের আর কারুকে দিতে গিয়েছিল?"

মহিমবাবু অধীর স্বরে বলে উঠলেন, "এ সব প্রশ্নের মানে হয় না। আমি নিজে দেখেছি মুকুট ছিল সুবিমলের হাতে।"

—"একটু অপেক্ষা করুন মহিমবাবু। ও সব কথা পরে হবে। অমলা দেবী, আপনি ননীবালাকে খিড়কির ফটক দিয়ে ফিরে আসতে দেখেছেন?"

—"হ্যাঁ। ফটকের বাইরে ছায়ার মত একটা লোককেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।"

—"সে কে হতে পারে?"

—"এ পাড়ার মুদীর ছেলে। নাম কাঙালীচরণ। ননীবালাকে বিয়ে করতে চায়।"

—"সে বোধহয় ফটকের বাঁ পাশে দাঁড়িয়েছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"তার একটা পা কাঠের?"

অমলার মুখে ফুটে উঠল ভয় ও বিস্ময়। সে বললে, "কি আশ্চর্য, আপনি কি মায়াবী? এ কথা কেমন করে জানলেন?"

অমলাকে কোন উত্তর না দিয়ে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "মহিমবাবু, এইবারে আমি আপনার শোবার ঘরটা দেখতে চাই। না, না, আর একটা কথা। এই বৈঠকখানায় দেখছি তিনটে দরজা রয়েছে। যে দরজা দিয়ে আমি ঢুকলুম, ওটা দিয়ে বাইরের লোক এখানে আসে। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?"

—"বাড়ির ভিতর-মহলে।"

—"আর ঐ দরজাটা?"

—"ওটা দিয়ে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে খিড়কির ফটকের দিকে যাওয়া যায়।"

জয়ন্ত সেইদিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে আতশী কাঁচ বার করে দরজার চৌকাঠের তলাটা অল্পক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, "এইবার উপরে চলুন।"

মহিমবাবুর শয়নগৃহটি মাঝারি। একখানি খাট, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি আলমারি ও খানদুই চেয়ার ছাড়া সেখানে আর কোন আসবাব নেই।

জয়ন্ত বললে, "মুকুট আছে ঐ আলমারিতে?"

—"হ্যাঁ।"

মহিমবাবুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে জয়ন্ত বললে, "খোলবার সময়ে কোন শব্দ হয় না। এইজন্যেই আপনার ঘুম ভাঙে নি।"

জয়ন্ত মরক্কো কেসের ভিতর থেকে মুকুটটি বার করে বিছানার উপরে স্থাপন করলে। সে এক অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য, তার দিকে তাকালেও চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। কেবল অপূর্ব ফিরোজাগুলিই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে না, যে স্বর্ণকার এই মুকুটটি গড়েছে নিশ্চয়ই সে একজন উঁচুদরের শিল্পী।

জয়ন্ত বললে, "মহিমবাবু, মুকুটের এই প্রান্তটা একটুখানি ভেঙে গেছে। আপনি আরো একটু ভেঙে ফেলতে পারেন?"

আতঙ্কে শিউরে মহিমবাবু বলে উঠলেন, "সর্বনাশ, বলেন কি মশাই? সে আমি প্রাণ থাকতেও পারব না।"

—"বেশ, আপনি না পারেন, আমি পারি কিনা দেখা যাক্" বলেই সে মুকুটটা তুলে নিয়ে দুই হাত দিয়ে তার আর একটা প্রান্ত ভাঙবার চেষ্টা করলে। তারপর বললে, "লোকে বলে আমি নাকি মহা বলবান ব্যক্তি। মুকুটের এই প্রান্তটা আমি একটু দুমড়োতে পেরেছি, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করলে ভেঙে ফেলতেও পারি। কিন্তু কোন একজন সাধারণ মানুষের সে ক্ষমতা হবে না। আর এক কথা। মুকুটটা এইভাবে এখনি যদি ভেঙে ফেলা যায়, তাহলে ঠিক পিস্তল ছোঁড়ার মত একটা আওয়াজ হবে। মহিমবাবু, পাশের ঘরে আপনি সুবিমলবাবুকে মুকুট নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে দেখেছেন, অথচ এ-রকম কোন আওয়াজ শোনেন নি, এ বড় আশ্চর্য কথা!"

মহিমবাবু বললেন, "কি জানি মশাই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"আপনারা এখানে বসুন। এখন আমি একলা আর একবার বাড়ির বাইরে যেতে চাই।" এই বলে জয়ন্ত প্রস্থান করলে।

এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বললে, "মহিমবাবু, এখানে যা যা দেখবার সব আমি দেখে নিয়েছি। এইবারে বাড়ি ফিরতে চাই।"

—"কিন্তু আমার রত্ন তিনখানা কোথায়?"

—"তা আমি বলতে পারব না।"

হাত কচলাতে কচলাতে মহিমবাবু বললেন, "বেশ বুঝতে পারছি, আমার ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগবে না।"

অমলা কাকুতি ভরা কণ্ঠে বললে, "আমার সুবিমলদাকে রক্ষা করুন।"

—"রক্ষাকর্তা ভগবান, আমি নই। মহিমবাবু, আমি পেশাদার গোয়েন্দা নই, কাজ করি সখের খাতিরে। কিন্তু আমি পারিশ্রমিক নেব না বটে, তবে চোরাই পাথর তিনখানা ফিরে পেতে হলে আপনাকে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে।"

মহিমবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ! তাহলে সেগুলো ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে? বলুন, বলুন, আমাকে কত টাকা দিতে হবে?"

—"আন্দাজে তাও আজ বলতে পারছি না। কাল সকালে দশটার সময়ে দয়া করে একবার আমার বাড়িতে যাবেন। আশা করি সেই সময়ে আপনাকে আলোকিত করতে পারব। এস মাণিক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবঘুরে

বেশ বুঝলুম, জয়ন্ত একটা কিছু সাব্যস্ত করে ফেলেছে। আমি কিন্তু এখনো অন্ধের মত গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি। বাড়িতে ফেরবার মুখে জয়ন্তকে বারকয়েক জাগ্রত করবার চেষ্টা করে দেখলুম, যদি সে পথ নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সে শিলামূর্তির মত মৌন।

বাড়িতে এসে জয়ন্ত নিজের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। আধ ঘণ্টা পরে সে যখন আবার বেরিয়ে এল তখন একেবারে বদলে গেছে তার চেহারা। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, রুক্ষ; বাঁ গালে একটা আব; কানে গোঁজা একটা বিড়ি; গায়ে আধময়লা মেরজাই; পরনে রঙীন ছিটের লুঙ্গি; পায়ে বাটা কোম্পানির ছেঁড়া ও কাদামাখা রবারের জুতো। পয়লা নম্বরের ভবঘুরের মূর্তি! অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "এই রকম লোকের মুখে কি রকম গান

মানায় বল তো? এ গানটা কি চলবে?" বলেই গুন্‌গুন্‌ করে প্রথম দুই লাইন গাইলে—

"ও আমার, কমলালেবু প্রাণ!
সিলেটেতে জন্ম তোমার,
বেলেঘাটায় স্থান।"

শুধোলুম, "এই বেশে কোথায় যাচ্ছ হে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"ভবঘুরেরা যেখানে যায়। রাস্তায়। মধু, ও মধুসূদন!" ডাক শুনে মধুর আবির্ভাব।

—"সারাদিনটাই হয়তো পথে পথে টো টো করে ঘুরে মরতে হবে, কিন্তু উদরদেশ তো ততক্ষণ শূন্য থাকতে রাজি হবে না। চটপট খান-কয় শসার আর চিকেন স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে কাগজে মুড়ে দিয়ে যাও।"

জয়ন্ত বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল বেলা পাঁচটার সময়ে —হাতে তার ঝুলছে দড়ি-দিয়ে-বাঁধা একজোড়া পুরানো লপেটা জুতো। মুখ তার হাসিখুসি।

আমি তখন চা পান করতে বসেছি। জয়ন্তও আমার সঙ্গে যোগ দিলে। বললে, "আবার বেরিয়ে পড়বার জন্যে এখানে এসেছি। এক পেয়ালা চা খেয়েই উঠব।"

—"আবার যাবে কোথায়?"

—"বালীগঞ্জের এখানে সেখানে। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। ফিরতে রাত হতে পারে।"

—"খবর আশাপ্রদ তো?"

—"মন্দ নয়, মন্দ নয়। অভিযোগ করবার কিছুই নেই। দুপুরে মহিমবাবুদের পাড়াতেও গিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকি নি। ভারি মনের মত মামলা হে, কাজ করে খুশি আছি। কিন্তু যাক্‌, এখন আমার গালগল্প করবার সময় নেই। এখনি আবার সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রবেশ করবার জন্যে বেশ পরিবর্তন করতে হবে।"

জয়ন্তের হাসিমুখ, নৃত্যশীল চোখ ও স্ফূর্তিভরা হাবভাব দেখে বেশ বোঝা গেল, মামলাটার সুরাহা হতে আর দেরি নেই। সে স্নান করে জামাকাপড় বদলে আবার বেরিয়ে গেল ভদ্রবেশে। তারপর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন তার কোন সাড়া পেলুম না, তখন আমি শয়ন করতে গেলুম। এমনি তার স্বভাব, কখনো কখনো সে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকে, সুতরাং তার জন্যে আমার কোনই দুর্ভাবনা হল না।

কত রাত্রে সে ফিরে এসেছে জানি না, কিন্তু সকালবেলায় চায়ের আসরে এসে দেখি, টেবিলের সামনে পেয়ালা হাতে করে বসে রয়েছে জয়ন্ত, একেবারে ফিটফাট, তাজা চেহারা।

জয়ন্ত বললে, "এইবারে খবরের কাগজ পড়ে শোনাও।"

কাগজ পড়তে পড়তে বাজল বেলা দশটা।

জয়ন্ত বললে, "মহিমবাবুর আসবার সময় হয়েছে।"

বললুম, "সদর দরজার সামনে একখানা মোটর দাঁড়ানোর শব্দ হল।"

অবিলম্বে মহিমবাবুর প্রবেশ। এক রাত্রেই তাঁর মূর্তির পরিবর্তন দেখে আমি চমকিত হলুম। তাঁর মাথার চুলে যেন আরও বেশি পাক ধরেছে; চোখ, গাল বসা বসা, দেহ একেবারে যেন ভেঙে পড়তে চায়। তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলুম, অতি পরিশ্রান্তের মত তিনি ধপাস্ করে বসে পড়লেন।

থেমে থেমে ভগ্নস্বরে তিনি বললেন, "কি পাপ করেছি যে এত দায়ে ঠেকছি? দুদিন আগেও আমার সুখের সীমা ছিল না, আর আজ আমি দুনিয়ায় একা, আমার সম্মান পর্যন্ত নেই। এক দুর্ভাগ্যের পর আসছে আর এক দুর্ভাগ্য। জানেন জয়ন্তবাবু, অমলা আমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে!"

—"চলে গিয়েছে?"

—"হ্যাঁ। আজ সকালে উঠে দেখি, ঘর তার খালি, বিছানাতেও সে শোয় নি। টেবিলের উপরে রয়েছে তার হাতে লেখা একখানা চিঠি। কাল রাত্রে তাকে বলেছিলুম, সে যদি আমার ছেলেকে বিবাহ করত, তাহলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। এ কথা রাগ করে বলি নি, মনের দুঃখে বলেছিলুম। হয়তো বলা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু কথাটা তার প্রাণে গিয়ে বেজেছে। কারণ চিঠিতে সে লিখেছে : 'পূজনীয় কাকাবাবু, আমার মনে হচ্ছে, এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী, আপনাদের কথা শুনলে কারুকে আজ দুর্বহ দুর্ভাগ্যের ভার সামলাতে হত না। এর পরেও কোন্ মুখ নিয়ে আর আপনাদের আশ্রয়ে বাস করি? তাই চিরদিনের জন্যে আমি বিদায় গ্রহণ করলুম। আমার ভবিষ্যতের জন্যে ভাববেন না, কারণ সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আর এক নিবেদন। আমার জন্যে খোঁজাখুঁজি করবেন না, কেন না সেটা হবে ব্যর্থ। কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমাকে একান্ত আপনারই বলে জানবেন। ইতি প্রণতা অমলা।" এ চিঠির অর্থ কি জয়ন্তবাবু? অমলা কি আত্মহত্য করতে চায়?"

—"না, না মহিমবাবু, অমলাদেবী মোটেই আত্মহত্যা করবেন না। সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, আপনার বিপদের মেঘ এইবারে কেটে যাবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অসম্ভব কথা

জয়ন্তের কথা শুনেই মহিমবাবু চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, "বিপদের মেঘ কেটে যাবে? আপনি নিশ্চয়ই সব জানতে পেরেছেন? কোথায় মুকুটের সেই ভাঙা অংশ?"

—"তার জন্যে আপনি কত টাকা ব্যয় করতে পারেন?"

—"আগে মান, তারপর টাকা! তার বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারি।"

—"অতটা বেশি অগ্রসর হবার দরকার নেই মহিমবাবু। প্রত্যেকখানা পাথরের জন্য দশ হাজার টাকা দিলেই চলবে।"

—"দশ হাজার কেন, আমি বিশ হাজার করে টাকা দিতে প্রস্তুত।"

—"বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। আপনার কাছে কলম আর চেক বই আছে? বেশ, তিনখানা পাথরের জন্যে দিন ত্রিশ হাজার টাকা।"

হতভম্বের মত মহিমবাবু কথামত কাজ করলেন। জয়ন্ত দেরাজ খুলে বার করলে একখানা তিনকোণা সোনার উপরে বসানো তিনখানি ফিরোজা।

বিপুল উল্লাসে চীৎকার করে দুই হাতে জিনিসটাকে চেপে ধরে মহিমবাবু বলে উঠলেন, "হারানিধি আপনি খুঁজে পেয়েছেন! আমি বেঁচে গেলুম! আমি বেঁচে গেলুম!"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "আপনার আরো কিছু কর্তব্য আছে?"

—"আরো কিছু কর্তব্য? বুঝেছি, আপনি পুরস্কার চান।" পকেট থেকে চেক বই ও কলম বার করে মহিমবাবু বললেন, "বলুন কত হাজার টাকা চান? আপনি যা চান তাই দেব!"

—"এক টাকাও চাই না।"

—"তবে কি কর্তব্যের কথা বলছেন?"

—"আপনার কর্তব্য হচ্ছে, সুবিমলবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।"

—"আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব! কেন?"

—"সুবিমলবাবুর মত পুত্র যে কোন পিতার মুখোজ্জ্বল করতে পারে।"

—"আপনি কি বলছেন!"

—"ঠিক কথাই বলছি।"

—"তবে কি—তবে কি পাথর তিনখানা সে চুরি করে নি?"

—"না, তিনি নিরপরাধ।"

—"বলেন কি! এ বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?"

—"একেবারে নিশ্চিত।"

—"তাহালে এখনি আমি থানায় গিয়ে এ সুসংবাদটা তাকে দিয়ে আসছি।"

—"এ সংবাদ তাঁর জানতে বাকি নেই। কাল আমি নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি যখন কিছুতেই আসল ব্যাপার ভাঙতে রাজি হলেন না, তখন আমি যা অনুমান করেছিলুম, সেটা তাঁকে খুলে বললুম। তারপর তাঁকে স্বীকার করতে হল যে, আমার অনুমানই সত্য।"

—"সবই যে অদ্ভুত রহস্য বলে মনে হচ্ছে! ভগবানের দোহাই, সব কথা খুলে বলুন!"

—"হ্যাঁ, বলব বৈকি! পায়ে পায়ে কেমন করে আমি অগ্রসর হয়েছি, তাও আপনাকে বলব। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা শুনুন। এই চুরির সঙ্গে অমলা দেবী আর কুমার বাহাদুরের যোগাযোগ আছে।"

—"অমন কথা মুখেও আনবেন না। আমার অমলা? অসম্ভব!"

—"দুঃখের বিষয়, অসম্ভবই হয়েছে সম্ভবপর। এই কুমার বাহাদুর হচ্ছে এক নিঃস্ব বড় ঘরের ছেলে, সর্বহারা জুয়াড়ী, তার না আছে হৃদয়, না আছে বিবেকবুদ্ধি। তার চরিত্র যে কতখানি জঘন্য, আপনি বা সুবিমলবাবু কেউই তা জানেন না। অমলা দেবী তো সংসারে অনভিজ্ঞ তরুণী, তিনি তার স্বরূপ বুঝবেন কেমন করে? তিনি তার সুন্দর মুখ দেখে ভুলেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন তার প্রত্যেকটি মিথ্যাকথা। সে নিশ্চয়ই তাঁকে বিবাহ করবে বলে অঙ্গীকার করেছিল। দুজনের মধ্যে দেখাশোনা হত প্রায় প্রত্যহই।"

মহিমবাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "এ সব কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না, পারব না, পারবা না!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের কথা

শুনুন মহিমবাবু। আমি মামলাটাকে যে ভাবে খাড়া করেছি তার মধ্যে যে ভুলচুক কিছু নেই, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। খানিক খানিক অস্পষ্টতা থাকবেই। অমলা দেবীকে পেলে সে অস্পষ্টতা দূর করা যেত, কিন্তু তিনি এখন যবনিকার অন্তরালে।

ঘটনার দিন রাত্রে আপনি নীচেয় নেমে দেখেছিলেন, খিড়কির ফটকের

দিকে যাবার জন্যে বৈঠকখানায় যে দরজাটা আছে, অমলা সেটা বন্ধ করে দিচ্ছেন। আসলে বাইরে সেখানে ছিল কুমার বাহাদুর, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা কইছিলেন অমলা। তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিশ্চয়ই তাকে বলেছিলেন ফিরোজা-মুকুটের কথা। শুনেই কুমার বাহাদুরের মনে জাগ্রত হয় দুর্দান্ত লোভ। সে ঠিক কি প্রস্তাব করে, বলতে পারব না। খুব সম্ভব মুকুটটা সে খালি একবার দেখতে চেয়েছিল। অমলা যে আপনাকে ভালোবাসেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথমটা নিশ্চয়ই তিনি এই বিপদ্জনক প্রস্তাবে রাজি হন নি। কিন্তু কুমার বাহাদুর শেষটা তাঁকে বুঝিয়ে দেয় যে, মুকুটটা কেবল একবার চোখে দেখলে কারুর কোন ক্ষতিই হবে না। সে মুকুটটা দেখবার জন্যে গভীর রাত্রে আবার সেখানে আসবে। জেদাজেদিতে পড়ে অমলাকে শেষটা সম্মতি দিতে হয়।

ঠিক সেই সময়ে হয় আপনার আবির্ভাব। অমলা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দেন। আপনার কাছে ননীবালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সে অভিযোগ মিথ্যা নয়।

টাকার জন্যে আপনার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করে সে রাত্রে সুবিমলবাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তার উপরে ক্লাবের দেনার জন্যেও তাঁর মনে ছিল দুশ্চিন্তা। তাঁর ঘুম হয় নি, মধ্য রাত্রেও জেগে ছিলেন। হঠাৎ ঘরের বাইরে শুনতে পান কার অস্পষ্ট পায়ের শব্দ। কৌতূহলী হয়ে উঠে দরজা একটু ফাঁক করে সবিস্ময়ে দেখতে পান, অমলা চোরের মত সন্তর্পণে আপনার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রাত্রেও সেখানে আলো জ্বালা থাকে। ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে সুবিমলবাবু নিজের ঘরের অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং একটু পরেই স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, আপনার ঘর থেকে অমলা আবার বেরিয়ে আসছেন—হাতে তাঁর ফিরোজা-মুকুট!

অমলা নীচেয় নেমে গেলেন, পিছনে পিছনে নামলেন আতঙ্কগ্রস্ত সুবিমল-বাবুও। বৈঠকখানার দরজার কাছে পর্দার আড়াল থেকে দেখা গেল, খিড়কির ফটকের দিকে যাবার দরজাটা খুলে অমলা মুকুটটা সমর্পণ করলেন বাইরের কোন লোকের হাতে। সে মুকুটটা হস্তগত করেই সরে পড়ল। এর জন্যে অমলা প্রস্তুত ছিলেন না, ভয় পেয়ে উপরে পালিয়ে এলেন।

অমলাকে ভালোবাসেন সুবিমলবাবু। তাকে বিবাহ করতে চান। পাছে অমলার নামে কলঙ্ক রটে, সেই ভয়ে এতক্ষণ তিনি কোন গোলমাল করতে পারেন নি। কিন্তু এখন তাঁর হুঁশ হল, মুকুটটা যদি খোয়া যায়, তাহলে তাঁর পিতার কত বড় বিপদের সম্ভাবনা। তিনি তখনি পাগলের মত ছুটে ওদিককার দরজা খুলে ফেলে

বাইরে গিয়ে পড়লেন। তারপর খিড়কির ফটক থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলেন।

চোর তখনও বেশি দূরে যেতে পারে নি। গ্যাসের আলোতে সুবিমলবাবু তাকে চিনতে পারলেন। তারপর মুকুট নিয়ে টানা-হ্যাচড়া আরম্ভ হল—একদিকে সুবিমলবাবু আর একদিকে কুমার বাহাদুর। টানাটানি করতে করতে সুবিমলবাবু প্রচণ্ড এক ঘুসি মারেন কুমার বাহাদুরকে—তার চোখের উপরটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। মুকুটটা অত্যন্ত কঠিন, একজনের সাধারণ শক্তি তাকে ভাঙতে পারে না, কিন্তু দুইজনের সম্মিলিত শক্তিতে হঠাৎ সেটা ভেঙে গেল।

মুকুটটা নিয়ে ফিরে এলেন সুবিমলবাবু। সে সময়ে তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন, ওদিককার দরজাটা জোরে বন্ধ করে দেন আর সেই শব্দে আপনার নিদ্রাভঙ্গ হয়। শোবার ঘরের কাছে এসে সুবিমলবাবু মুকুটটা দুমড়ে গেছে দেখে যখন আবার সেটা টেনে সোজা করবার চেষ্টায় ছিলেন, সেই সময়ে হয় আপনার আবির্ভাব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নের ইতিহাস

মহিমবাবু বিস্ফারিত নেত্রে বললে, "এও কি সম্ভব?"

জয়ন্ত বললে, "যখন তাঁর প্রাপ্য সাধুবাদ, তখন সুবিমলবাবুকে দিলেন আপনি গালাগালি আর চোর বদনাম। তাঁর রাগ আর অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। তার উপরে তিনি যাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সেই অমলাকে না জড়িয়ে তাঁর পক্ষে কোন কথা বলা ছিল অসম্ভব। এই জন্যেই তিনি করেছিলেন মৌনাবলম্বন। যেমন করে হোক অমলাকে তিনি কুৎসিত কলঙ্কের কালিমা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন।"

মহিমবাবু বললেন, "ও, বুঝেছি। তার সব কথা ফাঁস হয়ে গেছে ভেবে মুকুট দেখেই অমলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কি নির্বোধ আমি! ধরা পড়বার পর সুবিমল পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে যেতে চেয়েছিল কেন, তাও বুঝতে পারছি। তিনখানা পাথর পাওয়া যাচ্ছে না শুনে সে চেয়েছিল সেগুলো খুঁজে আনতে। তখন তাকে অবিশ্বাস করে আমি কি অবিচারই করেছি!"

জয়ন্ত বলতে লাগল, "এত সহজে মামলাটার রহস্য ভেদ করতে পারলুম কেন জানেন? মেঘ আর বৃষ্টির জন্যে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায়

পাতা কাদার আস্তরণ। তারপর পরশু থেকে বৃষ্টি থেমেছে বটে কিন্তু কাল পর্যন্ত আকাশ ছিল মেঘে আচ্ছন্ন। রোদ ওঠে নি বলে রাস্তার কাদা শুকোয় নি। মানুষের পদচিহ্নগুলো আপনার বাড়ির পাশের কাঁচা রাস্তার উপরে লিখে রেখেছিল বিচিত্র ইতিহাস।

কাল সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমি সর্বাগ্রে সেই ইতিহাস পাঠ করবার চেষ্টা করেছি। কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে বেশি লোকচলাচল নেই। বৃষ্টির ধারায় আগেকার সব পদচিহ্নই ধুয়েমুছে গিয়েছে। সুতরাং ঘটনার রাত্রে ওখানে কারা চলাফেরা করেছিল, সেটা জানতে কিছুই বেগ পেতে হল না।

প্রথমেই দেখলুম, খিড়কীর ফটকের সামনে রয়েছে ছোট ছোট খালি পায়ের দাগ, কোন বালক বা নারী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনেই পেলুম একখানা পা ও একটা গোল দাগ—কোন একঠেঙো লোক কাঠের পা পরে সেখানে এসেছিল। পরে জানা গেল, আপনাদের দাসী ননীবালা তার একঠেঙো হবু-বরের সঙ্গে সেইখানে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ করেছিল।

তারপর দেখলুম, কোন মানুষের দুই সার সৌখীন জুতোর দাগ বাহির থেকে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পেলুম আরো দুই সার খালি পায়ের চিহ্ন। দাগের গভীরতা ও ব্যবধান দেখে বুঝতে দেরি লাগল না যে কেউ খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে ছুটতে ছুটতেই। মনটা খুশি হয়ে উঠল, কারণ আগেই আপনার মুখে শুনেছিলুম যে, সুবিমলবাবুকে আপনি নগ্নপদে মুকুট নিয়ে টানাটানি করতে দেখেছিলেন।

এক জায়গায় দেখলুম, কাদার উপরে বিষম ধস্তাধস্তির চিহ্ন—সেখানেও খালি পায়ের আর সৌখীন জুতোর দাগ। সেখানে যে রক্তপাত হয়েছে, তাও বোঝা গেল। তারপর জুতোর দাগ চলে গিয়েছে গলির বাইরের দিকে, আর খালি পা ফিরে এসেছে বাড়ির দিকে। ধরে নিলুম, সে বাড়িরই লোক।

আপনার মনে আছে, বৈঠকখানায় ঢুকে খিড়কির ফটকের দিকে যাবার দরজার তলাটা আমি পরীক্ষা করেছিলুম? একজন লোক যে কাদামাখা খালি পা নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে, সেখানে ছিল তার স্পষ্ট চিহ্ন।

তখন আসল ব্যাপারটা কতক কতক আন্দাজ করতে পারলুম। কোন সৌখীন জুতো পরা লোক মুকুট হস্তগত করে প্রস্থান করছিল। সুবিমলবাবু দেখতে পেয়ে তার অনুসরণ করেন, তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে আবার বাড়ির ভিতরে ফিরে আসেন।

চোরকে নিশ্চয় বাড়ির কোন লোক সাহায্য করেছিল। বাড়ির ভিতরে ছিল কেবল দাসীরা আর অমলা। কিন্তু দাসীদের মুখ চেয়ে সুবিমলবাবু নিশ্চয়ই

অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেবেন না। বাকি রইলেন কেবল অমলা। সুবিমলবাবু তাঁকে ভালোবাসেন। তাঁর মানরক্ষার জন্যে তিনি সব করতে পারেন। অতএব, প্রথমে অসম্ভব মনে হলেও আমি সন্দেহ করলুম অমলাকেই। তার উপরে রাত্রে আপনি তাঁকে বৈঠকখানায় বাগানে যাবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন এবং মুকুট দেখেই তিনি ভয়ে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

এখন সৌখীন জুতো পরা লোকটা কে হতে পারে? এ বাড়িতে কুমার বাহাদুর হামেশাই আনাগোনা করে। তার নাম আগেই শুনেছিলুম, সে হচ্ছে অত্যন্ত কুবিখ্যাত ব্যক্তি। ভবঘুরে সেজে তার চাকরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললুম। শুনলুম তার মনিব আগের রাতে আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছে। নিজের ছেঁড়া জুতো দেখিয়ে, আট আনা পয়সা দাম দিয়ে তার কাছ থেকে কুমার বাহাদুরের একজোড়া পুরনো ফেলে-দেওয়া লপেটা কিনে আনলুম। তারপর আপনার বাড়ির পাশের কাঁচা রাস্তায় এসে সেই সৌখীন জুতোর দাগের সঙ্গে লপেটা জোড়া মিলিয়ে দেখলুম। অবিকল মিলে গেল। আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না।

তারপর পোশাক বদলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলুম। আমি জানি, এই কেলেঙ্কারি আপনি চাপা দিতে চান, তাই পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করলুম না।

সে প্রথমটা সবই উড়িয়ে দিতে চাইলে। তারপর আমি যখন তার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ ছিল, একে একে সেগুলো উল্লেখ করলুম, সে মারমুখো হয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমিও বার করলুম আমার রিভলভার। তখন সে কতকটা শান্ত হল।

আমি বললুম, "পাথর তিনখানা ফিরিয়ে দাও। আমরা ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

সে বললে, "হায় হায়, আমি যে মোটে পাঁচ হাজার টাকায় তিনখানা পাথরই বেচে ফেলেছি!"

তারপর তার কাছ থেকে সেই চোরাই মালের কারবারীর ঠিকানা আদায় করলুম। তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আপনার রত্ন উদ্ধার করে এনেছি।

মহিমবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ জয়ন্তবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। আপনার ক্ষমতা যাদুকরের মত।"

—ঃ শেষ ঃ—

জয়ন্তের অ্যাডভেঞ্চার

'বন্-সাই-রহস্য
তথাকথিত
চুম্বক এবং লৌহ

বরাবরই জানি, চুম্বক লোহাকে না টেনে ছাড়ে না। আগেও দেখেছি, আবার তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল সেদিনে।

আগরপাড়ায় গিয়েছিলুম আশীর্বাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আমি আর জয়ন্ত। মনে ছিল আসন্ন মিলনোৎসবের বিমল-আনন্দ। তার মধ্যে করুণ বিয়োগান্ত দৃশ্যের কল্পনাই অসম্ভব।

আকাশ-বাতাসও ছিল প্রসন্ন। কিন্তু ভবিষ্য সূচনা দেবার জন্যেই রাত এগারোটার পরেই আকাশ-বাতাস আচম্বিতে প্রসন্নতা ভুলে করলে বিদ্রোহ-ঘোষণা। দেখা গেল আঁধার আকাশ-সায়রে বিদ্যুতের ছিনিমিনি-খেলা এবং ঝটিতি শোনা গেল ক্রুদ্ধ ঝটিকার ঝন্-ঝন্ ঝনৎকার। তারপর ভেসে গেল পৃথিবীর বুক ঝমাঝম্ বৃষ্টির ঝর-ঝর ঝরনায়।

কিন্তু আমরা এর মধ্যেও বিশেষ কোন ট্রাজেডির ইঙ্গিত পেলুম না। বৈশাখে তো জল-ঝড় হচ্ছে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার!

প্রকৃতির ক্ষ্যাপামি থামল না রাত একটার আগে। গ্রামের অলিগলিতে দেখা দিলে অস্থায়ী নদী কলকল শব্দে। তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে আমাদের মোটরযান যে নৌযানের কর্তব্যপালন করতে রাজি হবে না, এটুকু অনুমান করা কঠিন নয়।

কিন্তু সেজন্যেও আমাদের মাথাব্যথা ছিল না কিছুমাত্র। এসেছি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে, বাকি রাতটুকুর জন্যে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাওয়া গেল অনায়াসেই।

পরদিনের তরুণ প্রভাত। ঝলোমলো সোনালী সূর্য-করে, অমলিন আকাশের নীলিমায়, গন্ধবহ বাতাসের গুঞ্জনে, সুরেলা পাখিদের কূজনে কোথাও নেই গত রাত্রের দুর্বিষহ দুর্যোগের আভাস। পথও আর নদীর মত দুস্তর নয়, জল নেমে গিয়েছে চোখের আড়ালে।

আমি একমনে মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলুম। পাশের আসনে জয়ন্ত। অদূরেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

হঠাৎ জয়ন্ত বলে উঠল, "গাড়ি থামাও মাণিক!"

গাড়ি থামিয়ে শুধোলুম, "ব্যাপার কি?"

এদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, "পথের পাশে মাঠের ঐ গাছতলায় একটা সন্দেহজনক কি দেখা যাচ্ছে।"

—"সন্দেহজনক?"

—"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, একটা মানুষ জামাকাপড় পরেই ওখানকার ভিজে জমির উপরে শুয়ে বা ঘুমিয়ে আছে। স্বাভাবিক নয়।"

—"কি করতে চাও?"

—"তদারক।"

জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ফিরে চেঁচিয়ে বললে, "মাণিক, দেখে যাও।" তার গলার আওয়াজ সচকিত।

আমিও কৌতূহলী হয়ে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

গাছতলার ভিজে ঘাসজমির উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জনৈক ব্যক্তি। কিন্তু তাকে ঘুমন্ত লোক বলে সন্দেহ করবার উপায় নেই, কারণ তার জামার বুকপকেটের কাছটা রক্তরাঙা। মৃতদেহ।

লোকটির চেহারা সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত। বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। সুগঠিত দেহ, সুগৌর বর্ণ, সুশ্রী চোখ-নাক। জামা-কাপড়-জুতায় সৌখিনতার চিহ্ন। পাঞ্জাবীর উপরে মুক্তার বোতাম। বুকে সংলগ্ন বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলির উপরে একটি অঙ্গুরী থেকে সূর্যকিরণে জ্বল্-জ্বল্ করছে একখণ্ড হীরক।

জয়ন্ত মাটির উপরে বসে পড়ল। মৃতদেহের ডান হাতখানা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার বদ্ধ-মুষ্টির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কি-একটা জিনিস—যেন কোন গাছের ডালের এক টুকরো।

পকেট থেকে আতসী কাঁচখানা বার করে মৃতের বদ্ধমুষ্টির উপরে ধরে জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মাণিক, আমি এইখানেই থাকি। গাড়ি নিয়ে থানায় গিয়ে তুমি খবর দিয়ে এস। ব্যাপারটা 'ইন্টারেষ্টিং' বলে মনে হচ্ছে। বোধ করি অভাবিত ভাবেই আমাদের কোন খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে।"

মোটরের দিকে এগুতে এগুতে মনে মনে ভাবতে লাগলুম, চুম্বক লোহাকে না টেনে ছাড়ে না। খুনের মামলা সর্বদাই জয়ন্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়!

'বন্-সাই' কী চীজ?

সদলবলে যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হল থানার ইনস্পেক্টর। নাম সুজন সেন। আর কোন মামলায় তার সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয় নি। অপরিচিত।

পুলিসে কিছুকাল কাজ করবার পর থেকেই লোকের ভুঁড়ি বাড়তে শুরু করে কেন, তার গুপ্তকথা আমার জানা নেই। সুজনেরও বপুখানি রীতিমত মেদপুষ্ট। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। মস্ত মুখমণ্ডলে ছোট্ট দুটো কুৎকুতে চোখ। পুরু ওষ্ঠাধরের দুই পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে একজোড়া জাঁদরেল গোঁফ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গায়ের রং এমন যে, অমাবস্যার রাতে সে দুই হাত দূর থেকেও অদৃশ্য মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে।

জয়ন্ত অপেক্ষা করছিল মৃতদেহের পাশেই। তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সুজন উদ্ধতভাবে বাজখাঁই গলায় শুধোলে, "কে আপনি? এখানে কেন?"

জয়ন্ত বিনীতভাবে বললে, "আজ্ঞে, আমিই লাসটাকে প্রথমে দেখতে পেয়েছি।"

—"আপনার নাম কি?"

জয়ন্ত পরিচয় দিলে।

নিজের দুই ভুরু কপালের উপরদিকে যথাসম্ভব তুলে সুজন বললে, "ওহো, মাঝে মাঝে আপনার নাম আমার কানে আসে বটে! শুনি আপনি নাকি অ্যামেচার ডিটেকটিভ—অর্থাৎ সখের গোয়েন্দা?"

—"আজ্ঞে, এখনো আমি 'ডিটেকটিভ উপাধিলাভের যোগ্য হই নি। নিজেকে আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বলেই মনে করি।"

সুজনবাবু হঠাৎ অতিশয় গম্ভীর হয়ে বললেন, "যাক্‌গে ও-সব ছেঁড়া ছেঁড়া ছেঁদো কথা, এখন আমি নিজের কাজ শুরু করি। হ্যাঁ মশাই, আপনি লাস-টাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি তো?"

—"আজ্ঞে না।"

—"উত্তম। আনাড়ীরা ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভালো ভালো সূত্র নষ্ট হয়ে যায়।"

সুজন এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে মৃতদেহের চারিদিকটা একবার পরিক্রমণ করলে। তারপর লাসের পাশে বসে পড়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর মৃতের জামা-কাপড় হাতড়াতে লাগল, কিন্তু একখানা চেকবই আর একটা ফাউন্টেন পেন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

সুজন বললে, "অনেক কথাই জানা যাচ্ছে। এটা যে খুনের মামলা তাতে আর সন্দেহ নেই। মৃত্যুর কারণ রিভলভারের গুলি। লাসের বুকে আর হাতে রয়েছে মুক্তার বোতাম, হীরার আংটি আর সোনার হাত-ঘড়ি, সুতরাং অর্থলোভে কেউ একে খুন করে নি। হত ব্যক্তি ধনী। যখন চেকবই পেয়েছি, লোকটিকে সনাক্ত করাও কঠিন হবে না।"

জয়ন্ত বললে, "আরো একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে। ভদ্রলোককে এখানে খুন করা হয় নি।"

মুখ টিপে একটু হেসে সুজন বললে, "তাই নাকি?"

—"মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। কোথাও এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই।"

আবার ফিক্ করে হেসে সুজন বললে, "কালকের বিষম বৃষ্টির পরও মাটির উপরে রক্তের দাগ থাকে নাকি?"

—"কিন্তু জামার উপরে রক্তের দাগ অস্পষ্ট হয় নি কেন? আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, অমন তুমুল দুর্যোগেও লাসের ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি-করা জামা-কাপড়ের ভাঁজ ভেঙে যায় নি।"

জয়ন্তের যুক্তি শুনে সুজন মনে মনে কি ভাবলে জানি না, কিন্তু মুখে অবহেলাভরে বললে, "সখের গোয়েন্দার সৌখিন মতামত নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আপাতত এখানকার তদন্ত শেষ করলুম। আগে লাস সনাক্ত করি, তারপর অন্য কথা।"

এতক্ষণে মৃত ব্যক্তির মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে সুজনের নজর গেল। মুঠো খুলে খণ্ডিত গাছের ডালের অংশটা বার করে নিয়ে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "কি দেখছেন?"

—"গাছের ডালের টুকরো।"

—"কি গাছ?"

—"কোন ছোট জাতের গাছ।"

—"মৃত ব্যক্তির হাতে ওটা এল কেমন করে?"

—"খুব সম্ভব অন্তিমকালে মৃত ব্যক্তির হাতে ছিল কোন একটা ছোট গাছ।"

—"ঠিক বলেছেন!"

—"মারাত্মক চোট খেয়ে মৃত ব্যক্তি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে, সেই সময়ে গাছের একটা ডাল ভেঙে তার মুঠোর ভিতরে থেকে যায়।"

"এও ন্যায্য অনুমান। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, ও-রকম কোন গাছের চিহ্ন পর্যন্ত এখানে নেই। ঐ ভাঙা ডালটায় কিছু কিছু পাতাও আছে। বলতে পারেন, ওটা কি গাছের ডাল?"

—"হঠাৎ দেখলে মনে হয় দেবদারুর। কিন্তু তা অসম্ভব।"

—"কেন?"

—"দেবদারুর আকার হয় বিশাল। তার ডাল আর পাতাও এত ছোট হতে

পারে না। চারা অবস্থায় দেবদারুও ছোট থাকে বটে, কিন্তু এটা কোন চারা গাছের ডাল নয়।''

—''ঠিক। এটা চারা গাছের ডাল নয়। এ হচ্ছে 'বন্-সাই্'!''

—''কি, কি বললেন?''

—''বন্-সাই!''

—''সে আবার কি চীজ বাবা?''

—''আপাতত আমার এর বেশি আর কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, 'বন্-সাই'য়ের মধ্যেই আছে এই মামলার প্রধান সূত্র! চল মাণিক, বেলা বাড়ছে, আমাদের প্রাতরাশের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়!''

পাগলের দিকে লোকে যে ভাবে চেয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবেই সুজন ফ্যাল্‌ফেলিয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

পুলিসের অতিথি

পূর্বোক্ত ঘটনার একদিন পরে।

জয়ন্তের হাতে রুপোয় গড়া শামুকের নস্যদানী। আমার হাতে খবরের কাগজ। আমি কাগজ পড়ছি, জয়ন্ত চোখ মুদে শুনছে। সামনের টেবিলে খাদ্যপানীয়শূন্য চায়ের পেয়ালা, কেটলি ও পিরিচ প্রভৃতি। এইমাত্র আমাদের প্রাতরাশ জঠরস্থ হয়েছে।

আমি পড়তে লাগলুম :

আগরপাড়ার হত্যাকাণ্ড

আগরপাড়ার মাঠে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, গতকল্য আমরা সে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে এখন কয়েকটি নতুন তথ্য জানা গিয়াছে।

নিহত ব্যক্তির নাম সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি জমিদার এবং কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে সুপরিচিত।

ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা সত্যেন্দ্রবাবু বিশেষ কোন লোকের সঙ্গে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর আর বাড়িতে ফিরেন নাই। পরদিন প্রভাতে আগরপাড়ার এক মাঠে তাঁহার রক্তাক্ত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়।

রাত্রে তিনি আগরপাড়ায় গিয়াছিলেন কেন, পুলিস তাহার কারণ ধরিতে পারে নাই। সেখানে তাঁহার পরিচিত কোন লোকই বাস করে না।

হত্যাকারী সত্যেন্দ্রবাবুর মূল্যবান মুক্তার বোতাম, হীরার আংটি ও সোনার হাতঘড়িতে হস্তক্ষেপ করে নাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী, দানশীল ও জনপ্রিয়। তাঁর চরিত্রও ছিল নিষ্কলঙ্ক, নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করিতেন না। তবু এমন শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পড়িলেন কেন তাহারও কারণ কেহ অনুমান করিতে পারিতেছে না।

এই বিয়োগান্ত ঘটনার উপরে রহিয়াছে একটা ঘনীভূত রহস্যের আবরণ। উদ্দেশ্যহীন নরহত্যা কেউ করে না, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? প্রতিহিংসা? কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু ছিলেন অজাতশত্রু।

মামলার ভারগ্রহণ করিয়াছেন সুযোগ্য পুলিস কর্মচারী শ্রীসুজন সেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি এমন একটি বিশেষ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার ফলে অবিলম্বেই রহস্যভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জয়ন্ত চোখ খুলে বললে, "বাহাদুর সুজনবাবু, বাহাদুর! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এর মধ্যেই রহস্যভেদ হবার সম্ভাবনা!"

আমি বললুম, "তুমি কি সেটা অসম্ভব বলে মনে কর?"

—"হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভবপর হওয়াও কঠিন।"

—"কেন?"

—"পুলিস ভুল পথে চলেছে।"

—"কি করে জানলে?"

—"খবরের কাগজের রিপোর্টটা দেখ। সত্যেনবাবু রাত্রে আগরপাড়ায় গিয়েছিলেন কেন, পুলিস এখনো তার কারণ ধরতে পারে নি।"

—"কিন্তু সে কারণের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক কি?"

—"সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সত্যেনবাবু স্বেচ্ছায় আগরপাড়ায় যান নি।"

—"তুমি কি মনে কর, সত্যেনবাবুকে জোর করে সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?"

—"না।"

—"তবে?"

জয়ন্ত কোন জবাব দেবার আগেই দোতালার সিঁড়ির উপরে শোনা গেল উদ্দাম পায়ের দুদ্দাড় শব্দ এবং তারপরেই হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল একটি যুবক। তার মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্ত। আমরা তার দিকে তাকিয়ে রইলুম সবিস্ময়ে।

যুবক অবসন্নের মত একখানা চেয়ার চেপে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। ভালো করে তার মুখের পানে তাকিয়ে আমি আর একটা ব্যাপার

আবিষ্কার করলুম। গতপূর্ব দিনের সকাল বেলায় আগরপাড়ার মাঠে যে সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে যুবকের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে আশ্চর্য-রকম।

জয়ন্ত সুধোলে, "কে আপনি? কি চান?"

যুবক সকাতরে বলে উঠল, "আমাকে রক্ষা করুন!"

—"পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায়!"

—"কেন?"

—"পুলিস আমাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে। আমি সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর ছোট ভাই। আমার নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

—"বটে? কিন্তু কেমন করে জানলেন, পুলিস আপনাকে সন্দেহ করে?"

—"তাদের ভাবভঙ্গি দেখে আর প্রশ্ন শুনে। আমার উপরে ঢালাও হুকুম হয়েছে, আমি যেন বাড়ির বাইরে পা না বাড়াই। এমন কি আমাদের বাড়ির দরজায় পাহারাওয়ালা মোতায়েন হয়েছে। আমি খিড়কীর দরজা দিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

—"বোকামি করেছেন। এতে পুলিসের সন্দেহ আরও বাড়বে।"

—"উপায় কি? আমি নির্দোষ, কিন্তু পুলিস আমায় বিশ্বাস করে না। শুনেছি, এই মামলার সঙ্গে আপনার নাম জড়িত আছে! তাই—"

জয়ন্ত বাধা দিয়া বললে, "আপনি আমায় চেনেন?"

—"নিশ্চয়ই চিনি! আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি, আপনার কাছে যারা অপরিচিত, তারাও আপনাকে চেনে। চিনি বলেই বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি ছাড়া আর কেউ এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আপনার হাতেই আমি আমার ভার অর্পণ করতে চাই।"

—"আপনার ভার বহন করবার শক্তি আমার হবে কিনা জানি না। কারণ আপনি যদি সত্যসত্যই অপরাধী হন, তবে—"

দ্বিজেন বাধা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "আমি অপরাধী? যাঁকে দেবতার মত দেখি, সেই বড় ভাইকে আমি খুন করব? বলেন কি মশাই?" সে উত্তেজিত হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে বললে, "শান্ত হোন দ্বিজেনবাবু, আমি আপনাকে অপরাধী বলছি না। কিন্তু আপনার কোন কথাই আমি জানি না। এই চেয়ারের উপরে স্থির হয়ে বসুন। এখন বলুন দেখি, ঘটনার দিন বৈকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন?"

—"বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর লাইট-হাউসে

যাই। সিনেমা দেখে রাত ন'টার সময়ে বাড়িতে ফিরে আসি। রাত দশটা পর্যন্ত রেডিয়োর গান শুনি। সাড়ে দশটার সময়ে আহারাদি শেষ করে ঘুমোতে যাই, রাত তখন এগারোটা।''

—''তাহলে আপনার অবর্তমানেই সত্যেনবাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন?''

—''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

—''তিনি কোথায় গিয়েছিলেন তা জানেন?''

—''তা জানি না, তবে কেন গিয়েছিলেন সেটা বৌদিদির মুখে শুনেছি।''

—''কি শুনেছেন?''

—''দাদা নাকি কি-একটা দুর্লভ 'কিউরিও' কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আগরপাড়ায় নয়, কলকাতাতেই। দাদার বেজায় সখ ছিল 'কিউরিও' কেনার। সখটা প্রায় বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, ফলে হরেক-রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখা যাবে আমাদের বাড়ির যেখানে সেখানে। সে-সবের কোনটা সুন্দর, কোনটা বিচিত্র, কোনটা আবার একেবারেই উদ্ভট। এমন সব জিনিসও দাদা চড়া দাম দিয়ে কিনতেন, সাধারণ লোকের কাছে যেগুলো জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়।''

—''এইবারে আপনাদের সংসারের কথা কিছু বলুন।''

—''জমিদার হিসাবে আমাদের নামডাক আছে। নিজেদের ধনী বললে অত্যুক্তি করা হবে না। পিতার অবর্তমানে দাদা আর আমিই জমিদারির মালিক। দেড় বৎসর হল, দাদা বিবাহ করেছেন। বৌদিদিও ধনী পিতার একমাত্র সন্তান, বিবাহের পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁরও পিতৃবিয়োগ হয়। আমি এখনো অবিবাহিত।''

—''সত্যেনবাবু পরলোকে, এখন জমিদারির স্বত্বাধিকারী কে?''

—''আমি। দাদা নিঃসন্তান।''

—''পুলিসের সন্দেহের কারণ অনুমান করছি। আচ্ছা দ্বিজেনবাবু, আপনি জানেন কি, মৃত সত্যেনবাবুর হাতের মুঠোয় গাছের একটা অংশ পাওয়া গিয়েছে?''

—''আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনস্পেক্টর সুজনবাবু সেটা আমাকে দেখিয়েছেন।''

—''সে-রকম কোন গাছ আপনাদের বাড়িতে আছে?''

—''আজ্ঞে না।''

—''ঠিক জানেন?''

—''হ্যাঁ, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।''

—''আপনার বৌদিদির নাম কি?''

—''শ্রীমতী লতিকা দেবী।''

—''তিনি কি অবগুণ্ঠনবতী কুলললনা, অন্তঃপুরের বাইরে পদার্পণ করেন না?''

—"না মশাই, তিনি একেবারে আধুনিকা। এম-এ পাস করেছেন—ঘরে-বাইরে তাঁর অবাধ গতি।"

—"তাহলে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে নারাজ হবেন না?"

—"নিশ্চয়ই হবেন না। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

—"বেশ তো, এখুনি চলুন না! যদিও তিনি এখন অত্যন্ত কাতর হয়ে আছেন, তবু—"

দ্বিজেনের কথা শেষ হবার আগেই ভৃত্য মধু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বললে, "পুলিসের সুজনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!"

দ্বিজেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে তার গৌরবর্ণ মুখ হয়ে গেল মড়ার মত হল্‌দে। প্রায়বদ্ধকণ্ঠে সে বললে, "পুলিস এসেছে পিছনে পিছনে! আমার কি হবে জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত ডান হাত তুলে আশ্বাস দিয়ে বললে, "মাভৈঃ!"

ধুপ-ধাপ্ পদশব্দ তুলে সুজন ঘরের ভিতরে ঢুকে দ্বিজেনের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে উষ্ণ স্বরে বললে, "পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া এত সোজা নয়, আমাদের চর আপনার পিছনে লেগে আছে ছায়ার মত!"

দ্বিজেন সকাতরে বললে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না মশাই! আমি পালাবার জন্যে এখানে আসি নি।"

—"তবে কি করতে এসেছেন? ভেরেণ্ডা ভাজতে?"

জয়ন্ত বললে, "উঁহু, তাও নয়! উনি এসেছেন সলাপরামর্শ করতে!"

এইবারে জয়ন্ত ও আমাকে দেখতে পেয়ে সুজন বিস্মিত স্বরে বললে, "একি, আপনারাও এখানে?"

জয়ন্ত হাতজোড় করে হাসতে হাসতে বললে, "অতি বিনয়ের ভাষায় বলতে হয়, এটাই হচ্ছে অধীনের গোলামখানা!"

—"তাই নাকি, তাই নাকি? আমি এ কথা জানতুম না। কিন্তু খুনের মামলার আসামীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি?"

—"আসামী! কে আসামী?"

নিজেকে শুধরে নিয়ে সুজন বললে, "না, না, এখনো ঠিক আসামী বলতে পারি না, তবে আসামী হতে আর বেশি দেরি নেই।"

—"কাকে লক্ষ্য করে এ কথা বলছেন? দ্বিজেনবাবু?"

—"তা ছাড়া আবার কে?"

—"ওঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ?"

—"মশাই, আইনে 'সার্‌কাম্‌স্‌ট্যান্‌শিয়াল্ এভিডেন্স' বা অবস্থাঘটিত প্রমাণ বলে একটা ব্যাপার আছে জানেন তো? যেমন বিনা আগুনে ধোঁয়ার জন্ম হয় না, তেমনি বিনা উদ্দেশ্যে খুন হওয়াও অসম্ভব। সত্যেনবাবুর কোন শত্রুর কথা শোনা যায় না। মূল্যবান দ্রব্যের লোভেও কেউ তাঁকে খুন করে নি। সুতরাং বাইরের হত্যাকারীর কথা এখানে ধর্তব্য নয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে, সত্যেনবাবুর মৃত্যুর ফলে সব চেয়ে লাভবান হবে কোন্ ব্যক্তি?"

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এ যুক্তি জজে মানে। সত্যেনবাবুর মৃত্যু হলে দ্বিজেনবাবু একলাই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন বটে। ঠিক কথা, ঠিক কথা, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!"

সুজন উৎসাহিত হয়ে বললে, "তারপর দেখুন, দ্বিজেনবাবুর 'অ্যালিবাই' সন্তোষজনক নয়। সত্যেনবাবু তাঁর মৃত্যুর দিনে সন্ধ্যার সময়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, তখন উনি নাকি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষী কে? ওঁর মুখের কথা তো প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না?"

—"তাও কখনো হয়? তবে কিনা সিনেমা দেখে উনি রাত ন'টার সময়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।"

—"এলেই বা! সত্যেনবাবুও তো মারা পড়েছেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটার মধ্যেই!"

—"কি করে জানলেন?"

—"ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গিয়েছে।"

—"অতএব?"

—"অতএব দ্বিজেনবাবুকে আমাদের অতিথি হতে হবে। ভেবেছিলুম আপাতত ওঁকে বাড়ির মধ্যেই নজরবন্দী করে রাখব, কিন্তু উনি যখন তাতে রাজি নন, হটরহটর করে হাটে-মাঠে ছুটোছুটি করতে চান, তখন তা ছাড়া আর উপায় নেই।"

দ্বিজেন সভয়ে বলে উঠল, "আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করছেন!"

জয়ন্ত বললে, "না দ্বিজেনবাবু, এটা ঠিক গ্রেপ্তার নয়। তবে আপাতত দু-চারদিন আপনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পুলিসের আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।"

—"হা ভগবান! তাহলে আপনিও আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না?"

—"পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করব না।"

হো হো করে হাসতে হাসতে সুজন বললে, "চেষ্টা করে শেষটা কিছু ফল হবে কি জয়ন্তবাবু? ডিটেকটিভ নভেলের সখের গোয়েন্দারা পদে পদে সরকারি পুলিসের উপরে টেক্কা মারে বটে, কিন্তু আমরা হচ্ছি বাস্তব জগতের মানুষ।

পেশাদারের কাছে সৌখিনের খাতির নেই—বলে রাখলুম এক কথা, বুঝলেন মশায়?"

—"যা বলেছেন, লাখ টাকার এক কথা! তাহলে দ্বিজেনবাবু, দুর্গা বলে আপনি এখন সুজনবাবুর সঙ্গে যাত্রা করুন। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার দাদার নামে 'ফোন' আছে নিশ্চয়ই?"

—"আছে।"

দ্বিজেনকে নিয়ে সুজন প্রস্থান করল। জয়ন্ত কিছুক্ষণ বসে রইল মৌনমুখে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "মাণিক, সত্যেনবাবুর বাড়িতে ফোন করে লতিকা দেবীকে আজকের ব্যাপারটা জানিয়ে দাও। আর এটাও বলে রেখ, বৈকালে আমরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। বিশেষ দরকার।"

সুজনের মুরুব্বিয়ানার বাড়াবাড়িটা জয়ন্ত গায়ে মাখল না বটে, কিন্তু আমার গা যেন জ্বলতে লাগল। তবে কথাতেই আছে অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি। এও বারবার দেখেছি যে, জয়ন্তের কাছে চাল মারতে গিয়ে অনেক চালিয়াতকেই শেষ পর্যন্ত ল্যাজে-গোবরে হতে হয়েছে, সুজনেরও ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না!

লতিকা দেবী

বৈকালে যথাসময়ে আমরা মৃত সত্যেনবাবুর বাড়ির দিকে যাত্রা করলুম।

স্বহস্তে মোটর চালিয়ে যথাস্থানে গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি?"

আমি শুধোলুম, "কি?"

—"একখানা কালো রঙের সিডান গাড়ি সারা পথ আমাদের পিছু পিছু এসেছে। ঐ দেখ, গাড়িখানা এখন আমাদের সামনে দিয়ে ছুটছে।"

—"হয়তো এইটেই ওর গন্তব্য পথ।"

—"হয়তো তাই। চল, নেমে পড়ি।"

প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। ফটকে পাহারারত দ্বারবান। লতিকা দেবীর কাছে আমাদের আগমন সংবাদ পাঠালুম। অনতিবিলম্বে ভৃত্য এসে আমাদের একখানা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

লম্বা-চওড়া হল-ঘর। বোধ করি বৈঠকখানা। সাজসজ্জা কেবল মালিকের

রুচি পরিচায়ক নয়, রীতিমত অসাধারণ। বাঙালী ধনীদের অন্যান্য বৈঠকখানার সঙ্গে এর পার্থক্য যেখানে চোখে পড়ে সেইখানেই।

চার দেওয়াল চিত্রে চিত্রে চিত্রময়। প্রত্যেক ছবি হাতে আঁকা, এঁকেছেন নামজাদা চিত্রকররা। যেখানে সেখানে রয়েছে প্রাচীন ভাস্করদের হাতে গড়া পাথরের, পিতলের ও ব্রোঞ্জের দুর্মূল্য মূর্তি। মাঝে মাঝে 'সো-কেসে'র মধ্যে সাজানো আছে চৈনিক, জাপানী, মিশরীয়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় নানাশ্রেণীর শিল্পসম্ভার। বসবার আসনগুলিও বিশেষ ফরমাস দিয়ে নতুন পরিকল্পনায় প্রস্তুত। মেঝের উপরে বিছানো মহামূল্যবান পারস্যদেশীয় কার্পেট। প্রতিটি আসবাব—এমন কি ছাইদানগুলো পর্যন্ত শিল্পীসুলভ মনের পরিচয় দেয়।

জয়ন্ত একটি 'সো-কেসে'র সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন চীনদেশে নির্মিত পোর্সিলেনের বাসন পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে ধীরপদে এসে দাঁড়ালেন বিষাদের প্রতিমূর্তির মত এক মহিলা। মুখে তাঁর নিরাশা ও যাতনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু তিনি পরমা সুন্দরী। দেখলেই বোঝা যায় কেবল সৌন্দর্য নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বও আছে।

জয়ন্ত নমস্কার করে মৃদুস্বরে বললে, "আপনিই বোধ হয় লতিকা দেবী?"

প্রতি-নমস্কার করে মহিলা বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার আসন গ্রহণ করুন।" তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, কিন্তু ভারাক্রান্ত।

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর জয়ন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, "এই দারুণ দুর্ভাগ্যের দিনে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা উচিত নয়। কিন্তু আপনার দেবর দ্বিজেনবাবু এই মামলায় আমাদের নিযুক্ত করেছেন। কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেন না বলেই মনে করি। তাই নিরুপায় হয়েই এই দুঃসময়েও আমাদের আসতে হয়েছে, এজন্যে ক্ষমা করবেন।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে লতিকা দেবী বললেন, "ভগবান আমাকে দুর্ভাগ্যের আঘাত সহ্য করবার শক্তি দিয়েছেন। যা হবার তা হয়েছে, এখন আবার আমার দেবরও বিপন্ন—দুনিয়ায় আজ আমার আত্মীয় বলতে উনি ছাড়া আর কেউ নেই। ওঁকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করবার আর আমার স্বামীর হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার জন্যে আপনাদের আমি যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

—"পুলিস আপনার দেবরকে কেন সন্দেহ করে জানেন তো?"

ক্রুদ্ধস্বরে লতিকা দেবী বললেন, "অন্যায় সন্দেহ, অসম্ভব সন্দেহ! আমার দেবর আমার স্বামীকে পূজা করতেন।"

—"আমারও বিশ্বাস, পুলিসের সন্দেহ অমূলক। আমিও তাঁর মুক্তি চাই।"

লতিকা দেবীর দুই চক্ষে ফুটল আগুনের ফিনিক। তপ্ত স্বরে তিনি বললেন, "আপনার কর্তব্য কি এই পর্যন্তই? যে পাষণ্ড আমার দেবতুল্য স্বামীকে হত্যা করেছে, তার শাস্তিবিধানের জন্যে কি আপনি কোন চেষ্টাই করবেন না?"

—"লতিকা দেবী, এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ আগে আমি অপরাধীকেই আবিষ্কার করতে চাই। তাহলেই পুলিস দ্বিজেনবাবুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।"

—"আমার কাছ থেকে আপনি কি জানতে চান, বলুন।"

—"আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য, সত্যেনবাবুর কোন শত্রুর কথা আপনি জানেন?"

—"না।"

—"অর্থলোভেও কেউ সত্যেনবাবুকে খুন করে নি। তবে এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? আপনার স্বামীর উপরে কারুর কোন আক্রোশ ছিল না? ভালো করে ভেবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে লতিকা দ্বিধাভরে বললেন, "দেখুন, আপনি বললেন বলে একটা কথা আমার মনে পড়ছে। কিন্তু কথাটা এতই তুচ্ছ যে উল্লেখযোগ্যই নয়। পুলিসেরও কাছে কথাটা উল্লেখ করা দরকার ভাবি নি।"

—"তবু আপনি বলুন! অনেক সময়ে নগণ্য কথাই অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে।"

—"কিন্তু ব্যাপারটা দেড় বৎসর আগেকার। আমার স্বর্গীয় বাবা দুরারোগ্য রোগে দীর্ঘকাল শয্যাগত ছিলেন। তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, চিকিৎসার কোনই ত্রুটি হয় নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররাও তাঁর আশা ছেড়ে দিলেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। জীবনের আর কোন আশা নেই জেনে আমার বিবাহের জন্যে বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার জন্যে নির্বাচিত হল এক বনিয়াদী বংশের পাত্র। তাঁর অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না বটে, কিন্তু সেজন্যে বাবার আপত্তি হল না, কারণ আমি ছিলুম তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। বিবাহের দিন ধার্য হল। তারপর কানাঘুষায় শোনা গেল, পাত্রের নৈতিক চরিত্র ভালো নয়, তিনি মদ্যপ আর জুয়াড়ি। সম্বন্ধ ভেঙে গেল।"

—"তারপর সত্যেনবাবুর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আর বিবাহ হয়?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বিবাহের কয়েকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে। আমার স্বামী একখানা উড়ো চিঠি পান। তাতে শাসানো হয়েছিল, আমাকে বিবাহ করলে তাঁকে হত্যা করা হবে। উড়ো চিঠিখানা নগণ্য ভেবে তিনি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তারপর এই বেনামী চিঠিখানার কথা আমরা একরকম ভুলেই যাই।"

—"যাঁর সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে যায়, তাঁর নাম আপনার মনে আছে?"

—"রতিকান্ত মজুমদার।"

—"ঠিকানা?"

—"এইটুকু মনে আছে তিনি কলকাতার বাসিন্দা হলেও বর্দ্ধমানের লোক।"

—"তাঁকে দেখেছেন?"

—"না। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার কারণ নেই। কারণ তিনি যদি উড়ো চিঠির লেখক হতেন, তাহলে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন না।"

—"মন যাদের রুগ্ন, প্যাঁচালো, একরোখা আর প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাদের কোন কথাই জোর করে বলা যায় না। বৈরনির্যাতনের প্রবৃত্তি তারা দীর্ঘকাল পোষণ করে রাখতে পারে। অবশ্য রতিকান্তবাবুকে আমি এই শ্রেণীর লোক বলে মনে করবার কোন কারণ দেখছি না। উড়ো চিঠির লেখক কে, তারও প্রমাণ নেই আর সেখানা নিতান্ত তুচ্ছ হওয়াও সম্ভব। বিবাহের ব্যাপারে প্রায়ই এমনি বাজে উড়ো চিঠির আবির্ভাব হয়। তবু কথাটা মনে রাখবার মত।"

—"আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

—"ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে আপনার স্বামী কোথায় গিয়েছিলেন?"

—"জানি না। তবে কেন গিয়েছিলেন, সে কথা তাঁর মুখেই শুনেছি।"

—"কেন?"

—"কি-একটা জাপানি 'কিউরিও' কিনতে।"

—"জাপানি 'কিউরিও'?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিসটা কি, আমার কাছে তিনি ভাঙেন নি। তবে বলে গিয়েছিলেন, আমাকে সেটা দেখিয়ে অবাক করে দেবেন। আমাদের এই বৈঠকখানাটি আপনারা দেখছেন। কেবল এখানেই নয়, আমাদের বাড়ির ঘরে ঘরে এমনি সব 'কিউরিও' ছড়ানো আছে। এই সখের জন্যে তাঁর অজস্র টাকা খরচ হয়েছে। কোথাও যদি তিনি মনের মত 'কিউরিও'র সন্ধান পেতেন, তবে তা না পাওয়া পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারতেন না। ঐ জাপানি জিনিসটির সন্ধান দিয়েছিলেন একটি ভদ্রলোক।"

—"তাঁর নাম জানেন?"

—"প্রাণধন বিশ্বাস। তিনি নিজে একখানা বেবি-ট্যাক্সি করে আমাদের বাড়িতে এসে আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

—"লোকটিকে দেখেছেন?"

—"আজ্ঞে না, তিনি ট্যাক্সির বাইরে আসেন নি।"

—"ট্যাক্সির নম্বর?"

—"সন্ধ্যার সময়ে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিখানা দেখেছিলুম। নম্বর দেখবার কথা মনে হয় নি। পুলিসও নম্বরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলতে পারি নি।"

জয়ন্ত আপসোস্ করে বললে, "নম্বর দেখেন নি, ভুল করেছেন—বড়ই ভুল করেছেন!"

—"সন্ধ্যাবেলায় দূর থেকে নম্বর হয়তো ভালো করে দেখতেও পেতুম না।"

—"ট্যাক্সির রং?"

—"খানিক সাদা, খানিক কালো।"

—"ভালো করে ভেবে দেখুন, তার আর কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করেন নি?"

—"বিশেষত্ব—বিশেষত্ব, হ্যাঁ, একটা বিশেষত্বের কথা স্মরণ হচ্ছে।"

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, "কি?"

—"ট্যাক্সির পিছনের আলোর তলায় দেখেছিলুম, সাদা নম্বর-প্লেটের উপরদিকের ডান কোণের খানিকটা ভাঙা, বোধ হয় কোন দুর্ঘনার ফল।"

—"পুলিসকেও এ কথা জানিয়েছেন?"

—"না, আগে আমার এ কথা মনে পড়ে নি।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে রুপোর নস্যদানী থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, "ধন্যবাদ লতিকা দেবী! এতেই হয়তো কাজ চলবে। আমার আর কিছু জানবার নেই—নমস্কার! এস মাণিক!"

মেঘনাদের অস্ত্রত্যাগ

জয়ন্ত 'হুইল' ধরলে, পাশে গিয়ে বসলুম আমি।

জিজ্ঞাসা করলুম, "লতিকা দেবীর বর্ণনা শুনে তুমি কি ট্যাক্সি-চালককে সন্ধান করতে পারবে?"

মোটর চালাতে চালাতে জয়ন্ত বললে, "পারাই তো উচিত—অবশ্য ট্যাক্সি-চালক ইতিমধ্যে যদি নম্বর-প্লেট পাল্টে না ফেলে থাকে। এ ব্যাপারে আমি কোন পুলিস-বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করব। এ কাজ পুলিসই তাড়াতাড়ি হাসিল করতে পারবে।"

—"ধর ট্যাক্সি-চালক সত্যেনবাবুকে যে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। তাহলেও তুমি কি সেই বাড়ির কোন লোককে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে পারবে?"

—"উঁহু! কেউ যদি বলে বসে, সত্যেনবাবু সেখানে কিছুক্ষণ থেকেই আবার একলা চলে এসেছিলেন, তাহলে তা মিথ্যাকথা বলে প্রমাণ করা চলবে না।"

—"তবে?"

—"তবে বাড়িটার সন্ধান পেলে আমরা আর এক পা এগুতে পারব।"

—"অর্থাৎ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্?"

—"হ্যাঁ। তারপর আমার হাতে আছে এক ব্রহ্মাস্ত্র। বাড়িখানার খোঁজ পেলে হয়তো সেই চরম অস্ত্র প্রয়োগ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।"

—"কী সেই ব্রহ্মাস্ত্র?"

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়ে আচম্কা বিদ্যুৎ-বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলে—

এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খুব কাছেই যেন কান ফাটিয়ে ও চারিদিক্ কাঁপিয়ে গড়াম্ করে তোপের ভৈরব গর্জন শোনা গেল!

চট করে গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত বাইরে লাফিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমিও!

রাজপথের উপরে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া! হৈ হৈ চীৎকার! জনতার ছুটোছুটি! হুলুস্থুল কাণ্ড! একখানা বাড়ির দেওয়ালে দেখা গেল গভীর ফাটল! কে কোথা থেকে বোমা ছুঁড়েছে! আশ্চর্য এই, কেউ আহত বা নিহত হয় নি!

জয়ন্ত বললে, "ঐ সরু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক আমাদের দিকে কি একটা ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে দেখেই আমি প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলুম। সেইজন্যেই এ-যাত্রা কোন গতিকে বেঁচে গিয়েছি!"

আমি সেই গলিটার দিকে ছোটবার উপক্রম করতেই জয়ন্ত আমার হাত চেপে ধরে বললে, "আর বৃথা চেষ্টা! এতক্ষণে সে পগার পার হয়েছে! ঐ পুলিস আসছে! এখন এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে চলবে না—আমাদের হাতে অনেক কাজ!"

আবার মোটরে উঠে বসলুম।

তখনও আমার মনের অবস্থা হতভম্বের মত। বললুম, "এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!"

জয়ন্ত হুইল ধরে বললে, "না ভাই মাণিক, আগেই হয়েছিল মেঘোদয়! বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখনি দেখেছিলুম একখানা সন্দেহজনক উটকো মোটর আমাদের পিছু ধরেছে, তখনি আমার ভয় হয়েছিল যে আজ হয়তো কোন একটা অঘটন ঘটবে! ভাগ্যিস্ সতর্ক ছিলুম, নইলে এতক্ষণে আমাদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেত!"

আমি বললুম, "তুমি কি মনে কর, ঐ বোমাটা আমাদের টিপ্ করেই ছোঁড়া হয়েছিল?"

—"এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এই মামলার সঙ্গে জড়িত কোন লোক বা কোন দল আমাদের চেনে। খালি চেনে না, আমাদের ভয়ও করে। তারাই আমাদের অস্তিত্ব লোপ করতে চায়। আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করব বলছিলুম না? কিন্তু আমার আগে তারাই প্রয়োগ করেছিল ব্রহ্মাস্ত্র!"

—"কিন্তু তারা কারা?"

—"এখনো পর্যন্ত তুমি যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে! অপরাধী অস্ত্রত্যাগ করছে আড়াল থেকে মেঘনাদের মত। কিন্তু যেমন করেই হোক্ তাদের টেনে আনতে হবে সামনাসামনি। বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার!"

—"তবে আমরা দুটো নতুন নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি।"

—"হ্যাঁ, রতিকান্ত মজুমদার আর প্রাণধন বিশ্বাস।"

—"কিন্তু এদের কারুকে অপরাধী বলে প্রমাণ করা কঠিন।"

—"কেবল কঠিন নয়, এখনো পর্যন্ত, অসম্ভব। তবে আমার মন কি বলে জানো? এই দুইজনের মধ্যে কোন-না-কোন দিক দিয়ে একটা কিছু যোগাযোগ আছেই। কিন্তু এখন চুলোয় যাক্ মনের কথা! খেয়ালী মন তো অনেক কথাই বলে, কিন্তু সে-সব কাজে লাগে কৈ? আপাতত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ইনস্পেক্টর বন্ধু সুন্দরবাবুকে ফোন-যোগে স্মরণ করতে হবে। ট্যাক্সি-চালককে আবিষ্কারের ভার নিক্ষেপ করব তাঁরই উপরে।"

যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ

খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি একটা জরুরি কাজ সেরে ফেলা গেল। এবং তার পরের ঘটনাগুলোও ঘটতে লাগল আশাতীত, অভাবিত রূপে দ্রুততালে।

পরদিন সকালে বেলা দশটার ভিতরেই সুন্দরবাবুর নির্দেশ অনুসারে জনৈক পাহারাওয়ালা সেই বেবি-ট্যাক্সির চালককে আমাদের কাছে এনে হাজির করলে।

সে দস্তুরমত ভড়কে গিয়েছে। হাতজোড় করে বললে, "আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন হুজুর? আমি তো কোনই অপরাধ করি নি!"

—"সেটা বোঝা যাবে তুমি যদি সত্যকথা বল।"

—"মিথ্যা বলব কেন হুজুর?"

—"উত্তম। তুমি প্রাণধন বিশ্বাসকে চেনো?"

—"ও নাম কখনো শুনি নি।"

—"গত তেইশ তারিখে বৈকাল সাড়ে ছয়টার কিছু আগে বা পরে কে তোমার গাড়ি ভাড়া করে বালিগঞ্জে গিয়েছিল?"

—"এক অচেনা বাবু।"

—"তারপর?"

—"বালিগঞ্জ থেকে আর এক বাবুকে তুলে নিয়ে যাই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। খাল পার হয়ে অল্প দূরে গিয়ে দুই বাবুই নেমে একখানা-বাড়ির ভিতর যান। আমি ভাড়া নিয়ে চলে আসি।"

—"সেই বাড়িখানা আবার চিনতে পারবে?"

—"কেন পারব না?"

—"যে বাবু তোমার গাড়ি ভাড়া করেছিল, তাকে সনাক্ত করতে পারবে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর!"

—"আচ্ছা, আপাতত তুমি পুলিসের হেফাজতেই থাকো।"

ট্যাক্সি-চালককে নিয়ে পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, এইবারে কাজের পালা তোমার। সুজনবাবুকে তোমার সাহায্যে একখানা পত্রাঘাত করব। আশা করি তারপর তিনি সদলবলে এখানে আসতে বিলম্ব করবেন না।"

* * * *

হ্যাঁ, সুজন এলো অনতিবিলম্বেই। 'পুলিস-ভ্যানে' সদলবলে। তখন বৈকাল।

সুজন প্রথমেই বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আবার কি নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন? আমি তো এদিকে আরো কিছু অগ্রসর হয়েছি!"

—"কি রকম?"

—"সত্যেনবাবুর দেহের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে একটা ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভারের গুলি। খানাতল্লাস করে দ্বিজেনের ঘরেও পেয়েছি একটা ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভার।"

—"দ্বিজেনবাবুর লাইসেন্স আছে তো?"

—"তা আছে।"

—"কিন্তু ঐ রিভলভারই যে হত্যাকাণ্ডের সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার প্রমাণ কি?"

—"তাও প্রমাণিত হবে বৈকি! আমি তো কেতাবী সখের গোয়েন্দা নই, গোড়া না বেঁধে কাজ করি না। যাক্ ও কথা। এইবারে আপনার প্রমাণ দাখিল করুন।"

—"যে ট্যাক্সি করে সত্যেনবাবু ঘটনার দিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, তার চালকের দেখা পেয়েছি।"

—"তাই নাকি, তাই নাকি?"

—"মৃত্যুর আগে সত্যেনবাবু যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, তারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

—"বলেন কি, বলেন কি?"

—"প্রাণধন বিশ্বাসের নামও আপনি শুনেছেন নিশ্চয়?"

—"আলবৎ শুনেছি! সেই ব্যাটাই তো ভাঁওতা দিয়ে সত্যেনবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই দ্বিজেনের চর।"

—"ট্যাক্সি-চালক ঐ বাড়িতে গিয়ে তাকেও সনাক্ত করতে পারবে।"

—"তাহলে তো কেল্লা মার দিয়া! চলুন, চলুন—আর দেরি নয়!"

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। একখানা বাগানঘেরা মাঝারি আকারের বাড়ির সুমুখে এসে সেই ট্যাক্সি-চালকের নির্দেশে আমরা নেমে পড়লুম।

জনৈক ভৃত্য আমাদের আগমন-সংবাদ নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল। একটি লোক বেরিয়ে এল। যুবক—বয়স সাতাশ-আটাশের বেশি নয়। সাজপোশাক ফিটফাট।

পুলিস দেখে তার চোখ চমকে উঠল—কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। ভাবহীন মুখে সহজ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কাকে চান?"

সুজন মাতব্বরি চালে এগিয়ে গিয়ে বললে, "প্রাণধন বিশ্বাসকে।"

—"আপনারা বাড়ি ভুল করেছেন।"

—"মানে?"

—"প্রাণধন বিশ্বাস বলে কেউ এ বাড়িতে থাকে না।"

ট্যাক্সি-চালকের দিকে ফিরে সুজন বললে, "এই ড্রাইভার!"

—"হুজুর!"

—"এই বাবুকে চেনো?"

—"হ্যাঁ হুজুর! গেল তেইশ তারিখে এই বাবু আমার ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়েছিলেন।"

—"সন্ধ্যার একটু আগে?"

—"হ্যাঁ হুজুর। বালিগঞ্জ থেকে আর এক বাবুকে তুলে নিই। তারপর দুই বাবুই এই বাড়িতে এসে নামেন, আমিও ভাড়া নিয়ে চলে যাই।"

লোকটি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়েই বললে,—"হ্যাঁ, ঠিক কথা!"

একেবারে কবুল জবাব পেয়ে সুজন প্রথমটা হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর বললে, "বটে, বটে? কিন্তু আপনার সঙ্গের বাবুটি ছিলেন কে?"

—"তাঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।"

—"তিনি কেন এখানে এসেছিলেন?"

—"একটি জাপানি গাছ কিনতে।"

—"জাপানি গাছ?"

—"হ্যাঁ, দুর্লভ জাপানি গাছ।"

—"তারপর?"

—"দরে বনিবনাও হল না, তিনি আবার ফিরে গেলেন।"

সুজন এবারে বেগোছে পড়ে আর কোন প্রশ্ন না করে জয়ন্তের দিকে তাকালে অসহায়ের মত।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আমি এই ওজরই শুনব বলে মনে করেছিলুম। হ্যাঁ মশাই, আপনি তো প্রাণধন নন, কিন্তু আপনার নামটি কি শুনতে পাই না?"

—"শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।"

আমি চমকে উঠলুম।

জয়ন্ত বললে, "পরমহংসদেব বলতেন—যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আপনিও কি তাই? প্রাণধন, রতিকান্ত—দুইয়ে এক?"

রতিকান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "আপনার কথার অর্থ কি?"

—"অর্থটা অনর্থজনক—অর্থাৎ বিপদ্‌জনক, শুনলে আপনার রাগ হবে। তবে প্রথমেই রাগারাগি করে লাভ নেই। থাক্ ও কথা কিন্তু মশাই, আপনার দুর্লভ জাপানি গাছটি কি পদার্থ? একটিবার দেখে কি চক্ষু সার্থক করতে পারি না?"

রতিকান্ত বললে, "আপত্তি নেই। আমার সঙ্গে আসুন।"

রতিকান্তের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও সুজনের সঙ্গে আমিও বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম। একেবারে বৈঠকখানায়।

সেকেলে ধাঁচে সাজানো বৈঠকখানা। দেওয়ালে টাঙানো চটা-ওঠা সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পুরানো বিলাতী 'ওলিয়োগ্রাফ' বা মুদ্রিত তৈল-চিত্র; এদিকে ওদিকে বহু-ব্যবহৃত বিমলিন সোফা, কৌচ, টেবিল, চেয়ার; মেঝের উপরে রং-জ্বলে-যাওয়া কার্পেট। মনে হয় ঘরখানা একসময়ে সুদিন দেখেছিল।

ঘরের এককোণে চীনে মাটির টবের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে একটি অদ্ভুত গাছ। দেখতে ঠিক দেবদারু গাছের মত। তবে দেবদারু হচ্ছে মহামহীরুহ; অর্থাৎ অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কিন্তু এটি আকারে অতি ক্ষুদ্র—উচ্চতায় হয়তো এক ফুটের বেশি হবে না। একে বামন দেবদারু গাছ বলা চলে। তবে বামন হয় কুগঠন ও বিকলাঙ্গ, এর আকার কিন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক। যেমন 'সো-কেসে' সাজিয়ে রাখা হয় বিরাট তাজমহলের একরত্তি 'মডেল', একেও তেমনি মস্ত দেবদারুর

ছোট্ট 'মডেল' বলেই মনে হয়। 'মডেল' মনে হলেও এ হচ্ছে জীবন্ত গাছ! গুড়ি, ডালপালা ও পাতা সবই সজীব ও স্বাভাবিক।

সেই অদ্ভুত গাছের কাছে গিয়ে রতিকান্ত বললে, "ঐ দেখুন।"

জয়ন্ত বললে, "বন্-সাই, বন্-সাই!"

সুজন বিস্মিত স্বরে বললে, "বন্-সাই? সেদিনও শুনেছিলুম, আজও আপনার মুখে আবার শুনছি ঐ বেয়াড়া কথাটা। বন্-সাই কি মশাই? মাথামুণ্ডু নেই, যা তা একটা বললেই হল?"

জয়ন্ত একটু হেসে বললে, "বন্-সাই হচ্ছে জাপানি কথা। বন্-সাই বলতে বোঝায় টবে পালন করা বামন গাছ। শিল্পী বিশেষ কৌশলে এমন ভাবে গাছের বাড় বন্ধ করে দেয়, যার ফলে মস্ত মস্ত বনস্পতিকেও দেখতে হয় শিশুদের ক্রীড়নকের মত ছোট ছোট। ঠিকভাবে পালন করতে পারলে এই সব বামন গাছ পাঁচ-সাতশো বা হাজার বৎসরও বেঁচে থাকে। বামনে পরিণত করা যায় নানাশ্রেণীর বৃক্ষকেই—এমন কি বাঁশঝাড়-কে-বাঁশঝাড় পর্যন্ত। এ হচ্ছে জাপানের একটি নিজস্ব প্রাচীন আর্ট। সেখানকার ধনী আর সম্ভ্রান্ত সমাজ থেকে জনসাধারণেরও মধ্যে এই শ্রেণীর গাছের চাহিদা আছে অত্যন্ত। এখন কেবল জাপানে নয়, য়ুরোপ-আমেরিকাতেও জাপানি বামন গাছকে গৃহসজ্জার একটি প্রধান ভূষণের মত ব্যবহার করা হয়। যে বামন গাছের বয়স যত বেশি, তার দামও হয় তত চড়া।"

সুজন বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে গাছটা দেখতে দেখতে বললে, "এর খানিকটা ভাঙা দেখছি যে!"

জয়ন্ত বললে, "ঘটনাস্থলে মৃতদেহের হাতের মুঠোয় গাছের যে ভাঙা অংশটা পাওয়া গেছে, সেটা সঙ্গে করে এনেছেন কি?"

—"চিঠিতে আনতে বলেছেন, আনব না?"

সচমকে সুজন বললে, "কি বলতে চান আপনি? তবে কি—তবে কি—"

সেই ভাঙা ডালটা যথাস্থানে যুক্ত করেই নিশ্চিন্ত ভাবে বোঝা গেল, সেটা এই বামনগাছেরই অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়!

সুজন দুই চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "তাহলে সত্যেনবাবুকে হত্যা করা হয়েছে এই ঘরেই?"

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়েই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল রতিকান্তের উপরে এবং দুই হাত সুদ্ধ তার দেহটাকে নিজের দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে, মাণিক, এ হঠাৎ পকেটের মধ্যে ডানহাত চালিয়ে দিয়েছে কেন দেখ তো!"

তার পকেটের ভিতর থেকে টেনে বার করলুম একটা রিভলভার!

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই! রতিকান্ত মরিয়া হয়ে আমাদেরও বধ করতে চেয়েছিল! সুজনবাবু, চট্ করে এই সর্বনেশে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন!"

সুজন তৎক্ষণাৎ কথামত কাজ করে বললে, "বাপ রে বাপ, এতটা আমি তো ভাবতে পারি নি!"

জয়ন্ত বললে, "এই রতিকান্তই নাম ভাঁড়িয়ে সত্যেনবাবুকে এখানে ভুলিয়ে এনে হত্যা করেছে!"

—"আর দ্বিজেন?"

—"নির্দোষ। সুজনবাবু, আপনি যদি আরো একটু তলিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, তবে লতিকা দেবীর মুখ থেকেই রতিকান্তের অস্তিত্ব জানতে পারতেন। মরণোন্মুখ ধনী পিতার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী লতিকা দেবী, সে ছিল তাঁর পাণিপ্রার্থী, বিবাহের দিন পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লতিকা দেবী তার কবল থেকে ফস্কে গিয়ে পড়েন সত্যেনবাবুর হাতে, আর সেইজন্যে বেচারা সত্যেনবাবু হন রতিকান্তের দুচক্ষের বিষ, তার প্রাণে জ্বলে মারাত্মক হিংসার আগুন। দেড় বছর ধরে ওত পেতে সে সুযোগ খুঁজতে থাকে। তারপর চরম সুযোগ পায় হতভাগ্য সত্যেনবাবুর 'কিউরিও' সংগ্রহের বাতিকের জন্যে। তিনি যখন বামন গাছটার উপরে হাত রেখে সেটা মন দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, খুব সম্ভব সেই সময়েই সে তাঁকে হত্যা করে, কিন্তু গাছের এক টুকরো যে ভেঙে তাঁর হাতের মুঠোর ভিতরে থেকে যায়, এতটা লক্ষ্য করে নি। তারপর পুলিসকে ভোলাবার জন্যে গভীর রাতে মৃতদেহ দূরে ফেলে দিয়ে আসে। আমি কিন্তু ভুলি নি, মৃতের হাতে সেই গাছের টুকরো দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে এমন কোন ঘরের মধ্যে, যেখানে সাজানো আছে একটা জাপানি বামন গাছ। এমন গাছ মাঠে-জঙ্গলে নয়, থাকে সাধারণত সৌখিন বাবুদের বৈঠকখানাতেই। এই জাপানি 'কিউরিও'র জন্যেই হয়েছে হত্যা, আবার এই জাপানি 'কিউরিও'ই ধরিয়ে দিলে হত্যাকারীকে! আপাতত আমার কথা ফুরুলো, এইবারে আমরা বিদায় নিতে পারি সুজনবাবু? কিন্তু দয়া করেই স্মরণ রাখবেন, সখের গোয়েন্দামাত্রই 'হবুচন্দ্র' খেতাব লাভের যোগ্য নয়!"

সুজন নতমুখে জোড়হাতে বললে, "মনে রাখব। মাপ করবেন।"

কামরার মামলা

ক

রাজা সাহেবের আমন্ত্রণে গিয়েছিলুম দেশীয় রাজ্য সেরাইকেলায়। সেখানকার

চৈত্র-পরবে বিখ্যাত 'ছউ' নাচ দেখবার জন্যে। জয়ন্ত এবং আমি—অর্থাৎ মাণিক।

সত্যসত্যই সে নৃত্যোৎসব দেখবার মত। সংস্কৃতে নৃত্যকে দেওয়া হয়েছে একরকম সঙ্গীতের মর্যাদা—কেননা তাকে বলা হয়েছে 'দৃশ্যসঙ্গীত', অর্থাৎ যে গান চোখে দেখা হয়। সেরাইকেলার নাচ দেখে এ নামের সার্থকতা বুঝতে পারলুম।

সেরাইকেলা থেকে বনজঙ্গল এবং এ-পাহাড় সে-পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে একটি পথ সর্পিল গতিতে এসে পৌঁচেছে সিনি জংশন স্টেশনে। সেখান থেকে ধরলুম কলকাতার ট্রেন। তখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। চাঁদের আলোয় মাখানো ছিল মধুযামিনীর স্বপ্ন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুখানা আসন 'রিজার্ভ' করাই ছিল। উপরকার 'বাঙ্কে' একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না। লোকটার গায়ের রং আমাদের চেয়ে কালো হলে কি হয়, আমাদের পোশাক দেখে বোধ করি তার কোট-পেন্টালুনের আভিজাত্যে আঘাত লাগল, কারণ আমরা কামরায় পদার্পণ করতেই সে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে অন্য পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

নীচেকার আসনের একটা কোণ অধিকার করে বসেছিলেন একটি হৃষ্টপুষ্ট লোক। ঠোঁটের উপরে তাঁর চার্লি চ্যাপলিন গোঁফ। সাজ-পোশাক দেখলে তাঁকে ফিরিঙ্গি বলে মনে হয়। তাঁর পাশেই উপবিষ্ট একটা কালো-মিশমিশে রোমশ কুকুর, তিনি আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

কুকুরটার দিকে আমি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি দেখে লোকটির মুখে ফুটল ঈষৎ হাসির রেখা।

আমি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওটা কোন্ জাতের কুকুর?"

—"চীনদেশের চৌ-চৌ কুকুর, ভারতে বড় একটা দেখা যায় না।"

তাঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে বুঝলুম, তিনি ফিরিঙ্গি নন।

গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে, হন্তদন্তের মত কামরায় এসে উঠলেন আর এক ভদ্রলোক। তাঁর বয়স পঞ্চাশের উপরে। আকারে মাঝারি, মাথায় অযত্নবিন্যস্ত কাঁচা-পাকা চুল, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, পরনে ধুতি আর পিরান, একহাতে একটি ছোট ব্যাগ ও আর এক হাতে একখানা মোটা কেতাব। চেহারা ও হাবভাব অতিশয় গম্ভীর।

ভদ্রলোক এসেই কুকুরের মালিকের পাশে গিয়ে বসে পড়লেন এবং তারপর অন্য কোনদিকে না তাকিয়েই হাতের বইখানার খানকয় পাতা উল্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তার দিকেই। লোকটি নিশ্চয়ই গ্রন্থকীট।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। জয়ন্ত জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

খ

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সমারোহের ভিতর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে, দিকে দিকে ফুটে উঠছে কবিত্বের ছবি। জয়ন্তের চোখ আর মন সেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দৃশ্যপট নিয়েই নিযুক্ত হয়ে রইল।

আমি ততক্ষণে কুকুরের মালিকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছি। তাঁর নাম ইন্দুলাল সিংহ। জাতে বিহারী এবং বিহারের আরো অনেকের মত তিনিও পরিষ্কার বাংলায় কথাবার্তা বলতে পারেন। কলকাতার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। কার্যসূত্রে আদ্রায় গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ধরেছেন কলকাতার ট্রেন।

তিনিও ছউ নাচ দেখেছেন শুনে তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে খানিক্ষণ আলোচনা হল। আমার মত ইন্দুবাবুরও ছউ নাচ খুব ভালো লেগেছে।

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে থামল টাটানগর স্টেশনে। উপরের 'বাঙ্ক' ছেড়ে নেমে পড়ে ফিরিঙ্গিটা কামরা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে কোন মোটঘাট নেই। বোধহয় সে রেলেই কাজ করে।

ইন্দুবাবু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "বাইরে যেন কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে না?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, একবার দেখে আসি।" সে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

গ্রন্থকীট মহাশয় নিজের কেতাব নিয়েই মেতে রইলেন, দুনিয়ার সব গোলমাল যেন তাঁর কাছে একেবারেই তুচ্ছ! বইখানার চক্‌চকে মলাটের উপরে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—'ওয়ার্কস্ অফ উইলিয়ম সেক্সপিয়র।'

গ

একটা দুর্ঘটনার সাড়া পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল সেই পুরাতন প্রশ্ন : জয়ন্ত কি চুম্বকের মত অপরাধীকে আকর্ষণ করে?

জয়ন্ত পেশাদার পুলিস নয়, সখের গোয়েন্দা মাত্র। তবু প্রায়ই দেখেছি, তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধ বা অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায়।

কোন অপরাধীর সন্ধানে আমরা এদিকে আসি নি। হালকা মনে এসেছিলুম

বেড়াতে আর নাচ দেখতে। কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল এক নিষ্ঠুর অপরাধের রক্তাক্ত নমুনা।

জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে যাবার পর আমিও জানলা-পথে মাথা গলিয়ে দেখলুম, স্টেশনে এক বৃহৎ জনতা শশব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি ও চেঁচামেচি করছে, প্রত্যেক লোকের মুখের ভাব রীতিমত ত্রস্ত! জনতার মধ্যে রয়েছে রেলপুলিসেরও অনেক লোক।

একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি মশাই?"

লোকটা দ্রুতপদে চলে যেতে যেতে বললে, "খুন হয়েছে, খুন!"

কথাটা গ্রন্থকীট মহাশয়েরও কানে গেল। তিনি চম্‌কে উঠে বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "কে খুন করলে কাকে?"

ইন্দুবাবু চৌ-চৌয়ের মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "ও প্রশ্নের জবাব দেবার লোক এখানে নেই।"

ভদ্রলোক বইখানা আবার মুখের সামনে তুলে ধরলেন।

খানিক পরে জয়ন্ত আবার ফিরে এল। তার মুখে যা শুনলুম তা হচ্ছে এই :

মারা পড়েছেন বুল্‌চন্দানি নামে এক সিন্ধী ভদ্রলোক। তিনি কলকাতার নামজাদা রত্ন-ব্যবসায়ী। ব্যবসা-সূত্রে চক্রধরপুরে এসে ফিরে যাচ্ছিলেন কলকাতায়। তাঁর অনুচর ছিল তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। সে টাটানগরে এসে প্রথম শ্রেণীর কামরায় আবিষ্কার করেছে মনিবের মৃতদেহ। রক্তে কামরা ভেসে যাচ্ছে এবং বুল্‌চন্দানির বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে একখানা ছোরা। কামরায় আর কেউ নেই।

অনুচর বলে, তার মনিবের সঙ্গে ছিল কয়েকখানা হীরা, মনিব্যাগ ও হাতঘড়ি। হীরা আর ঘড়ি অদৃশ্য। মনিব্যাগটা পড়ে আছে, কিন্তু তার ভিতরটা শূন্য।

জনৈক যাত্রী দেখেছে, ট্রেন যখন ধীরে ধীরে সিনি স্টেশনে প্রবেশ করছিল, তখন কোন লোক একটা কামরা থেকে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠেছিল এই গাড়িরই অন্য একটা কামরায়। রেল-পুলিসের লোক এখন প্রত্যেক কামরায় সেই লোকটাকে সন্ধান করছে।

ঘ

মিনিট তিন পরেই আমাদের কামরারও সামনে এসে দাঁড়াল জনকয়েক পুলিসের লোক।

একজন ইন্‌স্পেক্টার ভিতরে ঢুকে বললে, "আপনাদের টিকিট দেখি।"

আমরা টিকিট দেখালুম। টিকিট দেখে ইন্‌স্পেক্টারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে হুকুম দিলে কামরার ভিতরে খানাতল্লাসী চালাবার জন্যে।

পুলিসের লোকজনরা প্রথমে আমাদের মালপত্তর এবং তারপর প্রত্যেকের জামাকাপড় হাতড়ে দেখতে লাগল।

তারপর আচম্বিতে আমাদের চমকিত দৃষ্টির সামনে সেই গ্রন্থকীটের পকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা রক্তমাখা রুমালে জড়ানো একটা হাতঘড়ি!

ইন্‌স্পেক্টার কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার পকেটে এ ঘড়ি কেন?"

ভদ্রলোক প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হয়ে গেলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ইন্‌স্পেক্টার বললে, "ন্যাকামি রাখুন। জবাব দিন। এ ঘড়ি আপনার পকেটে এল কেমন করে?"

ভদ্রলোক হতভম্বের মত মাথা চুলকোতে চুলকোতে ক্ষীণস্বরে বললেন, "জানি না তো!"

—"বটে, জানেন না? আপনার রুমালে রক্ত কেন?"

—"ও রুমাল আমার নয়।"

—"চমৎকার সাফাই! আপনার নাম কি?"

—"গৌরীচরণ ঘোষাল।"

—"কোথায় থাকেন?"

—"খড়াপুরে।"

—"কি করেন?"

—"স্কুলমাস্টারি।"

—"এখানে কেন?"

—"সেরাইকেলায় আমার জামাই-বাড়ি। মেয়ের অসুখ শুনে দেখতে এসেছিলুম।"

—"তারপর যাবার সময়ে রোজগার করে ফিরে যাচ্ছেন? এখন হীরেগুলো কোথায় লুকিয়ে ফেলেছেন বলুন দেখি?"

—"মশাই, আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!"

—"চোপরাও বদমাইস! পুলিসের কাছে এ-সব ধড়িবাজি খাটবে না! এই সেপাই, আসামীর হাতে হাতকড়ি দিয়ে ফাঁড়িতে নিয়ে চল।"

ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে গৌরীবাবু কেঁদে ফেললেন। কিন্তু পুলিসের কাছে চোখের জল ব্যর্থ। তাঁকে পাহারাওয়ালাদেরই সঙ্গে যেতে হল।

৬

আরো বেশ খানিকক্ষণ পরে ট্রেন আবার চলতে শুরু করল।

এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় প্রথম কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। তারপর ইন্দুবাবু বললেন, "এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার! লোকটির বাইরের পরিচয় নিরীহ স্কুলমাস্টার, আর তার পকেটেই পাওয়া গেল কিনা চোরাই মাল! মানুষ চেনা কি কঠিন!"

জয়ন্ত এতক্ষণ গুম্ হয়ে বসে একমনে কি যেন চিন্তা করছিল, ইন্দুবাবুর কথা শুনে মুখ তুলে মৃদু হাস্য করলে।

আমি বললুম, "সত্য কথা। গৌরীবাবুর ভিতর থেকে হত্যাকারীর চেহারা আবিষ্কার করা অসম্ভব বলাও চলে।"

জয়ন্ত বললে, "না মাণিক, অসম্ভব নয়! আকৃতির উপরে প্রকৃতি নির্ভর করে না। সুন্দর দেহেও বাস করতে পারে অসুন্দর মন। ধর, এই গাড়িতে আছি আমরা তিনজন—তুমি, আমি, ইন্দুবাবু। আমাদের দেহ সবাই দেখছে, কিন্তু আমাদের মন কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ মনই হচ্ছে ক্রিয়ার কর্তা, দেহ উপলক্ষ মাত্র। তোমার বা আমার বা ইন্দুবাবুর মন কি করতে পারে, বাহির থেকে সেটা জানবার উপায় নেই।"

ইন্দুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "না মশাই, খানকয় হীরার লোভে আমার মন কোনদিনই নরহত্যা করতে চাইবে না। তবে আপনি যা বললেন, যুক্তিসঙ্গত। মন হচ্ছে রহস্যময়। নিরীহ স্কুলমাস্টারেরও মনে খুন করবার প্রেরণা জাগে।"

জয়ন্ত আর কিছু না বলে বাইরের দিকে মুখ ফেরালে। ধু-ধু প্রান্তর পরিণত হয়েছে যেন বিরাট জ্যোৎস্না-সরোবরে। মাঝে মাঝে তার দেখা যাচ্ছে যেন তালীকুঞ্জের স্বপ্নদ্বীপ।

ইন্দুবাবু আসন ত্যাগ করে বাথরুমের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

চীনা চৌ-চৌ কুকুরটা এতক্ষণ পরে আমাদের দিকে তদারক করতে এল। একবার আমার আর একবার জয়ন্তের পা শুঁকে পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল হল বোধ হয় সন্তোষজনক।

কুকুরটা বড়ই আদুরে। জয়ন্ত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে তার জানুর উপরে দুই পা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। আমি তার জন্যে কিছু খাবারের খোঁজে টিফিন-বাক্সটা খুলে ফেললুম। আমিও কুকুর ভালোবাসি।

এমন সময়ে ইন্দুবাবু বাথরুমের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ধমক দিয়ে ডাকলেন, "জনি, জনি!"

কুকুরটা ছুটে গেল মনিবের কাছে।

ইন্দুবাবু সচমকে বলে উঠলেন, "জনি, তোর বগ্‌লস্‌টা কোথায় গেল?"

জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, "আমার কাছে।"

—"কেন?"

—"বগ্‌লস্‌টা পরীক্ষা করছি।"

—"মানে?"

—"দেখছি এটা অসাধারণ বগ্‌লস, ফরমাশ দিয়ে তৈরি। এর ভিতরটা ফাঁপা।"

হঠাৎ ইন্দুবাবুর মুখের উপর থেকে সরে গেল শান্ত ভদ্রতার আবরণ এবং সেখানে ফুটে উঠল তাঁর হিংস্র মনের কুৎসিত আভাস! ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "আপনি কি বলতে চান?"

জয়ন্ত কিছুই বলতে চাইলে না, কেবল বগ্‌লস্‌টা নিয়ে আসনের গদীর উপর ঝাড়তে লাগল।

বিদ্যুতের মত চাকচিক্য নিয়ে গদীর উপরে ঝরে পড়ল কয়েক খণ্ড স্ফটিক! চোরাই হীরা!

ভীষণ এক চীৎকার করে ইন্দুবাবু জয়ন্তের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে উঠে এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, "আমার পরিচয় তুমি জানো না। চুপ করে বসে থাকো। মাণিক, গাড়ি পরের স্টেশনে থামলেই তুমি নেমে গিয়ে পুলিস ডেকে আনবে। বুল্‌চন্দানিকে খুন করেছে এই ইন্দু।"

চ

ট্রেন আবার ছুটছে। কামরার ভিতরে কেবল আমি ও জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলতে লাগল, "ইন্দু নিশ্চয়ই পুরাতন পাপী, নরহত্যা ও চুরির জন্যে সে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল।

"পুলিস খুব সহজে টোপ্ গিলেছে। রক্তাক্ত রুমাল আর হাতঘড়ির উপরে নির্ভর করে গৌরীবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু আমি এত সহজে ভুলি নি। কারণ তার আগেই আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলুম।

"নিহত বুল্‌চন্দানির কামরায় গিয়ে রক্তাক্ত মেঝের উপরে আমি দেখেছিলুম কুকুরের কয়েকটা পদচিহ্ন। সে কামরায় কোন কুকুর ছিল না, তবে সেই পদচিহ্ন কোথা থেকে এল? নিশ্চয়ই কুকুর ছিল হত্যাকারীর সঙ্গে!

"বুঝতেই পারছ, তারপর থেকেই আমার সন্দেহ আকৃষ্ট হয়েছিল কার দিকে? ইন্দুর কুকুরই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে!

"ইন্দু যখন বাথরুমে যায়, তখন আমি তার কুকুরটাকে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম, তার থাবায় রয়েছে রক্তের দাগ! আমার সন্দেহ পরিণত হল দৃঢ় ধারণায়।

"বুঝলুম, ইন্দুই পুলিসকে বিপথে চালনা করবার জন্যে বেচারা গৌরীবাবুর পকেটে হাতের কায়দায় চালিয়ে দিয়েছিল রুমাল ও ঘড়িটা।

"কিন্তু আসল চোরাই মাল গেল কোথায়? পুলিসের খানাতল্লাসীর ফলে ইন্দুর কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় নি। আর চোরাই মাল না পেলে ইন্দুর বিরুদ্ধে কোন মামলাই রুজু করা চলবে না।

"তখন আমার লক্ষ্য পড়ল কুকুরটার বগ্‌লসের উপরে। সেটা বিশেষ কৌশলে তৈরি ফরমাশী বগ্‌লস্‌। ভিতরটা ফাঁপা। হাতের চাপ দিয়ে অনুভব করলুম তার মধ্যে রয়েছে কতকগুলো কঠিন জিনিস।

"তারপর আর কিছু বলা বাহুল্য।"

ডবল মামলার হামলা

আজকের প্রাতরাশটা হয়েছিল পুরোদস্তুর পূর্ণভোজনের সামিল। চায়ের পেয়ালায় অন্তিম চুমুক দিয়ে এবং একটি আরামসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করে একটা মোটাসোটা চুরোট ধরিয়ে ফেললেন ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু।

দৈনিক প্রভাতী খানাপিনার অব্যবহিত পরেই উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের ভার ছিল আমার উপরে। আমি সামনের টেবিলের উপর থেকে টেনে নিলুম খবরের কাগজখানা।

জয়ন্ত বার করলে তার রুপোর শামুকের নস্যদানী। সে একটিপ নস্য নাসিকার সাহায্যে আকর্ষণ করতেই সুন্দরবাবু বিকৃত মুখে বলে উঠলেন, "হুম্‌! তোমার ঐ নোংরা সেকেলে নেশাটা তুমি কি কস্মিন্‌কালেও ছাড়তে পারবে না হে?"

জয়ন্ত বললে, "কে বলে নস্য সেকেলে নেশা? সব ব্যাপারেরই উঠতি-পড়তি আছে, নস্যেরও রেওয়াজ মাঝে কিছু কমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নস্যের চলন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। আপনি জানেন কি; এক ইংলণ্ডেই বৎসরে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার নস্য তৈরি হয়?"

হুস্‌ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্‌, বল কি হে? খামকা আধকোটি পনের লাখ টাকা নস্যাৎ! বড়ই বড়ই, বড়ই অন্যায়!"

—"তারপর শুনুন। নস্য নোংরা নয় মশাই, নস্য হচ্ছে রাজকীয় নেশা, তার আভিজাত্য অতুলনীয়। নস্যের উৎপত্তি আমেরিকায়, পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় বার সেখানে গিয়ে কলম্বাস তার ব্যবহার দেখে এসেছিলেন। ষোল শতাব্দীতে নস্যের আমদানি হয় য়ুরোপে। তারপর সেখানকার বড় বড় রাজা, রানী, সেনাপতি, আমীর-ওমরাও, রাজনৈতিক, কবি, শিল্পী, অভিনেতা—এমন কি সাধুসন্ন্যাসী পর্যন্ত নস্যের সেবাইত হয়ে পড়েন। আমি তো তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের মতন ব্যক্তিও ছিলেন নস্যগত প্রাণ। তাঁর সোনার নস্যদানী ছিল অসংখ্য, সেগুলিরও মোট দাম হবে লক্ষাধিক টাকা। নস্যের এত কদর কেন শুনবেন?"

সুন্দরবাবু গাত্রোত্থান করে বললেন, "না ভাই, এখন আমার নস্য-কাহিনী শোনবার ফুরসৎ নেই।"

—"কেন, ত্বরা কিসের?"

—"তদন্ত।"

—"কিসের তদন্ত?"

—"আত্মহত্যার। এক ভদ্রলোক পুত্রশোকে আত্মহত্যা করেছেন। বিশেষ হন্তদন্ত হতে হবে না, কারণ জোর-তদন্ত নয়, একান্ত সহজ মামলা। তবু একবার যেতে হবে।"

—"আপনার হাতে ঐ খামখানা কিসের?"

—"এর মধ্যে ঘটনাস্থলের আর লাসের খানকয় ফোটো আছে।"

—"একবার দেখি না!"

ফোটোগুলো নিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে যেন নিজের মনেই বললে, "মৃতদেহের ডানহাতে রয়েছে একটা রিভলভার। ঐটেই বোধহয় আত্মহত্যার অস্ত্র। ডানহাতের মণিবন্ধে দেখা যাচ্ছে একটা হাতঘড়িও।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কোন কোন খেয়ালী লোকের ডানহাতেই থাকে হাতঘড়ি।"

—"তা থাকে বটে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে একটু বেশিরকম খেয়ালী বলেই মনে হচ্ছে।"

—"এ কথা বলছ কেন?"

—"মৃতদেহের সামনে রয়েছে দাবা-বোড়ের ছক। কয়েকটা ঘুঁটি এখনো ছকের উপরে সাজানো আছে। তাহলে কি আত্মহত্যার আগে ভদ্রলোক দু-এক চাল দাবা খেলে নিয়ে সখ মিটিয়ে ছিলেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। কারণ

মামলাটার প্রাথমিক তদন্তে গিয়েছিলেন আমার এক সহকারী। তবে ভদ্রলোক যে রিভলভারের গুলিতে মারা পড়েছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। গুলিটা তাঁর বক্ষ ভেদ করে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই বুলেটটাও পাওয়া গিয়েছে।"

—"রিভলভার আর বুলেটটা দেখবার জন্যে আগ্রহ হচ্ছে।"

—"এখনি দেখাতে পারি, আমার গাড়ির ভিতরেই আছে।"

সুন্দরবাবুর হুকুমে একজন পাহারাওয়ালা একটা ছোট ব্যাগ এনে দিয়ে গেল। তার মধ্যে ছিল ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া রিভলভার, বুলেট ও আরো কোন কোন জিনিস।

জয়ন্ত খুব মন দিয়ে রিভলভার ও বুলেটটা পরীক্ষা করলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, মামলাটা মোটেই সহজ নয়!"

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "তার মানে? তোমার কথায় সোজাও বাঁকা হবে নাকি?"

—"রিভলভারটার মালিক ছিলেন তো মৃত ব্যক্তিই?"

—"তাইতো শুনেছি।"

—"তাহলে এটা হচ্ছে বড়ই জটিল মামলা। এ সম্বন্ধে আপনি আরো যা জানেন, শুনতে পেলে সুখী হব।"

অতঃপর জয়ন্তের অন্বেষণার ফলে নতুন যে রহস্যনাট্যের যবনিকা উঠে গেল, তা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত। একটা একান্ত সাধারণ মামলা কেবল অসাধারণ হয়েই উঠল না, তার উপরে আরোপিত হল আর একটা এমন নতুন ও রোমঞ্চকর মামলা, যা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর!

*　　*　　*　　*

সুন্দরবাবু বললেন, "ভাই জয়ন্ত, মামলাটা নিয়ে এখনো আমি মাথা ঘামাবার সময় পাই নি। আজ দু'দিন সর্দিজ্বরে পড়ে আমি বিছানা নিয়েছিলুম। প্রাথমিক তদন্তের পর আমার সহকারী যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেটুকু ছাড়া আর কিছুই জানি না। শোনো—

"যিনি আত্মহত্যা করেছেন তাঁর নাম রবীন্দ্রনারায়ণ রায়। বয়স পঞ্চান্ন। তিনি দক্ষিণ বাংলার এক জমিদার। দেশ ছেড়ে উত্তর-কলকাতায় বাস করতেন। বিপত্নীক। তাঁর একমাত্র সন্তান সত্যেন্দ্র গত মাসে কলেরা রোগে মারা গিয়েছেন। প্রকাশ, তারপর থেকেই রবীন্দ্রবাবু অত্যন্ত মন-মরা হয়ে থাকতেন এবং তাঁর আত্মহত্যার আসল কারণও নাকি ঐ পুত্রশোক।

"রবীন্দ্রবাবুর এক সহোদর দেশেই থাকতেন, কিন্তু তিনিও এখন পরলোকে

এবং তাঁরও একমাত্র পুত্র দীনেন্দ্রনারায়ণই এখন রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বনিবনাও ছিল না, সম্পত্তি-সংক্রান্ত মতানৈক্যই নাকি এই মনোমালিন্যের কারণ।

"রবীন্দ্রবাবুর বাড়ি ত্রিতল। একতলা ব্যবহার করে জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীরা এবং পাচক, দ্বারবান, দাসদাসী ও অন্যান্য লোকজন। দোতালায় বৈঠকখানা এবং তাঁর মৃত পুত্রও সেখানে থাকতেন। ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নগৃহ ছাড়া আর কোন ঘর নেই।

"পর্শু গিয়েছে কালীপুজোর রাত্রি। শরীর সুস্থ ছিল না বলে রবীন্দ্রবাবু সেদিন সন্ধ্যার পরেই ত্রিতলে উঠে যান এবং পরদিনের সকালেই ঘরের ভিতরে পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ। ঘরের দরজা খোলাই ছিল—যদিও তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রবাবুর দরজা খুলে শয়ন করার অভ্যাস ছিল না?

"বাড়ির লোকজনরা বলে, রবীন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল বলে সন্ধ্যার পর আর কোন লোক সেদিন ত্রিতলের ঘরে যায় নি। অন্যান্য দিনেও সে ঘরে একজন ছাড়া আর কোন বাইরের লোকের প্রবেশ করবার অধিকার ছিল না। সেই একজন হচ্ছেন সত্যানন্দ বসু, রবীন্দ্রবাবুর প্রধান ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অন্য পাড়ার বাসিন্দা, প্রায়ই রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন। রবীন্দ্রবাবুর দাবাখেলার সখ ছিল অত্যন্ত প্রবল, সত্যানন্দবাবুর আবির্ভাব হলেই দুজনে দাবার ছক পেতে বসে যেতেন। কিন্তু সবাই একবাক্যে বলেছে, ঘটনার দিন সত্যানন্দবাবু একবারও সেই বাড়িতে পদার্পণ করেন নি।

"নিজের হাতে রিভলভার ছুঁড়ে রবীন্দ্রবাবু আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু বাড়ির কেউ রিভলভারের শব্দ শুনতে পায় নি; অন্তত শুনতে পেলেও বুঝতে পারে নি, কারণ সেদিন ছিল কালীপুজো,—বোমার ও বাজীর দুমদাম শব্দে সারা সহর হয়ে উঠেছিল মুখরিত। রবীন্দ্রবাবুর ভাইপো দীনেন্দ্র খবর পেয়ে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন। সত্যানন্দবাবুকেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। আজ তদন্তে গিয়ে আমি প্রথমেই তাঁদের এজাহার গ্রহণ করব।"

জয়ন্ত বললে, "আমিও যদি সঙ্গে যাই, তাহলে আপনার কোন আপত্তি আছে?"

—"মোটেই না, মোটেই না! মাণিকও যেতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত, হঠাৎ তোমার এই আগ্রহের কারণ কি? কোন সূত্র-টুত্র পেয়েছ নাকি?"

—"যথাসময়েই জানতে পারবেন।"

—"ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরেছে! এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন বাবা?"

জয়ন্ত জবাব দিলে না।

*   *   *   *

রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ি। সদর দরজায় পুলিস পাহারা।

দোতলার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট দুই ভদ্রলোক। একজন প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচা-পাকা লম্বা চুল, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, চোখে কালো চশমা, দোহারা চেহারা, পরনে পাঞ্জাবী ও পায়জামা। একান্ত বিষণ্ণ ভাবভঙ্গি!

আর একজন যুবক, বয়স বাইশের বেশি নয়, সুশ্রী, ফরসা, একহারা দেহ, জামাকাপড়ে বাবুয়ানার লক্ষণ। মুখ-চোখ ভাবহীন।

যুবকের দিকে তাকিয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, "আপনিই বোধহয় দীনেন্দ্রবাবু?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আর উনি?"

—"সত্যানন্দবাবু—আমার জ্যাঠামশাইয়ের বিশেষ বন্ধু।"

—"উত্তম। বাড়ির আর সবাইকে ডাকুন, আমি সকলের এজাহার নেব।"

সকলেরই আবির্ভাব। একে একে প্রত্যেকেই এজাহার দিলে। বিশেষ কোন নতুন তথ্য প্রকাশ পেল না।

এইবারে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দীনেন্দ্রবাবু, আপনার জ্যাঠা কি ন্যাটা ছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তার বাঁ হাতই বেশি চলত।"

—"তাই তিনি ডানহাতেই কবজী-ঘড়ি ব্যবহার করতেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনাদের মনোমালিন্যের কারণ কি?"

কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে দীনেন্দ্র বললে, "মনোমালিন্যের উৎপত্তি হয় তিনটি মুক্তার জন্যে।"

—"তিনটি মুক্তা?"

—"হ্যাঁ, তিনটি মহামূল্যবান মুক্তা।"

—"ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।"

—"বুঝিয়ে বলছি। আমার প্রপিতামহ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্যেই আমাদের বংশের সমৃদ্ধি আরম্ভ হয়। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে তিনি ইংরেজ ফৌজে রসদ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী হয়ে পশ্চিম ভারতে গিয়েছিলেন। সেই দেশব্যাপী অশান্তির আর বিশৃঙ্খলার যুগে কি উপায়ে জানি না, তিনি প্রচুর ধনদৌলতের মালিক হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ছিল তিনটি অপূর্ব ও অমূল্য মুক্তা—শুনেছি তিনি তা পেয়েছিলেন কোন ভাগ্যহীন নবাবের কাছ থেকে। মুক্তা

তিনটি আমিও দেখেছি। দুটির আকার পায়রার ডিমের মত, একটি আরো বড়। তেমন বড় বড় মুক্তা আমি আগে কখনো দেখি নি, আজকের বাজারে তাদের দাম অন্তত দুই আড়াই লক্ষ টাকাও হতে পারে। এই মুক্তা তিনটি আমার পিতামহের অধিকারে আসে উত্তরাধিকারসূত্রে। তারপর আমার জ্যাঠামশাই আর আমার পিতা দুজনেরই দাবি ছিল তাদের উপরে। কিন্তু জ্যাঠামশাই আমার বাবার দাবি অগ্রাহ্য করে বলেন, তাঁর বাবা ঐ মুক্তা তিনটি কেবল তাঁকেই দিয়ে গিয়েছেন। এই নিয়েই প্রথমে মনোমালিন্য, তারপর মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, "বটে, এমন ব্যাপার! সেই মুক্তা তিনটি এখন কোথায় আছে?"

—"শুনেছি জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরে লোহার সিন্দুকে। কিন্তু সে ঘর তো এখন পুলিসের জিম্মায়।"

সুন্দরবাবু করলেন একটি নিষ্ঠুর প্রশ্ন "তাহলে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর ফলে আপনিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন?"

দীনেন্দ্র বিরক্ত মুখে বললে, "লাভ-লোকসানের হিসাব এখনো আমি খতিয়ে দেখি নি মশাই!"

—"কিন্তু পুলিস তা দেখতে বাধ্য।"

—"দেখুক।"

জয়ন্ত এইবারে সত্যানন্দের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর জন্যে আপনি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন।"

সত্যানন্দ করুণ স্বরে বললেন, "কাতর হব না? তিনি আর আমি ছিলুম হরিহর আত্মার মত, বহু সুখ-দুঃখের দিন আমাদের একসঙ্গে কেটে গিয়েছে।"

—"তাহলে আপনারা ছিলেন পুরাতন বন্ধু?"

—"না, ঠিক তা বলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় বছর চারেক আগেই। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে ওঠে পুরাতন বন্ধুত্বের মতই।"

—"রবীন্দ্রবাবু আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে ভালোবাসতেন?"

—"হ্যাঁ, আমি এলেই তিনি পাড়তেন দাবার ছক।"

—"রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর দিনেও তাঁর সঙ্গে আপনি দাবা খেলেছিলেন?"

—"আজ্ঞে না, সেদিন আমি নিজের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেই পারি নি।"

—"কেন?"

—"অসুস্থতার জন্যে। উদরাময়।"

—"কিন্তু সেদিনও সন্ধ্যার সময়ে বা পরে রবীন্দ্রবাবু দাবা খেলেছিলেন।"

অত্যন্ত বিস্মিতের মত সত্যানন্দ নিজের দীর্ঘ দাড়ির ভিতরে অঙ্গুলিচালনা করতে করতে বললে, "কেমন করে জানলেন?"

—"তাঁর মৃতদেহের সামনে পাতা ছিল দাবার ছক আর সেই ছকের উপরে সাজানো ছিল গোটাকয়েক ঘুঁটি।"

—"ও, তাই বলুন। তা হতে পারে। যারা দাবা খেলতে অভ্যস্ত, তারা মাঝে মাঝে নতুন চালের কৌশল আবিষ্কার করবার জন্যে একা একাই ছকে ঘুঁটি সাজিয়ে বসে।"

—"ঠিক। সেটা আমিও জানি। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।"

* * * *

সুন্দরবাবু সদলবলে প্রথমে বাড়ির একতালার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর দ্বিতল। চারখানা বাস করবার ঘর, তারপর পাইখানা ও গোসলখানা। বাইরের দিকে একফালি বারান্দা থেকে লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা বোধহয় মেথরের ব্যবহারের জন্যে?"

দীনেন্দ্র বললে, "হ্যাঁ।"

—"নিচের শুঁড়ীগলিটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?"

—"বাড়ির বাইরেকার হাতায়।"

—"কোন লোক যদি সদর দরজার বদলে ঐ শুঁড়ীগলি দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় ওঠে, তাহলে বাড়ির লোক তাকে দেখতে পাবে না,—তাই নয় কি?"

—"হ্যাঁ।"

তারপর ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নকক্ষ। তালাবন্ধ দরজার চাবি ছিল পুলিসের কাছে। দরজা খুলে সকলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে খাট, একদিকে ড্রেসিং টেবিল, একদিকে একটা প্রকাণ্ড আলমারি এবং একদিকে একটা ভারি, সেকেলে ডালা-দেওয়া লোহার সিন্দুক। খান দুই চেয়ার। কার্পেট-মোড়া মেঝের উপরে ছোট বিছানা পাতা। গুটি দুই তাকিয়া।

মৃতদেহ 'মর্গে' পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মেঝের বিছানার একাংশে ও একটা তাকিয়ার উপরে রয়েছে শুক্‌নো রক্তের ছোপ। বিছানার মাঝখানে দাবার ছক, তার উপরে ও আশেপাশে কতকগুলো ঘুঁটি।

সুন্দরবাবু বললেন, "দীনেন্দ্রবাবু, এইবারে আপনি সিন্দুক খুলে মুক্তো-টুক্তো কি আছে বার করুন। আমরা এখনো সিন্দুক পরীক্ষা করি নি। এই নিন রবীন্দ্রবাবুর চাবির গোছা, এটা লাশের পাশেই পাওয়া গিয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "সাবধান দীনেন্দ্রবাবু, আপনি সিন্দুকের হাতলে হাত দেবেন না, চাবিটা আমাকে দিন, আমিই সিন্দুক খুলছি।"

সুন্দরবাবু কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্তের চোখের ইশারা দেখেই তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

সিন্দুকের মধ্যে তথাকথিত একটিমাত্র মুক্তাও আবিষ্কৃত হল না। পরিবর্তে পাওয়া গেল একতাড়া দলিল দস্তাবেজ, অন্যান্য কাগজপত্র, একশো টাকার বারোখানা নোট, কতকগুলো পুরাতন মোহর ও কিছু খুচরো টাকা প্রভৃতি।

দীনেন্দ্র বললে, "কি আশ্চর্য, মুক্তাগুলো কে নিলে?"

সত্যানন্দ বললেন, "কে আবার নেবে বাবা? তোমার জ্যাঠা ছেলের শোকে আত্মঘাতী হয়েছেন, বাইরের কেউ এখানে আসে নি। চোর এলে কি অতগুলো টাকা আর মোহর সিন্দুকের ভিতরেই ফেলে রেখে যেত?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঠিক কথা। পায়রার ডিমের মত ডাগর ডাগর মুক্তো যদি রূপকথার অশ্বডিম্ব না হয়, তাহলে সেগুলো অন্য কোথাও লুকানো আছে, খুঁজে দেখতে হবে।"

সুন্দরবাবুর গা টিপে দিয়ে জয়ন্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পিছু পিছু গিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "আবার গা-টেপাটেপি কেন? তোমার আবার কি গুপ্তকথা?"

—"সিন্দুকের হাতলে কারুর আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করে দেখুন।"

—"মানে?"

—"পরে বুঝবেন।"

* * * *

দিন দুই পরে 'দুরভাষে'র মধ্যস্থতায় শ্রুতিগোচর হল থানায় বিরাজমান সুন্দরবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ঃ "হ্যালো! জয়ন্ত? শোনো। তুমি যা বলেছ তাই!"

—"আমি কি বলেছি?"

—"রবীন্দ্রনারায়ণ রায় আত্মহত্যা করেন নি।"

—"নবীন সহকারীর রিপোর্টের উপর নির্ভর না করে একটু মাথা ঘামালে আপনিও এটা বুঝতে পারতেন।"

—"আমি কিন্তু তোমারও চেয়ে বড় একটা আবিষ্কার করেছি।"

—"আপনাকে অভিনন্দন দিচ্ছি।"

—"তারপর থেকে আমার অবস্থা হয়েছে কি-রকম জানো? যাকে বলে একেবারে সসেমিরা!"

—"ভাবনার কথা।"

—"সব শুনলে তোমারও আক্কেল-গুড়ুম হয়ে যাবে।"

—"ভয়ের কথা।"

—"ফোন ছেড়ে সবেগে থানায় ছুটে এস।"

—"যথা আজ্ঞা।"

থানায় গিয়ে আমরা দেখলুম, সুন্দরবাবু তখনও উত্তেজিত ভাবে ঘরের ভিতরে পদচালনা করছেন।

—"ভো সুন্দরবাবু, অতিথি হাজির। আপনার সন্দেশ পরিবেশন করুন।"

—"তিষ্ঠ ক্ষণকাল। রবীন্দ্রবাবু যে আত্মহত্যা করেন নি, সেটা তুমি কেমন করে ধরতে পারলে আগে সেই কথাই বল।"

—"দেখলুম মৃতের ডানহাতে রয়েছে হাতঘড়ি। কোন কোন খেয়ালী ব্যক্তি ডানহাতেও ঘড়ি ধারণ করে বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম। সাধারণত যারা ন্যাটা, অর্থাৎ ডানহাতের কাজ সারে বামহাতে, তারাই হাতঘড়ি ব্যবহার করে ডানহাতে। অতএব ধরে নিলুম রবীন্দ্রবাবু ন্যাটা। সেক্ষেত্রে বামহাতে রিভলভার নিয়েই তাঁর আত্মহত্যা করবার কথা। কিন্তু রিভলভার ছিল তাঁর ডানহাতে। তাই দেখেই প্রথমে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়। কিন্তু তা হচ্ছে সামান্য সন্দেহ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।"

—"বেশ, তারপর?"

—"তারপর দেখলুম মৃতের সামনে দাবার ছক। যে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত, তার মনের অবস্থা হয় ভয়ানক অস্বাভাবিক, তার দাবা খেলবার বা নতুন চাল আবিষ্কার করবার সখ কিছুতেই হতে পারে না। রবীন্দ্রবাবু নিশ্চয় সেদিন সহজ আর স্বাভাবিক মন নিয়েই আর কারুর সঙ্গে দাবা খেলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, আত্মহত্যার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। সুতরাং—"

—"সুতরাং তোমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল, কেমন এই তো?"

—"হ্যাঁ। তারপর রিভলভার আর বুলেট দেখেই নিঃসন্দেহে আমি বুঝতে পারলুম যে, এটা হচ্ছে আত্মহত্যার নয়, নরহত্যার মামলা। রবীন্দ্রবাবুর হাতের রিভলভারটা ছিল ২২-ক্যালিবারের ছোট রিভলভার, তার ভিতর থেকে ৩৮-ক্যালিবারের বুলেট নির্গত হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ যে বুলেটটা হয়েছে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর কারণ, সেটা বেরিয়েছে কোন ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভার থেকে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাহলে হত্যার কারণ চুরি?"

—"সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

—"তবে সিন্দুকের ভিতর থেকে টাকা আর মোহরগুলো চুরি যায় নি কেন?"

—"এই খুনে-চোর হচ্ছে অতিশয় চতুর। সে পুলিসকে ভুল পথে চালাতে চায়। সে লাভ করতে চায় তিন-তিনটি মহামূল্যবান্ অতুলনীয় মুক্তো, তার কাছে কয়েক শত টাকা তুচ্ছ। সে দেখাতে চায় চুরি বা হত্যা করবার জন্যে কেউ ঘটনাস্থলে আসে নি। তাই রবীন্দ্রবাবুর হাতে তাঁর নিজের রিভলভার গুঁজে দিয়ে আর টাকাগুলো ফেলে রেখে গিয়েছে। তাড়াতাড়িতে ভেবে দেখতে পারে নি যে, ন্যাটা রবীন্দ্রবাবুর ডান হাতে রিভলভার থাকতে পারে না—বিশেষত ২২-ক্যালিবারের রিভলভার। তার আরো একটা মস্ত ভ্রম হয়েছে। দাবার ছক আর ঘুঁটি সে তুলে রেখে যায় নি। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই এমনি সব ছোটখাটো ত্রুটি থেকে যায় বলেই হত্যাকারী শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে না।"

—"জয়ন্ত, অনেক কথাই তো তুমি ভেবে দেখেছ। কিন্তু তুমি কি বলতে পারো, হত্যাকারী কে?"

—"বাড়ির লোকদের কথা মানলে বলতে হয়, বাহির থেকে কোন ব্যক্তিই সেদিন বাড়ির ভিতরে আসে নি। অথচ সেদিন রবীন্দ্রবাবুর পরিচিত কোন লোক তাঁর সঙ্গে দাবা খেলেছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, সেই খেলোয়াড় ব্যক্তি কে?"

—"আমি জানি সে কে!"

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, "আপনি জানেন!"

—"নিশ্চয়! তোমার আগে আমিই তাকে আবিষ্কার করেছি।"

—"বাহাদুর! কিন্তু কে সে?"

—"বাড়ির কেউ নয়।"

—"দীনেন্দ্র?"

—"না।"

—"সত্যানন্দ?"

—"সেও নয়।"

—"তবে?"

—"তার নাম নফরচন্দ্র প্রামাণিক।"

* * * *

স্তব্ধভাবে স্থির হয়ে বসে রইল জয়ন্ত—নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত। কিন্তু মস্তিষ্ক চালনা করতে লাগল তুরন্ত গতিতে। তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, "বুঝেছি। আপনার এই আবিষ্কারের মূলে আছে আমারই অভিভাবন।"

—"অভিভাবন! সে আবার কি চীজ্?"

—"Suggestion-এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে অভিভাবন।"

—"মাথায় থাক্ আমার বাংলা পরিভাষা, এর চেয়ে ইংরেজীই ভালো। কিন্তু আমার আবিষ্কারের সঙ্গে তোমার Suggestion-এর সম্পর্ক কি?"

—"আমি কি আপনার কাছে প্রস্তাব করি নি যে, রবীন্দ্রবাবুর লোহার সিন্দুকের হাতলটা আঙুলের ছাপের জন্যে পরীক্ষা করা হোক্?"

—"তা করেছিলে।"

—"তা করা হয়েছে কি?"

—"হুঁ।"

—"আর তারই ফলে বোধ করি তথাকথিত নফরচন্দ্র প্রামাণিক নামধেয় ব্যক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে?"

সুন্দরবাবু ফিক্ করে হেসে ফেলে বললেন, "ভায়া হে, তোমার উপরে টেক্কা মারা অসম্ভব দেখছি! হ্যাঁ ঠিক তাই! সিন্দুকের হাতলে ছিল আঙুলের ছাপ। পুলিসের 'ফাইলে' সেই আঙুলের ছাপের জোড়া পাওয়া গেছে। সে ছাপ হচ্ছে নফরচন্দ্র প্রামাণিকের।"

—"ঐ মহাপুরুষের পরিচয় কি?"

—"অতিশয় চিত্তোত্তেজক। পুলিসের কাছে রক্ষিত অপরাধীদের ইতিহাসে দেখি, সাত বৎসর আগে নফরচন্দ্র একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উপযোগী প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তার পর-বৎসরেই দু-দুটো খুন আর অর্থলুণ্ঠন করে সে আবার অভিযুক্ত হয় রাহাজানির মামলায়। বিচারে তার প্রতি পনের বৎসর কারাবাসের হুকুম হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে সে জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। সেই থেকেই নফরচন্দ্র ফেরার। যে তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

—"আপনি তাকে দেখেছেন।"

—"না, তার কোন মামলাই আমার হাতে আসে নি।"

—"নফরচন্দ্র যখন দাগী আসামি, পুলিসের কাছে নিশ্চয়ই তার ফোটো আছে?"

—"আছে বৈকি! এই নাও।"

শ্মশ্রুগুম্ফহীন এক সাধারণ চেহারার লোক—সুশ্রী বা কুশ্রী কিছুই বলা যায় না, কেবল জোড়াভুরুর তলায় দুই চক্ষু দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন ক্রূরতার আভাস। বয়স হবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।

সুন্দরবাবু অভিযোগপূর্ণ স্বরে বললেন, "আত্মহত্যার মামলা হয়ে দাঁড়ালো নরহত্যার মামলা! তার সঙ্গে এল আবার তিন-তিনটে হত্যাকাণ্ডের নায়ক ফেরারী

নফরচন্দ্রের মামলা! বাপ রে, এখন এই ডবল মামলার হামলা একলা সামলাই কেমন করে? নফরের মত ধড়িবাজের পাত্তা পাওয়া কি সোজা কথা? পুলিসের কেউ যা পারে নি, আমি তা পারব কেন?"

তীক্ষ্ণনেত্রে নফরচন্দ্রের ফোটোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার বক্‌বকানি থামান। এখানে স্বচ্ছ কাগজ আছে?"

—"স্বচ্ছ কাগজ?"

—"হ্যাঁ, ইংরেজীতে যাকে বলে ট্রেসিং পেপার!"

—"মরছি নিজের জ্বালায়, এখন তোমার ঐ সব ছাঁকা বাংলা বুলি ভালো লাগছে না! কেন, সোজাসুজি বলতে পারো না কি—ট্রেসিং পেপার চাই? তা থাকবে না কেন? কিন্তু ও জিনিস নিয়ে তোমার আবার কি হবে?"

—"একটু অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন।"

জয়ন্তের অল্পস্বল্প ছবি-আঁকার হাত ছিল। সুন্দরবাবুর দিকে পিছন ফিরে বসে ফাউন্টেন পেন ও ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে সে ফোটো থেকে নফরচন্দ্রের একখানা হুবহু প্রতিলিপি তুলে নিলে। তারপর সেই নকল-করা মুখের উপরে যথাস্থানে এঁকে ফেললে লম্বা চুল, কালো চশমা, ঘন গোঁফদাড়ি!

সুন্দরবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আরে গেল, ও আবার কি ছেলেমানুষি হচ্ছে শুনি?"

—"সুন্দরবাবু, এখন দেখুন দেখি, এই লোকটিকে কি চেনেন বলে মনে হচ্ছে?" জয়ন্ত প্রশ্ন করলে কৌতুকপূর্ণকণ্ঠে।

সুন্দরবাবু প্রথমে নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই ছবিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর দেখতে দেখতে যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হয়ে উঠল তাঁর দুই চক্ষু। তিনি চমৎকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আরে আরে, এ যে রবীন্দ্রবাবুর বন্ধু সত্যানন্দ বসুর মুখ!"

জয়ন্ত রুপোর শামুকদানী থেকে একটিপ নস্য নিয়ে হাস্যমুখে বললে, "ছবিতে আঁকা মুখে লম্বা চুল, কালো চশমা আর গোঁফদাড়ি বসিয়ে দিতেই নফরচন্দ্রের মূর্তির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে সত্যানন্দ স্বয়ং! এমন যে হবে আমি তা আগেই অনুমান করেছিলুম। আমি নফরকে চিনতুম না, তার জীবনীও জানতুম না, কিন্তু এই মামলার সমস্ত দেখে-শুনে আমি সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করেছিলুম সত্যানন্দকেই। চেহারার রকমফের করে নাম ভাঁড়িয়ে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে নফরচন্দ্র বহাল তবিয়তে হতভাগ্য রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিতালি জমিয়ে ফেলেছিল—প্রথম থেকেই তার কুদৃষ্টি ছিল সেই মুক্তা তিনটির উপরে। সকলের অগোচরে শুঁড়ীপথ দিয়ে ঢুকে মেথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সে পাপকার্য

সেরে আবার অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু এইবারে তাকে মুখোস খুলতে হবেই। নফরচন্দ্র এখনো আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে—কারণ এখনো সে সন্দেহ করতে পারে নি যে, আমরা তাকে সন্দেহ করেছি। সুতরাং উঠুন! জাগুন! ছুটুন সবাই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের আস্তানার দিকে!"

—"হুম্! তথাস্তু, তথাস্তু, তথাস্তু!"

*   *   *   *

নফর ওরফে সত্যানন্দের বাড়ি।

চারিদিকে পুলিস পাহারা বসিয়ে সদরের কড়া নাড়তে নাড়তে সুন্দরবাবু ডাকলেন, "সত্যানন্দবাবু, সত্যানন্দবাবু!"

বারান্দা থেকে উঁকি মারলে সত্যানন্দের মুখ। পুলিস দেখে তার ভাবান্তর হল না। সহজ স্বরেই শুধোলে, "অধীনের গোলামখানায় আপনারা যে?"

—"মামলা সংক্রান্ত একটা জরুরি কথা জানতে এসেছি।"

—"বেশ করেছেন। বেয়ারা গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছে। সোজা উপরে চলে আসুন।"

দোতালার ঘরের ভিতরে প্রথমে প্রবেশ করলেন সুন্দরবাবু, তারপর জয়ন্ত, তারপর আরো দুজন পুলিস কর্মচারী।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্যানন্দ হাসিমুখে বললে, "অনুগ্রহ করে সকলে আসন গ্রহণ করুন।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "বসবার সময় নেই।"

—"কিন্তু আপনারা কি জরুরি কথা জানতে চান? যা বলবার সব তো আমি বলেছি!"

—"কিন্তু একটা কথা বলেন নি।"

—"কি?"

—"আপনি নফরচন্দ্র নামটা ত্যাগ করলেন কেন?"

পর-মুহূর্তে সুন্দরবাবুর বক্ষের উপরে নিক্ষিপ্ত হল যেন দুর্যোধনের মহাগদা! আচম্বিতে নফরচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে সুন্দরবাবুর বুকের মাঝখানে করলে প্রচণ্ড পদাঘাত এবং বপুষ্মান্ সুন্দরবাবুরও দেহ ঠিকরে গিয়ে পড়ল হুড়মুড় করে একেবারে জয়ন্তের উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর কাঁপিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও গুরুভার দেহপতনের শব্দ!

মেঝের উপরে অল্প ছটফট করেই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের মূর্তি নিশ্চেষ্ট ও একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার কপাল থেকে বেরুতে লাগল ঝলকে ঝলকে রক্ত!

সুন্দরবাবু আপসোস্ করে বলে উঠলেন, "হায় হায় হায় হায়! নফ্‌রা আমাকে লাথি মেরেও ফাঁকি দিলে, ব্যাটাকে ফাঁসিকাঠে দোল খাওয়াতে পারলুম না! ছি জয়ন্ত, ওকে তোমার বাধা দেওয়া উচিত ছিল!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "উচিত তো ছিল, কিন্তু আপনি এমন কম্‌লির মতন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে আমার অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ! তবে আপনার এ-কূল ও-কূল দু-কূল নষ্ট হয় নি, নফরচন্দ্রের লাস দাখিল করতে পারলেও আপনার ভাগ্যে লাভ হবে পুরস্কারের পঞ্চসহস্র মুদ্রা!"

পুরস্কারের কথা মনে হতেই সুন্দরবাবু একমুখ হাস্য করলেন। তারপর বুকের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "নফরা তো পটল তুললে, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর মুক্তো তিনটে কোথায় লুকিয়ে রেখে গেল?"

জয়ন্ত বললে, "আশা করি এখানে খানাতল্লাস করলেই মুক্তা পাওয়া যাবে। আর নফরের হাতের ঐ রিভলভারটা দেখুন। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রবাবু মারা পড়েছেন ঐ রিভলভারের বুলেটেই।"

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

সেদিন সুন্দরবাবু আমাদের প্রভাতী চায়ের আসরে হাজিরা দিতে এত বিলম্ব করে ফেলেছিলেন যে, আমরা তাঁর আসার আশায় দিয়েছিলুম জলাঞ্জলি।

অবশেষে তিনি এলেন বটে, কিন্তু অতিশয় খাপ্পা অবস্থায়। রাগে ফুলতে ফুলতে এবং আপন মনে এই বলতে বলতে তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন—"হ্যাঁরে ফাজিল ছোক্‌রা, একবার যদি হাতের মুঠোয় পাই, পুলিসের কেরামতিটা বুঝিয়ে দেব!"

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বললুম, "কি ব্যাপার সুন্দরবাবু, আপনার দ্বিতীয় রিপু হঠাৎ এতটা প্রচণ্ড হয়ে উঠল কেন?"

ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ে সুন্দরবাবু বললেন, "আরে, ঐ শশী চৌধুরীর কথা বলছি! একবার বিলাতে টহল মেরে এসে নিজেকে সে মস্ত বড় কেও-কেটা বলে ধরে নিয়েছে!"

—"অর্থাৎ?"

—"বলে কি জানো? বাঙালী পুলিস হচ্ছে 'ফুলিস' জীব! দৈব সহায় না হলে আমরা নাকি কোন মামলায় সফল হতে পারি না! যে কোন চতুর ব্যক্তি আমাদের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করতে পারে—ইত্যাদি!"

—"শশী চৌধুরী ব্যক্তিটি কে?"

—"আমার প্রতিবেশী। ব্যাঙ্কে মোটা মূলধন গচ্ছিত রেখে বাপ গিয়েছে পরলোকে, আর ছেলে ইহলোকে বসে করছে তার দৈনন্দিন সদ্ব্যবহার। অবিবাহিত। আত্মীয় বলতে কেউ নেই। লণ্ডনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে বিলাতী পুলিস দেখে আমাদের আর আমলেই আনতে চায় না। আমরা যে অপদার্থ এটা প্রমাণ করবার জন্যে সে নাকি বাজি রাখতেও রাজী আছে!"

জয়ন্ত বললে, "আরে, ও-সব ছেঁড়া কথা ছেড়ে দিন—এদিকে চা যে শীতল পানীয় হয়ে ওঠার উপক্রম!"

সুন্দরবাবুর মৌখিক উচ্ছ্বাস সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি এক হাতে টোস্ট ও আর এক হাতে সিদ্ধ ডিম তুলে নিলেন।

*   *   *   *

তিন দিন পরে।

'দূরভাষে' সুন্দরবাবুর বাণী এসেছে—"জয়ন্ত, ঝটিতি পা চালিয়ে আমাদের পাড়ার ত্রিশ নম্বর বাড়িতে চলে এস। ভীষণ হত্যাকাণ্ড! লাস লোপাট!"

ত্রিশ নম্বর খুঁজে পেতে দেরি লাগল না। মাঝারি আকারের বাগানের মাঝখানে একখানা সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ি। ফটকের কাছে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন সুন্দরবাবু।

—"কে খুন হয়েছে মশাই?"

—"সেদিন চায়ের আসরে যাঁর কথা বলেছিলুম, সেই শশী চৌধুরী!"

—"বলেন কি!"

—"সেদিন তাঁর কথায় রেগে গিয়েছিলুম, কিন্তু আজ তাঁর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে! বেচারা আর বাজি রাখতে পারবে না! হায় রে পোড়াকপাল, এই তো মানুষ—এই আছে, এই নেই! তবু এত লাফানি-ঝাঁপানি!"

—"শশীবাবুকে খুন করলে কে?"

—"সেইটেই তো আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। খালি খুনী নয় হে, লাসও অদৃশ্য!"

—"লাস নেই? সে আবার কি কাণ্ড?"

—"শোনো তবে সংক্ষেপে সব কথা। শশীবাবু মাঝে মাঝে সখ করে নিজেই নিজের মোটর চালিয়ে বেড়াতে যান। গতকল্যও গিয়েছিলেন সন্ধ্যার পর। তারপর তিনি কত রাত্রে কখন যে ফিরে আসেন, বাড়ির লোকজন কেউ তা বলতে পারে না। তবে তিনি যে গাড়ি নিয়ে ফটক দিয়ে বাগানের ভিতরে

ঢুকেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সকালে দেখা যায়, বাগানের একধারে খালি গাড়িখানা রয়েছে, ভিতরে চালক বা আরোহী কেউ নেই, কিন্তু গাড়ির ভিতরে সব জায়গায় রক্ত ছড়াছড়ি। একটা হাতখানেক লম্বা রক্তাক্ত লোহার ডাণ্ডাও পাওয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই মারণ-অস্ত্র।"

জয়ন্ত বললে, "বাড়ির ভিতরে খোঁজ নিয়েছেন তো?"

—"সে কথা আর বলতে? খানাতল্লাসের কিছুই আর বাকি নেই, তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি। বাড়ির ভিতরে লাস বা অন্য কিছুই নেই, তবে গাড়ির ভিতরে আরো তিনটে জিনিস পাওয়া গিয়াছে: শশীবাবুর ছিন্নভিন্ন চুড়িদার পাঞ্জাবী, একপাটি জুতো, আর মণিব্যাগ—সবই রক্তাক্ত। পাঞ্জাবীর সোনার বোতাম আর মণিব্যাগের টাকাকড়িও অদৃশ্য। শশীবাবুর হাতে সোনার হাতঘড়ি ছিল, আর আঙুলে ছিল খুব দামী হীরার আংটি। অর্থলোভেই কেউ বা কারা তাঁকে খুন করেছে।"

—"কিন্তু লাস না পেলে কাউকে তো খুনী বলে গ্রেপ্তার করাও চলবে না।"

—"সেই তো হচ্ছে সমস্যা। অপরাধী মহা ধড়িবাজ। খুনখারাপি হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের হাতে রক্তাক্ত মোটর ছাড়া আর কোনই প্রমাণ নেই।"

—"গাড়িখানা কোথায়?"

—"আমার সঙ্গে এস।"

বাগানের বাঁধানো পথের উপরে খানিক এগিয়েই গাড়িখানা পাওয়া গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, "বাঁধানো পথ, খুনীর পায়ের ছাপ পাবার উপায় নেই। হত্যাকাণ্ডের সময়ে যে লোহার ডাণ্ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে, তারও একদিকে রুমাল জড়ানো পাছে আঙুলের ছাপ পড়ে, সেইজন্যেই এই সতর্কতা।"

—"কিন্তু শশীবাবু হয়তো নিহত না হয়ে কেবল আহত হয়েছেন।"

—"গাড়ির ভিতরে কত রক্ত দেখছ? এত রক্তপাতের পর কোন মানুষ কি বাঁচতে পারে? আর একটা আহত মানুষকে চুরি করার মানেও হয় না।"

সত্য, গাড়ির ভিতরে যেন রক্তগঙ্গা! গাড়ির গায়ে রক্ত, পিছনের বসবার গদীতে রক্ত, তলদেশেও চাপ চাপ রক্ত—দেখলে মাথা ঘুরে যায়! শুধু সামনের গদীতে নেই রক্তের ছোপ।

জয়ন্ত একমনে তীক্ষ্ণ চোখে সেই রক্তাক্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটা ছোট শিশি আনিয়ে অল্প একটু রক্ত তুলে নিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "এই দেখ লোহার ডাণ্ডাটা। এর ওপরেও রক্তের দাগ দেখছ?"

"দেখছি" বলে ডাণ্ডাটাও সে ভালো করে পরীক্ষা করলে।

আমি বললুম, "কিন্তু বাগানের পথে কোথাও একফোঁটা রক্ত নেই!"

—"তাও দেখছি আর ভাবছি; আজকের তারিখ কত?"

সুন্দরবাবু বললে, "এপ্রিল মাসের পয়লা।"

—"তারিখটা মনে রাখবেন।"

—"তা রাখব বৈ কি! তোমার আর কি বক্তব্য আছে?"

—"পরে জানার। চল মাণিক!"

—"তারিখের কথা তুললে কেন? তুমি কি বলতে চাও, লাস লুকিয়ে অপরাধী আমাদের 'এপ্রিল ফুল' বানাতে চায়?"

—"ঠিক তাই।"

* * * *

জয়ন্তের আহ্বানে আজ দুপুরেই সুন্দরবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন।

—"কি ব্যাপার জয়ন্ত, অসময়ে জরুরী তলব কেন?"

—"গুমখুনের মামলাটা নিয়ে এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন তো?"

—"দস্তুরমত ঘামাচ্ছি, কিন্তু কিছুই সুরাহা করতে পারি নি।"

—"নিজের ঠিকানায় আমি খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলুম, পড়ে দেখুন।"

জয়ন্তের হাত থেকে খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে সুন্দরবাবু পাঠ করলেন ঃ

"বাবু শশীনাথ চৌধুরী! আমরা 'এপ্রিল ফুল' হই নি। অবিলম্বে আত্মপ্রকাশ ও আমার সঙ্গে দেখা না করলে সমূহ বিপদে পড়বেন।"

সুন্দরবাবু চমকে বললেন, "এই বিজ্ঞাপনের অর্থ কি? এ কোন্ শশী চৌধুরী?"

জয়ন্ত বললে, "যে শশী চৌধুরীর রক্তাক্ত গাড়ি আমরা দেখেছি!" শশীবাবু আমার বিজ্ঞাপনের উপদেশ শুনেছেন। তিনি বহাল-তবিয়তে আপাতত পাশের ঘরেই লজ্জিত মুখে অপেক্ষা করছেন। আমরা ডাকলেই দেখা দেবেন।

"প্রথমে রক্তাক্ত গাড়িখানা দেখেই আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল। দেহের উপরে প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাত করলে রক্ত পড়ে ছিটকে। কিন্তু গাড়ির সর্বত্র রক্ত দেখে আমার মনে হয়েছিল, কেউ যেন তা সাবধানে লেপন করে দিয়েছে! দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য ছিল, শশীবাবু নিজেই গাড়ির চালক, অথচ চালকের আসন রক্তহীন। তৃতীয়তঃ, বাগানের পথে ছিল না একবিন্দু রক্তের ছাপ। একটা রক্তাপ্লুত দেহকে স্থানান্তরিত করতে গেলে মাটির উপর রক্ত পড়বে না, এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

তারপর দেখলুম লোহার ডাণ্ডাটা! মারাত্মক প্রহার করা হলে ডাণ্ডার উপরে মানুষের গায়ের ছাল-চামড়ার টুকরো পাওয়া যেত, কিন্তু সে সব কিছুই ছিল না।

তারপর বাড়িতে এসে শিশির রক্ত নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে আমার সমস্ত সন্দেহই দূর হয়ে গেল। গাড়িতে যে রক্ত পাওয়া গিয়াছে তা মানুষের নয়, পশুর রক্ত। তখন বেশ বুঝলুম, শশীবাবু সশরীরে সুস্থ অবস্থায় ইহলোকেই বর্তমান আছেন, কিছুদিন লুকিয়ে থেকে পুলিসের সঙ্গে একটু তামাসা করতে চান।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তামাসা? পুলিসের সঙ্গে তামাসা? আমি শশীবাবুকে গ্রেপ্তার করব।"

আমি বললুম, "আহা হা, চেপে যান সুন্দরবাবু, চেপে যান! ব্যাপারটা এখনো তামাসাই আছে, বেশি টানাটানি করলে রীতিমত প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে যে!"

রিভলভার

উপস্থিতবুদ্ধি যে কাজ করে মন্ত্রশক্তির মত, তার একটা দৃষ্টান্ত দেখেছিলুম।

অনেকদিন আগেকার ঘটনা, জয়ন্ত তখনও সখের গোয়েন্দা বলে পরিচিত হয় নি। সে আর আমি একসঙ্গে কলেজে পড়ি।

আজ আমি কোন গোয়েন্দার গল্প বলব না। কিন্তু যে উপস্থিতবুদ্ধি হচ্ছে ভালো গোয়েন্দার একটি প্রধান গুণ, জয়ন্তের মধ্যে তা বিদ্যমান ছিল প্রথম—অর্থাৎ যখন সে গোয়েন্দা হয়নি তখন—থেকেই। তারই একটা নজির।

পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছিলুম গোমো জংশনে। এই শৈলসংকুল, বন্য ও নির্জন জায়গাটি তখনও বায়ুভক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি এবং সেই কারণেই সেখানে গিয়ে অস্থায়ী ডেরা বাঁধবার জন্যে আমাদের মনে জেগেছিল বিশেষ আগ্রহ।

আগেভাগে যাচ্ছিলুম বলে গাড়িতে ভালো করে পুজোর ভিড় জমে নি। ইন্টারক্লাসের যে কামরায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম তার ভিতরে তিনজনের বেশি আরোহী ছিলেন না। দুজন মাড়োয়ারী ও একজন বাঙালী।

গাড়ি ছাড়বার আগে আরো এক বাঙালী ভদ্রলোক কামরার দরজা খুলেই বলে উঠলেন, "আরে, সুরেনবাবু যে! নমস্কার!"

জয়ন্তের পাশের লোকটি বললেন, "নমস্কার তারিণীবাবু। কলকাতায় এসেছিলুম কিছু জিনিসপত্তর সওদা করতে।"

—"তাহলে এখন ধানবাদেই ফিরছেন তো?"

—"তা ছাড়া আর কি! জানেন তো, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত!"

—"বেশ, বেশ, আমিও তো ঐ মসজিদেরই আর এক মোল্লা! দুজনে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

বোঝা গেল সুরেনবাবু ও তারিণীবাবু দুজনেই ধানবাদের বাসিন্দা।

* * * *

ট্রেন ছুটছে সবেগে এবং সশব্দে।

দিনের আলো নিবিয়ে এসেছে অন্ধকার এবং তারপর অন্ধকারকে পাতলা করে বনের মাথায় উঠেছে চাঁদ। বাইরে, দেখা যাচ্ছে রহস্যময় ছায়াছবি।

মাড়োয়ারী দুজন একটুও সময় অযথা নষ্ট করে নি, গাড়ি হাওড়া ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এক-একখানা বেঞ্চের উপরে বিপুল বপু ততোধিক বিস্তীর্ণ ভুঁড়ি নিয়ে হয়েছে সটান লম্বমান এবং তাদের শব্দায়মান নাসাযন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করছে আমাদের সকলকার কর্ণপীড়া।

একটি নতুন বেতের বাস্কেটের উপরে হস্তার্পণ করে তারিণীবাবু শুধোলেন, "হ্যাঁ সুরেনবাবু, বাস্কেটটা কার?"

—"আপাতত আমারই বটে।"

—"তার মানে?"

—"ধানবাদের কয়লার খনির মালিক রামরতনবাবুকে চেনেন তো? তাঁরই ফরমাসে বাস্কেটটা কিনতে হয়েছে। ওর ভেতরে আছে কতকগুলো খেলার সামগ্রী।"

—"খেলার সামগ্রী?"

—"হ্যাঁ, ছেলেদের বায়না। দামী খেলনা। বড়লোকদের ছেলেমেয়েরা দামী দামী বিলিতী খেলনা না হলে খেলে সুখ পায়না। হগ্ সাহেবের বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আমি রামরতনবাবুর তাঁবে থাকি, তাঁর অনুরোধ আমার কাছে হুকুমেরই সামিল।"

বাস্কেটের ডালায় তালা-চাবি ছিল না। তারিণীবাবু সাগ্রহে ডালা তুলে একে একে খেলনাগুলো পরীক্ষা করলেন। জয়ন্তও সেইদিকে চোখ ফেরালে সকৌতুকে।

সুরেনবাবু তিক্তসরে বললেন, "দেখলেন তো, কেবল অর্থের অপচয়! খেলনাগুলো কিনতে যে টাকা লেগেছে, আমাদের মত ছাপোষা মানুষদের একমাসের সংসারখরচ চলে যেত।"

উত্তরে তারিণীবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

* * * *

একটা ষ্টেশনে যখন ট্রেন ছাড়বার বাঁশী বেজে উঠেছে, হঠাৎ একদল কুদর্শন লোক হুড়মুড়িয়ে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ল। গুণে দেখলুম তারা পাঁচজন।

তাদের চেহারা ও আবির্ভাব সন্দেহজনক এবং প্রথম আচরণ ও ভয়প্রদ।

দলের মধ্যে সব-চেয়ে লম্বাচওড়া, কালোকুৎসিত ও দৈত্যের মত দেখতে লোকটা এগিয়ে গিয়ে একজন মাড়োয়ারীর ভুঁড়ির উপরে চটাস করে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "এই ডালরুটিচোট্টা, এটা ঘুমোবার জায়গা নয়, উঠে পড়্!" সে বাংলায় কথা কইলে বটে, কিন্তু তার উচ্চারণ বাঙালীর মত নয়। তার পরনেও ছিল ধুতির বদলে লুঙ্গী।

চড় খেয়ে মাড়োয়ারীর নাকের ডাক থেমে গেল, শোনা গেল মুখের আর্তনাদ। সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

পর-মুহূর্তেই পাঁচ মূর্তিরই হাতে দেখা গেল এক-একখানা চক্চকে ছোরা!

আমি সচমকে উঠে দাঁড়িয়ে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালুম। সে স্থির হয়ে বসে আছে এবং তার মুখের নিশ্চিন্ত ভাব দেখলে মনে হয়, কামরায় যেন শান্তিভঙ্গের কোন কারণই ঘটে নি!

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মাড়োয়ারীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। সে লাফ মেরে ওদিকে দরজার কাছে গেল গাড়ি থামাবার শিকল টেনে দেবার জন্যে—কিন্তু তার আগেই দৈত্যের মত লোকটার প্রচণ্ড লাথি খেয়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সুরেনবাবু চুপিচুপি কাতর স্বরে বললেন, 'অ তারিণীবাবু, এরা যে ডাকাত! এখন কি হবে?"

তারিণীবাবু তখন একেবারে বোবা, তাঁর সারা দেহ ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে।

* * * *

মূর্তিমন্ত দৈত্যটা শানিত ছোরাখানা নাচাতে নাচাতে বাজখাঁই গলায় বললে, "যদি বাঁচতে চাও, যার কাছে যা আছে এখনি বার করে দাও, নইলে—"

কিন্তু তার মুখের কথা ফুরোবার আগেই আমার পিছন থেকে জয়ন্ত বিষম ক্রোধে চীৎকার করে বলে উঠল, "খবর্দার! আর একটা কথা কয়েছ কি এক পা নড়েছ, তাহলে কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না!"

সবিস্ময়ে পিছন ফিরে দেখে নিজেই চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না! সে তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে, দৃপ্ত তার ভঙ্গি! দুইচক্ষে তার ক্রোধের আগুন এবং হাতে রয়েছে একটা রিভলভার!

কি আশ্চর্য! আমাকেও লুকিয়ে জয়ন্ত কি একটা রিভলভার পকেটে করে নিয়ে এসেছে? এমন তো কখনো হয় না! জয়ন্ত যে রিভলভারের অধিকারী, এটাও ছিল আমার অজানা!

জয়ন্ত আবার চেঁচিয়ে বললে, "আমার এই রিভলভারে বুলেট আছে অর্ধডজন। তোদের মত পাঁচজন দুরাত্মার পক্ষে তাই-ই হবে যথেষ্ট! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্, নইলে কুকুরের মত মারা পড়বি! মাণিক, এইবারে তুমি গাড়ি থামাবার শিকলগাছা টেনে দাও তো!"

তারপরের কথা বেশি বলা বাহুল্য। ট্রেন থামল আচম্বিতে, দলে দলে লোক এল ছুটে, ডাকাতরা হল বন্দী।

*　　*　　*　　*

সুরেনবাবু জয়ন্তকে সম্বোধন করে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "ও মশাই, আপনি যে তাজ্জব বানিয়ে দিলেন! আমি কিনেছি খেলনার রিভলভার, আর তাই দেখিয়ে পাঁচ-পাঁচটা ডাকাতকে আপনি করলেন কুপোকাত!"

জয়ন্ত একগাল হেসে বললেন, "তারিণীবাবু যখন বাস্কেটের খেলনাগুলো পরীক্ষা করছিলেন, তখনই আমি ঐ নকল রিভলভারটা দেখতে পেয়েছিলুম!"

এতক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে তারিণীবাবু চমৎকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ধন্য, ধন্য!"

দৈত্যের মত ডাকাতটা গর্জ্জন করে উঠল নিষ্ফল আক্রোশে।

ইতি